গেরিলা ও বীরাঙ্গনা

(২০১৪)

সেলিনা হোসেন

ঘরের মধ্যে দুভাইবোন

ঘরের মধ্যে দুভাইবোন অন্য যোদ্ধাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে আরও দুজন বয়সী মানুষ।

আকমল হোসেন গেরিলারা কোন পথে ঢুকবে তার হিসাব করছেন। পথের হিসাব। কাগজে আঁকিবুঁকি করে নিজেই একটি ম্যাপ বানিয়েছেন, যেন পথটি সহজেই তাঁর মাথায় থাকে। যেন তিনি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন গেরিলাদের অবস্থান কোথায়—পথ ও সময় একটি সূত্রে এক হয়ে মিশে থাকবে তার চিন্তায়। আর এই অনুষঙ্গে তিনি স্বস্তি বোধ করবেন।

আয়শা খাতুন রান্নাঘরে। প্রতিদিন তিনি রান্নাঘরে ঢোকেন না। বাইরে তাঁর কাজ থাকে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তিনি রান্নাঘরে প্রায়ই কাজ করেন। যেদিন গেরিলাদের আসার খবর থাকে, সেদিন তিনি নিজে রান্না করেন। নিজ হাতে রান্না করে নিজেকে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবেন। তিনি মনে করেন, এটিও একটি বড় ধরনের কাজ। যুদ্ধে জেতার প্রক্রিয়ার সঙ্গে রান্নার একধরনের সরল উপস্থিতি আছে। কারণ, গেরিলাদের খেতে হবে। শক্তির জন্য। তাই প্রতিদিনের রান্নার পরও অনেক সময় তিনি

অন্য সময়ের জন্যও রান্না করে ফ্রিজে রাখেন। অনেক সময় ওরা খবর না দিয়েও আসে। তাই ঘরে খাবার রেডি রাখা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাড়াহুড়ো করে একটা কিছু করে দিলেন, এই মনোভাবে তিনি পরাস্ত হতে চান না। আজও তিনি বাড়তি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত।

সন্ধ্যা নেমেছে।

শহরে সন্ধ্যা নামলে রাস্তার বাতি জ্বলে ওঠে। টিমটিমে বাতির আলোয় শহরের রাস্তায় ম্লান ছায়া পড়ে। মারুফ বন্ধ জানালা সামান্য ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকায়। জানালা বরাবর বাড়ির সীমানাপ্রাচীর আছে। জানালা দিয়ে সরাসরি রাস্তা দেখা যায় না। মারুফকে একটি টুলের ওপর দাঁড়াতে হয়। পর্দা সরিয়ে জানালার শিকে মাথা ঠেকায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মেরিনাকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে যেত। এখন সেটা বন্ধ। আর্মির গাড়ির টহল আছে চারদিকে। যুদ্ধ শুরুর আগে এই রাস্তার ম্লান আলোর একধরনের অর্থ ছিল ওর কাছে। ও মেরিনাকে বলত, এ সময় রাস্তা খুব বিষণ্ন থাকে। আমার মনে হয়, এই ম্লান ছায়া রাস্তার বিষণ্ন সৌন্দর্য। যে এটা অনুভব করে, সে এই শহরের বন্ধু। আমি এই শহরের বন্ধু। এটা ভাবতে আমার দারুণ লাগে।

মেরিনা হেসে গড়িয়ে পড়ত। জোর হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বলত, মাকে বলি যে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ? তোমার চিন্তার ব্যালান্স নষ্ট হচ্ছে।

তোর তা-ই মনে হচ্ছে? তুই এমন একটি কথা বলতে পারলি?

হ্যাঁ, তাই তো। বলতে তো পারলামই। আমার এমনই মনে হচ্ছে।

আমার এই আবিষ্কারে তুই কোনো সৌন্দর্যই দেখলি না।

মেরিনা আরও জোরে হাসতে হাসতে বলত, ভাইয়া, তোমার পিপাসা পেয়েছে। আমি তোমার জন্য পানি আনতে যাচ্ছি। তুমি এখানেই বসে থাকো। নড়বে না।

মেরিনা ছুটে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি এনে গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত, এক চুমুকে শেষ করবে।

কেন, তোর মতলব কী, বল তো?

তাহলে তোমার পাগলামি ঠান্ডা হয়ে যাবে। তুমি গুড বয় হবে।

তুই এনেছিস, সে জন্য পানি খাব। কিন্তু আমার কোনো পাগলামি নেই, মেরিনা।

মেরিনা এই কথা শুনে আর হাসতে পারত না। বলত, তাহলে তোমার কথা ঠিক। আমিও একদিন শহরের রাস্তা চিনতে শিখব।

এখন ওরা দুভাইবোন শহরের রাস্তা আরেকভাবে চিনতে শিখেছে। মেরিনাই প্রথমে বলে, এখন শহরের রাস্তা আর বিষণ্ন নয়। শহরের রাস্তা প্রাণবন্ত। উজ্জ্বল।

মারুফ মেরিনার দুহাত ঝাঁকিয়ে ধরে বলে, এখন শহরের রাস্তায় গেরিলাযুদ্ধের সৌন্দর্য। এই রাস্তায় চলাচল করতে শত্রুপক্ষ ভয় পায়।

আর রাস্তা কাঁপিয়ে হেঁটে আসে গেরিলারা।

ওহ, মেরিনা, দারুণ বলেছিস! আয়, আমরা রাস্তা দেখি। টিমটিমে বাতির দীপ্ত সৌন্দর্য দেখি।

দুভাইবোন জানালার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকায়। রাস্তায় যান চলাচল কম। হাঁটার লোক নেই বললেই চলে। খুব জরুরি হলে কাউকে রাস্তায় থাকতে হয়। হঠাৎ হঠাৎ গাড়ি চললেও খুব জোরে হর্ন বাজায় না। জোরে হর্ন বাজলে ঘরের ভেতরের লোকেরা বোঝে যে ওটা শত্রুপক্ষের গাড়ি। ওই সব গাড়ি হয় পাকিস্তানি সেনাদের, নয়তো ওদের পক্ষের বেসামরিক লোকদের। শহরের মানুষ এখন দুভাগে বিভক্ত। মুখ ফিরিয়ে মারুফ বলে, যুদ্ধের সময় শহরের রাস্তা এমনই থাকা উচিত।

তুমি কি ভয়ের কথা বললে, ভাইয়া?

মোটেই না। এটা কৌশলের কথা।

হবে হয়তো। তুমিই ঠিক।

রাস্তা দেখে দুভাইবোন জানালা বন্ধ করে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বারান্দায় আসে। বাড়িতে কোনো শব্দ নেই। দুভাইবোন পরস্পরের নিঃশ্বাস টের পায়। বারান্দায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মারুফ বলে, গেরিলাদের আসতে খুব ঝামেলা হবে না। ফাঁকা রাস্তায় শাই করে চলে আসবে গাড়ি। ঝটপট নেমে পড়বে। দৌড়ে কোথাও যেতে হলে সেটাও সুবিধা।

ভাইয়া, আমার মনে হয় রাস্তায় গাড়ি এবং লোক চলাচল বেশি হলেই ভালো। অনেক মানুষের ভিড়ে নিজেকে আড়াল করা যায়।

মারুফ চুপ করে থাকে। মনে হয় মেরিনা ঠিকই বলেছে। বেশি ফাঁকা রাস্তায় ওদের ভয় বেশি। ওত পেতে বসে থাকা আর্মির গাড়ি চট করে ছুটে আসবে। টেনে নামাবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

মেরিনা আস্তে করে বলে, আজকের রাস্তা দেখে আমার গা ছমছম করছিল। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পাল্টে ফেলে জোরালোভাবে বলে, আমাদের এসব না ভাবাই ভালো। আমার মায়ের দেবদূতের মতো ছেলেরা এলেই ভালো। বাড়িতে স্বস্তি থাকবে। বাবা-মায়ের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যতক্ষণ ওরা এ বাড়িতে থাকবে।

ওরা এলে তোর ভয় করে না, মেরিনা? মনে হয় না একটা কিছু ঘটে যেতে পারে?

মোটেই না। ওরা কবে আসবে আমিও সেই অপেক্ষায় থাকি। জানো ভাইয়া, ওরা না এলে আমার দিনগুলো ভুতুড়ে হয়ে যায়। মনে হয়, এই শহরের গেরিলারা কোথায় হারাল।

মারুফের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললে প্রথমে মারুফের চোখ কুঁচকে যায়। তারপর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। মৃদু হেসে বলে, আমি তো জানি, মা শুধু ওদের দেবদূত বলে না। তুইও বলিস। যুদ্ধ মানুষের চেহারা বদলে দেয় রে। তবে শুধু দেবদূত নয়, তাকে ইবলিসও দেখতে হবে, মেরিনা।

আমি তা-ও জানি। পাকিস্তানি আর্মির সৈনিকগুলো আমার সামনে ইবলিস। সময়টা এখন এমনই। তোমার কি মনে হয় না, ভাইয়া, যে একদিন এই সময়ের একটা নাম হবে।

হতে পারে। আমরা যে সময় দেখছি এবং যেসব দিন পাড়ি দিচ্ছি, তার নাম হতেই হবে।

কী নাম হবে বলে তোমার মনে হয়?

মারুফ একমুহূর্ত মাথা ঝাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, হুররে, পেয়েছি!

বলো, কী নাম হতে পারে?

মারুফ বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলে, একাত্তর।

বাহ, দারুণ! একটি শব্দে পুরো যুদ্ধের ইতিহাস।

আমরা, গেরিলারা ঢাকা শহরের চেহারাই বদলে দিলাম। শরীরের ভেতর মেশিনগানের শব্দ টের পাচ্ছি। না, শুধু মেশিনগান হবে কেন, সব অস্ত্রের শব্দ টের পাচ্ছি। একটি ট্যাংক বা বোমারু বিমানও আমার ভেতরে ভরেছি।

একজন গেরিলাযযাদ্ধার এত আনন্দ হয়, আমি তা ভাবতে পারি না। আমার নিজেরও এমন আনন্দ হচ্ছে।

ভুলে যাচ্ছিস কেন তুই নিজেও একজন যোদ্ধা।

ভুলিনি, একদম ভুলব না। নিজের বীরত্বকে কে অস্বীকার করতে চায়?

প্রাণখোলা হাসিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে আবার বলে, আজ তোমার কোনো বন্ধু আসবে, ভাইয়া?

ওরা পাঁচজন আসবে। ওদের মধ্যে তিনজন তোর চেনা। বাকি দুজন নতুন। কী রান্না হয়েছে রে?

মা জানেন। রান্নাঘরের ব্যবস্থা মায়ের। মা বলেন, এটাই তার যুদ্ধ। গেরিলাদের খাইয়েদাইয়ে তরতাজা রেখে বড় অপারেশনে পাঠানো। মারুফের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়, ওহ্! আমাদের মা। গ্রেট মা। কত শান্তভাবে, কত মমতায় গেরিলাদের যত্ন করেন।

শুধু কি তা-ই, মা-ও গেরিলাদের অপেক্ষায় থাকেন। বলেন, ওরা এলে আমাদের বাড়িটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়। আসল যুদ্ধক্ষেত্র দেখা না হলে কী হবে, এই যুদ্ধক্ষেত্রও দেখা আমার পুণ্য রে, মেয়ে।

মারুফও জানে এসব কথা। তার পরও মেরিনার কাছ থেকে আবার শুনতে ভালো লাগে। যেন নতুন করে শোনা হলো যুদ্ধকালীন কথা। এসব কথা বারবার শুনতে হয়। যেন কোথাও বসে কেউ একজন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। বলছেন, হে পুরবাসী, শোনো, এই ইতিহাস তোমাদের নতুন জন্মের ইতিহাস। এই ইতিহাস তোমাদের নতুন জীবন রচনা করবে। হে পুরবাসী, তোমরা জয়ের প্রার্থনায় নিমগ্ন হও। কঠিন সময়কে আপন করার প্রার্থনায় মগ্ন হও তোমরা। দেখো, চারদিকে বিউগলের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোমাদের সামনে এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ।

মারুফ চারদিকে তাকিয়ে বলে, আমার মনে হলো, কেউ যেন স্তোত্র পাঠ করছিলেন।

আমার মনে হচ্ছিল বুদ্ধের বাণী, কিংবা বাইবেল থেকে পাঠ।

অথবা কোরআনের কোনো আয়াত।

মেরিনা চমকে মারুফের দিকে তাকায়।

এই কন্ঠস্বর কোথা থেকে ভেসে আসছিল, ভাইয়া?

আমি জানি না। শুধু মনে হয়েছিল, শোনাটা আমাদের জন্য খুব দরকার। তাই দুকান খাড়া করে রেখেছিলাম। খুব পবিত্র মনে হচ্ছিল নিজেকে। এবং নিজেকে খুব সাহসীও। জীবনকে তুচ্ছ করার সাহস।

আমরা মায়ের কথা বলছিলাম। আমার মনে হয়, আমার মায়ের পূর্বপুরুষের কেউ, ধরো তার নানা বা দাদার আগের কেউ মোগল সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন।

মারুফ হা-হা করে হেসে বলে, মায়ের সঙ্গে মশকরা করা হচ্ছে?

মোটেই না। মায়ের সাহস দেখে মুগ্ধ হই। তার ধমনিতে যুদ্ধের গৌরবের রক্তস্রোত আছে।

তুই কি মায়ের মতো সাহসী না?

আমিও গেরিলাযোদ্ধা হতে চাই, ভাইয়া। মেলাঘরে যেতে চাই। ট্রেনিং নিতে চাই।

বাদল আসুক। ওকে তোর কথা বলব। ও তোকে মেলাঘরে নিয়ে যাবে। খালেদ মোশাররফের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, মেয়েদের একটি প্লাটুন করুন, স্যার। আমি অনেক মেয়ে এনে দেব। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও পারে।

মেরিনা বিষণ্ন কন্ঠে বলে, মা অন্য কথা বলে।

কেমন, কী কথা রে? মা আর অন্য কথা কী বলবেন?

মেরিনা চুপ করে থাকে। খানিকটুকু দ্বিধা ওকে বাধাগ্রস্ত করে।

বলছিস না কেন? এখন চুপ করে থাকার সময় নয়। এই সময়টা কথা বলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সময়।

মেরিনা ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি মারুফের দিকে তাকায়। কপাল কুঁচকে রাখে। ঠোঁট কামড়ায়। বলে, মা বলে, আমি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়লে ওরা আমাকে বাংকারে নিয়ে যাবে। সে জন্য সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

ঠিকই বলেন। যুদ্ধকালে এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে।

আগেকার দিনের নারীরা যুদ্ধে পরাজিত হলে আত্মাহুতি দিত।

মারুফ বোনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। মেরিনা শক্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, তবে সময় এখন আগেকার দিনের মতো নেই। এখনকার সময়ের মেয়েরা নির্যাতিত হলেও যুদ্ধের পক্ষে কাজ করবে। বাংকার থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দেবে মুক্তিযযাদ্ধাদের সঙ্গে। বলবে, জনযুদ্ধ প্রতিটি মানুষের সাহস চায়। তোমাদের প্রয়োজনের কথা আমাকে বলো। আমি কাজটি করব। নদীর ওপর যে সেতুটি আছে, তা আমি উড়িয়ে দিয়ে আসি? তাহলে পাকিস্তানি সেনারা আর এপারে আসতে পারবে না। আমাদের এলাকা মুক্তাঞ্চল থাকবে।

মারুফ বাতাসে উড়িয়ে দেয় কন্ঠস্বর। বলে, এমনই হবে দেশজুড়ে। আর সবকিছুই যুদ্ধের সময়ের ঘটনা হবে। এখান থেকে কেউ কাউকে আলাদা করতে পারবে না।

একাত্তর এক অলৌকিক সময় হবে, না ভাইয়া?

হ্যাঁ, এক আশ্চর্য সময়ও বলতে পারবি। বলতে পারবি শ্রেষ্ঠ সময়ও।

উহ্, কী সাংঘাতিক, আমরা এই সময়ের মানুষ! এই জীবনে আমি আর কিছু চাই না।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে মেরিনার চেহারা। ও দুহাতে মোটা-লম্বা বেণিটা খোলে আর গাঁথে। ওরা দুভাইবোন পাঁচজন গেরিলার জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা একসঙ্গে আসবে না। একেকজন একেক সময় আসবে। রাত দশটার মধ্যে ওদের আসা শেষ হবে। ওরা আজ রাতে এ বাড়িতে আসবে। থাকবে। পরদিন দিনের বেলায় এ বাড়িতে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা ফেলার কর্মসূচি আছে ওদের।

ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয় মেরিনা। দ্রুত হাতে বেণিটা শেষ করে দুহাত কাজমুক্ত করে। ওরা এলে হাত দুটোকে কাজে লাগাতে হবে। সেই হাত দিয়ে বেণি বাধার কাজ করা যাবে না। কাজ করতে হবে যোদ্ধাদের জন্য। ওরা এলে প্রথমে চা-নাশতা দিতে হবে। যখন যে আসবে তখন তাকে। তারপর খাবারের টেবিলে খাবার সাজাতে হবে। ওদের ঘুমানোর জন্য বিছানা করতে হবে। মারুফের ঘরের মেঝেতে বড়সড় বিছানা পেতে সবাই একসঙ্গে ঘুমোবে বলে ঠিক করেছে। সেই অনুযায়ী তোশক-বালিশ তৈরি রাখা হয়েছে।

মারুফ কান খাড়া করে বলে, বাবা বোধ হয় আমাকে ডাকছেন। শুনে আসি কী বলবেন।

এক মিনিট দাঁড়াও, ভাইয়া। একটা কথা—

কী বলবি? মারুফের ভুরু কুঁচকে থাকে।

তাহলে আজ রাতে শুরু, ভাইয়া?

হ্যাঁ, আজ রাতেই প্রস্তুতি শেষ হবে। কাল আমরা নিজেদের চিন্তামুক্ত রাখব। তাস খেলব। ক্যারম খেলব। মাকে খিচুড়ি রাঁধতে বলব। আর বাবাকে ডেকে তার ছাত্রজীবনের গল্প শুনব। আমরা মনে করব, সময় আমাদের জীবনে পাখা মেলেছে। ওটা দম আটকে মুখ থুবড়ে পড়েনি।

ওরা কখন আসবে?

মেরিনার কন্ঠ অস্থির শোনায়।

যখন তখন। এক্ষুনি বা তক্ষুনি।

মেরিনা মৃদু হেসে বলে, বেশ সুন্দর করে উত্তর দিলে। তুমি তো নির্দিষ্ট করে জানো না যে কখন আসবে।

আসার পথ খুব সহজ নয়তো, সে জন্য এভাবে বলা।

বুঝেছি। চলো, বাবার ঘরে যাই।

দুজনে উঠে দাঁড়ানোর আগেই আকমল হোসেন ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে দাঁড়ান।

আব্বা, আমরাই তো যাচ্ছিলাম।

আমিই চলে এলাম। তোদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। তোরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না। কিসের যুক্তিতর্ক হচ্ছিল?

পাঁচজন গেরিলা আসবে, বাবা!

হ্যাঁ, তা তো জানি। আমি ওদের আসার পথের ম্যাপ করছিলাম।

কই, দেখি তোমার কাগজটা।

না, তোদের হাতে দেওয়া যাবে না। আমি তোদের বোঝাব। তোদের মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমাকে ডাকতে হবে না। আমি এসে পড়েছি।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আয়শা খাতুন ঘরে এসে ঢোকেন। আগুনের আভায় তাঁর ফরসা দুগাল চকচক করছে। কপালে ঘাম জমে আছে।

হ্যাঁ, এখানে বসেন। এই সোফায় আমি আর আপনি। পাশের সোফায় আব্বা আর মেরিনা।

আপনার রান্না শেষ হয়েছে, মা?

হয়েছে, বাবা। সব শেষ করেই রান্নাঘর থেকে বের হয়েছি রে।

কী বেঁধেছেন? খাওয়ার লোভ জিবে টিকিয়ে রাখার জন্য জিজ্ঞেস করছি, মা।

বেঁধেছি মুরগি আর ইলিশ মাছ। ডাল, ঢ্যাঁড়শ ভাজি। শুটকি মাছের ভর্তা। কাউন চালের পায়েস করেছি।

উহ্, এত কিছু! খাবার টেবিল আজ দারুণ জমবে।

ছেলেরা ভালো-মন্দ না খেলে যুদ্ধ করবে কী করে! ওদের যুদ্ধ আমাদেরও করতে হবে।

আকমল হোসেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, খাইয়েদাইয়ে ছেলেদের আয়েশি করা যাবে না। পরে ওরা বলবে ঘুমপাড়ানি গান গাও, মা। ঘুমিয়ে পড়ি।

পাগল, ওরা কখনো এমন কথা বলবে না।

না বললে ভালো।

যারা যুদ্ধ করার জন্য পথে নামে, তাদের সহজে ঘুম আসে না। ওরা ঘুমপাড়ানি গানের তোয়াক্কা করে না।

তুমি রেগে গেলে দেখছি।

তুমি বলতে চাও এখন আদর দেওয়ার সময় না?

হ্যাঁ, তা-ই। আকমল হোসেনের কন্ঠস্বর গম্ভীর এবং কঠিনও। আমি ছেলেদের বাড়াবাড়ি প্রশ্রয় দিতে চাই না। সেটা কোনো ধরনের আচরণেই না। সেটা খাওয়াদাওয়াতেই হোক বা রাস্তায় হাঁটাতেই হোক।

আয়শা খাতুন নিরেট কন্ঠে বলেন, ঠিক আছে, এরপর ওরা যখন আসবে, তখন আমি ওদের আটার রুটি আর এক বয়াম আচার দেব। ওই খেয়েই ওদের গায়ে বল হবে।

মেরিনা মায়ের হাত চেপে ধরে আতঙ্ক নিয়ে বলে, না মা, না। আপনি এমন করবেন না। আপনি যা খাওয়াতে চান, তা-ই খেতে দেবেন। অপারেশনে গিয়ে ওদের কেউ যদি ফিরে না আসে, তখন ওর অন্য বন্ধুরা বলবে, ও মৃত্যুর আগে মায়ের আদর পেয়েছিল। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। ও বীর শহীদ। ইতিহাস ওকে মনে রাখবে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আয়শা খাতুন ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কাঁদে মারুফ আর মেরিনাও। শুধু আকমল হোসেন নিজের হাতের কাগজটি টেবিলে বিছিয়ে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখেন। যুদ্ধের নিরেট সত্যে তার মগজ থমথমে। ওখানে আবেগের জায়গা নেই। কঠিন স্বরে ডাকেন, মারুফ।

জি, আব্বা।

তুমি একজন গেরিলাযযাদ্ধা। মেলাঘরে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছ।

জি, আব্বা।

তাহলে এমন ভেঙে পড়েছ কেন? যুদ্ধে প্রশ্রয়ের বাড়াবাড়ি থাকে না। মায়ের চোখের পানিও তাকিয়ে দেখতে হবে না। তুমি এখন গ্রেনেড, স্টেনগান, প্রয়োজনে আরও বড় অস্ত্র। যুদ্ধের সময় তোমার শরীর তোমার নয়।

আব্বা! মেরিনার ভয়ার্ত কন্ঠ ঘরের ভেতর ধ্বনিত হয়। ওর শরীর কার, আব্বা?

দেশের এবং স্বাধীনতার। আকমল হোসেনের কন্ঠস্বর ভাবলেশহীন। চেহারায় ভাবান্তর নেই।

আয়শা খাতুন দুহাতে চোখের পানি মুছে ঘড়ঘড়ে কন্ঠে বলেন, তুমি এভাবে বললে?

হ্যাঁ, বললাম। তারপর মেয়ের দিকে ঘুরে বলেন, মা মেরিনা, তোমার শরীরও তোমার না।

আয়শা খাতুন গলা উঁচিয়ে বলেন, এসব কী বলছ তুমি।

যা বলছি, ঠিকই বলছি। মেরিনার শরীরও দেশের এবং স্বাধীনতার। যুদ্ধের সময় কারও শরীরের দাবি তার নিজের থাকে না।

মেরিনা দুহাতে মুখ ঢাকে। এক নিষ্ঠুর অনুভব তার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে ঘর। কারও মুখে কথা নেই। একটু পর মারুফ নিজের মতো করে বলতে থাকে, এই বাড়ি আমাদের দুর্গ। এখানে অস্ত্র আছে, খাদ্য আছে। গেরিলা অপারেশন পরিকল্পনা করার সুযোগ আছে। বয়সীদের সহযোগিতা আছে। প্রস্তুতির জন্য সাহস সঞ্চয়ের নেপথ্য শক্তি আছে। দুর্গের সবাই যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে। তাহলে দুর্গে আর কী থাকে? মারুফ বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, আব্বা, একটি দুর্গে কী কী থাকে?

ঘরের তিনজন মানুষই একযোগে মারুফের দিকে তাকায়।

আব্বা, আপনি কি কোনো দুর্গ দেখেছেন?

ঢাকা শহরে লালবাগ দুর্গ আছে। তোমাদের তিন-চারবার নিয়ে গিয়েছি সেখানে।

এই দুর্গের কথা বলছি না।

আমি ধরে নিয়েছি তুমি ইতিহাসের দুর্গের কথা বলছ। বই পড়ে তেমন দুর্গের ধারণা আমি করি।

আপনার কি মনে হয় আমাদের বাড়িটি একটি দুর্গ?

আসল দুর্গ নয়, তবে দুর্গের ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছে এ বাড়ির।

গেরিলারা এলে এ বাড়ির মাটি খুঁড়ে আমরা অস্ত্র বের করব। আপনি তার তত্ত্বাবধান করবেন। তারপর প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন।

এই বাড়িটা জনযুদ্ধের দুর্গ। এসো, আমরা এখন ম্যাপ দেখি।

আকমল হোসেন সোফায় বসে থাকেন। মাঝের টেবিলটা টেনে তার সামনে রাখা হয়েছে। তিনজনে টেবিলের চারপাশে জড়ো হয়। আয়শা খাতুনকে একটি মোড়া দেয় মেরিনা। মারুফ আর ও মাটিতে বসে।

এই দেখ, এখান দিয়ে আসবে ওরা। ওরা নদীপথে আসবে। চালের বস্তাভর্তি নৌকায় আসবে। ওদের অস্ত্রগুলো ওসব বস্তার আড়ালে লুকানো থাকবে। নদীর ওপার থেকে অস্ত্র এনে রায়েরবাজারের এই বাড়িতে ওঠানো হবে। একতলা টিনের বাড়ি। সামনে উঠোন আছে। উঠোনে আম-কাঁঠাললেবু-আতাগাছের আড়াল আছে। এই পথে আসার জন্য এই জায়গাটি গেরিলাদের এন্ট্রি পয়েন্ট। আমার মনে হচ্ছে, ওরা এতক্ষণে শহরে ঢুকে গেছে। আজ সকালেই আমি ওই বাড়ির সবকিছু দেখেশুনে এসেছি। মোয়াজ্জেমকে

বলে এসেছি কী করতে হবে না-হবে। আশা করি, সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললে ওরা অল্পক্ষণে পৌঁছে যাবে।

মারুফ আয়শা খাতুনের দিকে তাকিয়ে বলে, সেটাই হবে আমার মায়ের জন্য সবচেয়ে আনন্দের সময়। অপেক্ষার সময় মাকে অস্থির করে রেখেছে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস তুই। তা ছাড়া এই বাড়িটাকে যদি আমরা দুর্গ বলি, তবে তোর মা এই দুর্গের রক্ষক।

আয়শা খাতুন বিচলিত না হয়ে বলেন, বাড়িতে অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা তুমি নিজে করো। রক্ষক আমি একা নই। ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুমিই তুলে দাও।

একদিন আমি না থাকলে ওই কাজটিও তোমাকে করতে হবে।

মারুফ দ্রুতকণ্ঠে বলে, একদিন আমরা কেউই না থাকতে পারি, আব্বা। এই আমি কাল যে অপারেশনে যাব, সেখান থেকে জীবিত না-ও ফিরতে পারি। কিংবা আর্মি যদি এই বাড়িতে আসে এবং তোমার লুকানো জায়গা থেকে অস্ত্র খুঁজে বের করতে পারে, তাহলে তো আমাদের কারও রক্ষা থাকবে না।

মারুফের কথা শেষ হলে অকস্মাৎ ঘর নীরব হয়ে যায়। একটুক্ষণের নীরবতা মাত্র। পরক্ষণে চেঁচিয়ে ওঠে মেরিনা, আমাদের এভাবে ভাবা উচিত না, একদম না। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে যে আমরা যুদ্ধ করছি। আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতার জন্য যত দিন প্রয়োজন তত দিন যুদ্ধ করব। দেশটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেলে, পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমরা সেই ছাইয়ের ওপর ফিনিক্স পাখি হয়ে জেগে উঠব। আমাদের কোনো ভয় নেই, আব্বা।

তোদের সাহস আছে বলে আমাদেরও কোনো ভয় নাই রে, ছেলেমেয়েরা–

আমারও কোনো ভয় নাই। ওদের জন্য আমার বাড়িতে গরম ভাত থাকবেই, যেন ওরা বলতে না পারে যে ক্ষুধার জ্বালায় আমরা অস্ত্র হাতে নিতে পারিনি।

আবার ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। আকমল হোসেন নিজের হাতে আঁকা ম্যাপটি দেখেন। আয়শা খাতুন মেয়ের ডান হাত টেনে নিজের কোলের ওপর রাখেন। বাম হাত বাড়িয়ে মারুফের হাত ধরেন। মৃদুস্বরে বলেন, বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করতে বলেছেন। আমরা তৈরি করতে পেরেছি। প্রয়োজনে। রক্তও দেব।

স্ত্রীর কথার সূত্র ধরে আকমল হোসেন মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেই বলেন, তাঁর ডাকে দেশের মানুষ জেগেছে। একজন নেতা একলা থাকতে পারেন না। মানুষকে জাগানোই নেতার কাজ। দেখা যাক, কী হয়।

কী হয় বলবেন না, আব্বা। হবেই। স্বাধীনতা শব্দটিকে আমাদের বুকের ভেতর নিতে হবে। তারপর যাবে মাথার ওপরে। তারপর উড়বে আকাশে। পিছু হটার রাস্তা আমরা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি।

ঠিক। আকমল হোসেন চোখ বড় করে সবার দিকে তাকালেন। তার উচ্চারিত ঠিক শব্দ বদ্ধ ঘরের ভেতরে ধ্বনিত হয়। সে শব্দ নিজের ভেতরে নিয়ে আয়শা খাতুন গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করেন। বাড়ির সবাই জানে, গুনগুন করে গান গাওয়া আয়শা খাতুনের প্রিয় অভ্যাস। রান্নাঘরে কাজের সময় তিনি গান করেন। অবসরে তো করেনই। রাতে খাওয়ার পর ডাইনিং টেবিলে বসেই সবার অনুরোধে তাকে গাইতে হয়। মেজাজ ভালো থাকলে তিনি গান গাইতে না করেন না। রবীন্দ্র-নজরুলসংগীত গেয়ে থাকেন। কিংবা হামদ-নাত বা কীর্তন। নিজে নিজে শেখা এসব গানের সুর নিয়ে তিনি ভাবেন না। শুনে শুনে শেখা হলেও সাধ্যমতো শুদ্ধ সুরে গাইতে চেষ্টা করেন। আকমল হোসেন বিবাহবার্ষিকীতে তাঁকে গানের বই উপহার দেন। তাঁর ভান্ডারে অনেকগুলো গানের বই আছে। আজও তার গুনগুন ধ্বনিতে গানের বাণী উচ্চারিত হয়—ওই শ্রাবণের বুকের ভেতর আগুন আছে

মারুফ জানে, এটি মায়ের প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত।

মেরিনার মনে হয়, বৈশাখ মাসে মা শ্রাবণের গান গাইছেন। বেশ লাগছে শুনতে।

আকমল হোসেন ভাবেন আয়শা একটি দারুণ গান গাইছে। এই গানটি এই সময়ে এই বাড়িতে খুব দরকার ছিল।

আয়শা খাতুনের গুনগুন ধ্বনি ঘরে আর আবদ্ধ থাকে না। জানালার দুই পাল্লার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছড়াতে থাকে। এই সময় গেরিলাযযাদ্ধারা এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে বুঝতে পারবে গানের সুর ওদের জন্য আবাহন সংগীত। এখনই সময় একটি গেরিলা অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়ার।

তখন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়

তখন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

সামনের দরজা দিয়ে ঢেকে দুজন। ওমর আর কায়েস।

এসো, বাবারা।

আয়শা খাতুন দুহাত বাড়ালে ওরা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। আকমল হোসেন ওদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। একটু পরে গ্যারেজের পাশের দরজায় শব্দ হয়। ছুটে যায় মারুফ। দরজা খুললে ঢোকে তিনজন। মিজারুল, স্বপন আর ফয়েজ।

এসো, বাবারা।

ওরা আয়শা খাতুনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

ভালো আছেন, খালাম্মা?

তোমাদের দেখলে ভালো থাকার সাধ বেড়ে যায়। বসো।

মেরিনা ততক্ষণে জগভর্তি পানি আর গ্লাস নিয়ে আসে। ওদের পানি খাওয়া শেষ হলে আকমল হোসেন জিজ্ঞেস করেন, রাস্তা কেমন দেখলে?

এতক্ষণে রাস্তা নীরব হয়ে গেছে।

মানুষজন গেরিলাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ওমর দুহাত তুলে বলে, আজ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

প্রশ্ন না করে সবাই ওর দিকে তাকায়।

আমি আর কায়েস এক রিকশায় এসেছি। রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করেছে, আপনারা কোথায় যাবেন, ভাইজান? আমি বললাম, হাটখোলায়। ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে তো আমি জানি। রিকশায় ওঠার সময় বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আপনারা আরও কোথাও যাবেন। জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন মনে হলো তোমার? বলল, এমনি মনে হলো। আপনাদের দেখে মনে হলো, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। নেবেন আমাকে? বলেছি, আর একদিন। আজকে আমরা মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাব। আমাদের তাড়া আছে। ও মৃদু হেসে বলল, আমি জানি, আপনাদের তাড়া আছে। আমরা তো এ বাড়ি থেকে বেশ অনেকখানি দূরে নেমেছি। ওকে ভাড়া দিতে গেলে বলল, যেদিন আবার দেখা হবে সেদিন ভাড়া নেব। আজ থাক। এই বলে ও রিকশা নিয়ে চলে যায়। আমাদের দিকে পেছন ফিরে তাকায় না। ও চোখের আড়ালে চলে গেলে আমরা অন্য গলিতে ঢুকে আবার অন্যদিকে বের হয়ে এই বাড়িতে আসি।

আকমল হোসেন ঠান্ডা মাথায় শান্তস্বরে বলেন, মে গড ব্লেস ইউ, মাই বয়েজ।

ওদের নিয়ে আমার ঘরে যাই, আব্বা?

হ্যাঁ, যাও। অপারেশন-পরিকল্পনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে ডেকো।

আপনি তো কালকে আমাদের নিয়ে গাড়ি চালাবেন?

হ্যাঁ, কাল আমিই তোমাদের চালক। এখন তোমরা কিছুক্ষণ রেস্ট নাও। খাবার টেবিলে বসে তোমাদের অন্য কথা শুনব।

যোদ্ধারা মারুফের পিছু পিছু ওর ঘরে যায়। ওরা সে ঘরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় আয়শা খাতুনের কণ্ঠে গুনগুন গান। তিনি কাজ করতে করতে গাইছেন, ওই শ্রাবণের বুকের ভেতর আগুন আছে–

ছেলেরা বিছানায়-মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। কেউ হাঁটু মুড়িয়ে, কেউ কাত হয়ে। কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তখন প্রশ্নটি ওমরকে করে মারুফ। প্রশ্নটি এতক্ষণ ওর বুকের ভেতর খচখচ করছিল। বলে, রিকশাওয়ালার কথায় তোর কী মনে হয়েছে, মারুফ?

ওমর নির্বিকার কণ্ঠে বলে, আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। এত সহজে সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়া উচিত নয়। আমরা সাধারণ মানুষের ছায়ায় মিশে থাকব, কিন্তু কেউ আমাদের চিনতে পারবে না।

স্বপন সোজা হয়ে বসে বলে, হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়েছে। ওরা এত তাড়াতাড়ি আমাদের চিনবে কেন? কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের বড় ধরনের বোকামি হয়েছে।

মিজারুলও তা-ই বলে, আমিও তা-ই ভেবেছি। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে খালেদ মোশাররফ বলেন, গেরিলাযুদ্ধ কাউবয় অ্যাডভেঞ্চার নয়।

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ে।

ঠিক।

আমাদের উত্তেজনা কমাতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে।

বাইরে থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসে। সঙ্গে প্রবল আর্তচিৎকার। ওরা পরস্পরের হাত চেপে ধরে। মেরিনা হাতে ট্রে-ভর্তি চায়ের কাপ আর স্যান্ডউইচ নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। পেছন থেকে আকমল হোসেন হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচ অফ করে দেন। অন্য ঘরের বাতিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুরো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে যায়। সবাই স্তব্ধ হয়ে কান পেতে আর্তচিৎকার শোনে। কিছুক্ষণের মধ্যে চিকার থেমে যায়। রাস্তায় আর্মির গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ হয়। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। শুধু আকমল হোসেন ঘড়ঘড়ে গলায় বলেন, আল্লাহ মালুম, কয়জন গেল!

মেরিনা পাশে দাঁড়িয়ে বলে, একজনের বেশি, আব্বা। চিক্কার একজনের ছিল না।

আমারও তা-ই মনে হয়েছে, মা। চিৎকার কয়েকজনের ছিল।

গেরিলাদের কেউ একজন বলে, প্রতিশোধ।

ওরা একসঙ্গে বলে, মৃত্যুর বদলে মৃত্যু চাই।

মেরিনা ঘরের মধ্যে এক পা বাড়িয়ে বলে, ভাইয়া, তোমাদের চা।

দে। মারুফ উঠে ট্রেটা নেয়। তোমরা স্যান্ডউইচ খাও। আমি পানি আনছি।

মেরিনা বাবার হাত ধরে।

আব্বা, আপনাকে চা দেব?

হ্যাঁ, দে মা। আমি ডাইনিং টেবিলে আসছি। তোর মা কই? সাড়া পাচ্ছি না যে?

বুঝতে পারছি, গুলির শব্দ শুনে মা গান থামিয়েছেন।

তোর মাকে গুনগুন করতে বল। গুলির বিপরীতে গান তো গাইতে হবে। গুলি মৃত্যু হলে গান জীবন।

আপনার কথা খুব কঠিন, আব্বা। আপনি নিজে মাকে গুনগুন করতে বলেন।

আকমল হোসেন হেসে মেয়ের মাথায় হাত রাখেন। আয়শা খাতুন তখন রান্নাঘরে বসে প্রতি ঘরের জন্য একটি করে মোমবাতি জ্বালান। মোমবাতির মৃদু আলো দেবদূতের উড়ে আসার কথা মনে করিয়ে দেয়। আয়শা খাতুন প্রতিটি মোমের শিখার দিকে তাকিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করার মতো করে বলেন, আজ বোধ হয় আমার জন্মদিন। কোন তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল, আমার মা তা আমাকে বলতে পারেননি। আমি তো নিজে নিজে একটা দিন ভাবতেই পারি।

আকমল হোসেন দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকেন, আয়শা।

বলল, শুনছি। কয়জন চিৎকার করেছে বলে তোমার মনে হয়?

তিন থেকে পাঁচজন।

আমার মনে হয় ওরা তিনজনই ছিল।

কাল সকালে হয়তো আমরা লাশগুলো পাব।

হাসপাতালে নিয়ে যাবে, নাকি কবরস্থানে?

সরাসরি কবরস্থানে যাওয়া তো উচিত। গাড়ি চলাচলের জন্য ওরা রাস্তা পরিষ্কারও করতে পারে।

হ্যাঁ, সে জন্য ওরা হয়তো লাশগুলো নিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে মাটিচাপা দিতে পারে। দাফন করবে না।

ওরা কারা হতে পারে? সাধারণ মানুষ, নাকি গেরিলা।

আকমল হোসেন দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, আমি জানি না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলেন, এই শহরে যারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে মিশে যায়নি, তাদের সবাই গেরিলা—যোদ্ধা কিংবা সহযোগী। শহরের সব মানুষের চরিত্র এখন এমন।

আয়শা খাতুন তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকান। আকমল হোসেন থমকে গিয়ে ভাবেন, আয়শা খাতুন এই মুহূর্তে এমন অচেনা কেন?

মেরিনা পাশে এসে দাঁড়ায়।

আপনাদের কী হয়েছে?

ওদের পানি দিয়েছিস?

দিয়েছি। ওরা এক জগ পানি শেষ করে আরেক জগ পানি চেয়েছে। আমি দেখেছি পাঁচজনই দুই গ্লাসের বেশি পানি খেয়েছে।

খেতেই পারে। তাই বলে ওরা ক্লান্ত নয়।

আমি ওদের ক্লান্ত বলিনি, মা।

তৃষ্ণার্ত বলতে চেয়েছ?

আমি জানি না, আমি কী বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি শুধু আমার দেখার কথা বলেছিলাম। ঠিক আছে, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

মায়ের কাছ থেকে একটি মোমবাতি উঠিয়ে নিয়ে মেরিনা নিজের ঘরে যায়। বাবা-মা দুজনের কেউই আর কথা বলেন না। শুধু মারুফের ঘর থেকে পাঁচজন যোদ্ধার নানা কথা ভেসে আসছে। তার অনেক কিছুই বোঝা যায় না। মেরিনা নিঃশব্দে নিজের ঘরের

দরজা ভেজিয়ে দেয়। এই একলা ঘরে বাইরের পৃথিবী ওর কাছে নিবিড় হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী ও। অনার্স শেষ করেছে। মাস্টার্স পরীক্ষা হয়নি। এখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। গেরিলাবাহিনীর যুদ্ধ। পড়ার টেবিলের ওপর মোমবাতি রেখে চেয়ার টেনে বসে। খাতা-বই উল্টায়। এলোমেলো করে রেখে দেয়। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের একটি বাক্য সাদা কাগজে লিখতে থাকে—দ্য সান ইজ নিউ এভরি ডে। বাক্যটি বারবার লিখে, কাটে। ওই বাক্যের ওপর ফুলপাখি আঁকে। পতাকা আঁকে। বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকে। ছবি আঁকার সহজাত ব্যাপার আছে ওর ভেতর। পড়তে চেয়েছিল আর্ট কলেজে। পরে সিদ্ধান্ত বদলায়। ভাবে, এই বাক্যটিতে সুর দিলে গান হবে—সান ইজ নিউ এভরি ডে-ও গুনগুন করার চেষ্টা করে। ভালো লাগে না। খাতা বন্ধ করে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখে। ভাবে, সূর্য তো প্রতিদিন নতুন করে ওঠে। এই আমিও নতুন সূর্য দেখি। কারণ, আমি কখনো এক রকমভাবে সূর্য দেখি না। সূর্য ওঠার বৈচিত্র্য আছে। প্রতিদিন সূর্য ওঠে, আমরা সবাই এমন কথা বলেই থাকি, ভাবি না যে এই ওঠা দেখার মধ্যে মানুষের ভাবনার সূত্র থাকে। এই ভাবনার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের দিন গোনে। এখন এই শহরের মানুষ দিন গুনছে। প্রতিদিন নতুন সূর্য দেখছে। একদিন এই দেশের মানুষের কাছে সূর্যটা আকাশ ভরে উঠবে। পূর্ব-পশ্চিমউত্তর-দক্ষিণ—আকাশের সবটুকু জুড়ে উঠবে। সে জন্যই তো এই বাড়িটা এখন একটা দুর্গ। এখান থেকে নতুন সূর্য দেখার যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। শহরের অনেক বাড়ি এমন দুর্গ হয়েছে।

মেরিনা দুহাতে মুখ ঢাকে।

দরজা ফাঁক করে ঢোকে মন্টুর মা।

আপা।

মেরিনা মাথা ঘুরিয়ে তাকায়।

কী বলবেন? মা ডাকছে।

হ্যাঁ। আসেন। তারপর দুপা বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে বলে, ভাইজানরা কোথায় যুদ্ধ করবে?

ঢাকায়। এই শহরের একটি এলাকায় ওরা অপারেশন চালাবে।

এত ছোট জায়গায় যুদ্ধ হয়?

হয় খালা, হয়। আবার দেশের সীমান্তে বড় আকারের যুদ্ধ হয়।

কী যে দিন শুরু হলো। আমার এখন গেরামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য মন পোড়ে। আমি বেশি দিন থাকব না। অল্প কয়েক দিন থেকেই চলে আসব।

বাড়িতে তো আপনার কেউ নাই। যেতে হবে কেন?

আমি চাই, আমার মরণ দেশের বাড়িতে হোক। গ্রামের মাটি আমার আসল জায়গা। ওই মাটির নিচে শুয়ে থাকতে চাই। ঢাকা শহরে আমি কবর চাই না।

পাগল, এখনই এসব কথা ভাবতে হবে না। স্বাধীনতা দেখার আগে মরার কথা ভাববেন না। আপনি না বলেন, হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে।

বলি তো। ছোটবেলা থেকে তো এমনই শিখেছি।

তাহলে ভাবাভাবির কিছু নেই। মৃত্যু যখন হওয়ার হবে। চলেন, ভাত খেতে যাই।

মন্টুর মা অকারণে হাসে। কাপড় টেনে মাথা ঢাকে। দুহাত গালে ঘষতে ঘষতে বলে, এশার নামাজ পড়ার সময় আল্লাহরে বলি, আল্লাহ মাবুদ, আজ রাত পোহালে এক দিনের আয়ু পাব। না পোহালে। কথা শেষ করে না মন্টুর মা। দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

ডাইনিং টেবিল সরগরম হয়ে উঠেছে। নিচুস্বরে কথা হলেও গমগম করে ঘর। তিনটে অতিরিক্ত চেয়ার দিয়ে সবার বসার জায়গা করা হয়েছে। মারুফ আর মেরিনা নিজেদের প্লেট হাতে তুলে নিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালানো হয়েছে। আলো জ্বলছে শুধু রান্নাঘর আর ডাইনিংরুমে।

খেতে খেতে কায়েস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আমাদের জন্য এতকিছু রান্না করেছেন, খালাম্মা?

আয়শা খাতুন মৃদু হেসে বলেন, তোদের মন ভরলে আমি খুশি।

আকমল হোসেন এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে বলেন, যুদ্ধের সময় সব খাবারই সমানভাবে খেতে হয়।

মিজারুল দ্রুতকণ্ঠে বলে, আমরা সেভাবেই খাই, খালুজান। মেলাঘরের ক্যাম্পে বুটের ডাল আর রুটি খেতে আমাদের একটুও খারাপ লাগে না। বাড়িতে এলে মায়েদের ভালোবাসার রান্না আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। তবে না পেলে ক্ষতি নাই।

আকমল হোসেন শান্ত কণ্ঠে বলেন, বুঝেছি, তোমরা রিয়াল ফাইটার। তোমাদের মেলাঘরের খবর কী? শুনতে পাচ্ছি, শহরের শত শত ছেলে গিয়ে ওখানে জড়ো হয়েছে।

একদম ঠিক, খালুজান। আমাদের মতো ছেলেরা যুদ্ধ করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ঢাকা থেকে ত্রিপুরা বর্ডার কাছে। তাই পার হওয়া সহজ। ওখানে আছেন দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন।

সে আমি বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তিনি একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছেন।

হ্যাঁ, করেছেন। আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার পরে ঠিক হয়েছে এই স্কোয়াডের ১৬ জনের একটি দলকে ঢাকায় পাঠানো হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা এসেছি। আমাদের প্রত্যেককে চারটি করে গ্রেনেড আর ২০ পাউন্ড বিস্ফোরক দেওয়া হয়েছে।

আরও লাগবে। অস্ত্র, গোলাবারুদ—

সব পাব, খালুজান। আস্তে আস্তে আসবে।

তোমাদের এখনকার কাজ শহরটাকে চাঙা করে তোলা। রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলাবাহিনী। সঙ্গে সাধারণ মানুষ। গেরিলারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে থাকবে।

ঠিক বলেছেন, খালুজান।

গেরিলাদের কণ্ঠে উৎসাহের ধ্বনি।

মেলাঘরে আমাদের প্রশিক্ষণ দেন ক্যাপ্টেন হায়দার। ক্যাম্প ভিজিটে এসে তিনি তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আমাদের চাঙা করে তুলেছিলেন। বলেছিলেন, কোনো স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহীদ।

আয়শা খাতুন খানিকটা অস্বস্তির কণ্ঠে বলেন, এসব কথা থাক, বাবারা। তোমরা ভাত খাও।

আমরা পেট পুরে খাব, খালাম্মা। আপনি একটুও ভাববেন না। আপনারা আছেন বলেই তো আমরা যুদ্ধের মায়ায় নিজেদের ভরাতে পারি।

আমরা ঢাকা শহরে আতঙ্ক তৈরি করব। আমরা হলাম ক্র্যাক প্লাটুন।

আকমল হোসেন শব্দ করে হাসেন। হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়ে এক চুমুক পানি খেয়ে বলেন, আমি তো জানি তোমাদের কাজ হবে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। ওদের বুঝিয়ে দেওয়া যে ওরা যা করছে, সেটা সহজে মেনে নেবে না বাঙালিরা।

ঠিক, খালুজান। ওদের আমরা ব্যতিব্যস্ত করে রাখব। একদিকে গ্রেনেড ফাটা সামলাতে সামলাতে ওরা দেখবে ওদের পেছনে আরেকটি ফেটেছে। ওটা সামলে ওঠার আগেই আরেকটি ফাটবে। আমাদের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এমনই বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিদেশি সাংবাদিক এবং ডোনারদের বোঝাতে হবে যে পাকিস্তান সরকার যে শান্ত পরিস্থিতির কথা প্রচার করছে, পূর্ব পাকিস্তানে সেই পরিস্থিতি নেই। বীর বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর নাকের ডগায় গেরিলা অপারেশন চালাচ্ছে।

বুঝেছি, তোমরা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়েছ। আমার বুকের ছাতি দশ হাত বেড়ে গেল, বাবারা।

এটুকু বলে আকমল হোসেন আবার পানি খান। বলেন, আমার বাড়িতে একটা দুর্গ গড়ে তোলা আজকে সার্থক মনে হচ্ছে। আমার ছেলে যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, সেদিন আমাকে আর ওর মাকে কিছু বলে যায়নি। শুধু মেরিনা জানত। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই ও বেরিয়ে যায়। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে এক টুকরো পাউরুটি আর সেদ্ধ ডিম খেয়েছে। মেরিনা চা দিলে বলেছিল, খাব না। যেতে হবে। অন্যরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তুই বাবা-মাকে দেখে রাখিস। মেরিনার কাছ থেকে এটুকু শুনে আমি ভেবেছিলাম, মেয়েটি আমাকে রূপকথার গল্প বলছে। সেদিন ওর মা খুব কেঁদেছিল। আমি বেকুব বনেছিলাম। কাঁদতে পারিনি। শুধু নিজেকে বুঝিয়েছি যে এটাই বাস্তব। এমনই তো হওয়া উচিত। আজ তোমাদের পেয়ে আমার মনে হচ্ছে, তোমরা সোনার কাঠি, রুপার কাঠি এনেছ। আর ঘুমানোর সময় নেই। আকমল হোসেন থামলে যোদ্ধারা তার মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে। আয়শা খাতুন আবার বলেন, তোমরা খাও, বাবারা।

কিন্তু কেউই চোখ নামাতে পারে না। ভাতের গ্রাসও মুখে তোলে না। ওদের মনে হয়, আকমল হোসেন আরও কিছু বলবেন। তখন তিনি বলেন, যেদিন ইয়াহিয়া খান পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করল, সেদিন থেকেই আমরা যুদ্ধে ঢুকে পড়ি। এ নিয়ে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বঙ্গবন্ধু আমাদের এ পথেই পরিচালনা করবেন। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পর আমরা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরিতে যুক্ত হই। এখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। সীমান্তে হবে সরাসরি যুদ্ধ। আর গেরিলা অপারেশন হবে সরাসরি যুদ্ধের নেপথ্য ক্ষেত্র। শহীদ এবং স্বাধীনতা শব্দ দুটোকে আমরা এক সুতায় গেঁথে গলায় পরেছি।

তিনি থামলে ছেলেরা একসঙ্গে বলে, ঠিক। ঠিক, খালুজান। আপনি আমাদের দোয়া করবেন।

ওরা ভাতের থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে। খেতে শুরু করে। অন্যদিকে তাকায় না। আয়শা খাতুন ওদের প্লেটে এটা-ওটা তুলে দেন। ওরা আপত্তি করে না। খাওয়া শেষে মেরিনা যখন কাউন চালের পায়েস নিয়ে আসে, তখন মিজারুল মৃদুস্বরে বলে, আমরা কি পারব?

মেরিনাও ফিসফিসিয়ে বলে, পারতে হবে। যুদ্ধের সময় পারব না কথা কেউ শুনতে চাইবে না।

আরে বাবা, ফিলসফারের মতো কথা বলছ।

চুপ করেন, মা শুনবে।

খালাম্মা রান্নাঘরে, খালুজান হাত ধুতে গেছেন। বাকি আমরা সবাই শুনেছি।

তখন আকমল হোসেনের চপ্পলের শব্দ পেয়ে ওরা সোজা হয়ে বসে। আকমল হোসেন ডাইনিং টেবিলের দিকে আসতে আসতে বলেন, তোমাদের সঙ্গে আরেকটু সময় কাটাতে

চাই, বাবারা। তোমাদের এখনো পায়েস খাওয়া হয়নি দেখে আমি খুশি। পায়েস খেতে খেতে যেটুকু সময় তোমাদের কাছ থেকে পাব, এটাও আমার বড় পাওয়া।

মেরিনা বাবার সামনে পায়েসের বাটি রেখে বলে, মায়ের রান্নাটা তাহলে আপনারই বেশি কাজে লাগল। তাই না, আব্বা?

নাহ্, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পারা যায় না। সময়মতো দিল আমাকে ঘায়েল করে।

মেরিনা হাসতে শুরু করলে আকমল হোসেন নিজেও ওর পিঠ চাপড়ে হাসতে শুরু করেন। পায়েসের বাটি টেনে নিয়ে মুখে এক চামচ দিয়ে বলেন, এই বিষয়টি তোমাদের আমি পরে বলব।

ছেলেরা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না। যার যার সামনে রাখা পায়েসের বাটি থেকে খেতে শুরু করে। প্রত্যেকের মনে হয় আজ এক অন্য রকম পায়েস খাওয়া হচ্ছে। মেরিনার কাছে আরেকটু চাওয়ার সুযোগ আর হয়ে ওঠে না।

আকমল হোসেন পায়েস শেষ করে বাটিটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, দশ দিনের সফরসূচি নিয়ে বিশ্বব্যাংক এখন ঢাকায়। প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান ঢাকায়। তিনি জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর রিফিউজিজ। তারা ঢাকার পরিস্থিতি বুঝতে এসেছে। পাকিস্তান সরকার তাদের বোঝাতে পারছে না যে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে, তা কেবল কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ মাত্র।

ছেলেরা উদগ্রীব হয়ে শোনে। কারও মুখে কথা নেই। স্বপন বলে, আমরা এতকিছু জানি না।

তোমাদের জানার জন্য বলছি, বাবারা। পাকিস্তান সরকার এদের বোঝাতে চাইছে যে বিদ্রোহীদের দমন করার পর আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। সশস্ত্র সেনাবাহিনী রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজে প্রাদেশিক সরকারকে সহযোগিতা দিচ্ছে।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় অনবরত প্রচারের পরও পাকিস্তান সরকার তাদের চোখে ধুলো দিতে পারছে না।

কায়েস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করা তো কঠিন, খালুজান। সীমান্তের ওপারে থেকেও আমরা ছিটেফোঁটা খবর পাচ্ছিলাম।

আপনার কাছে আমরা আরও শুনতে চাই, খালুজান। এসব জানা থাকলে আমাদের অপারেশন পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে।

বাদল কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজিত কায়েসকে হাত টেনে চেয়ারে বসায়। অন্য ছেলেরা উসখুস করে। ষড়যন্ত্রের সুতা ছিঁড়তে চায়। ওদের চেহারা কাঠিন্যে ঢেকে যায়। ওরা বুঝতে পারে, এই সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। তখন আকমল হোসেন বলতে শুরু করেন আবার, এখনকার সংবাদপত্র আমাদের সবকিছু সরাসরি বলে না। খবরের ভেতর থেকে আমাদের না-বলা খবর বুঝে নিতে হয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এইড-টু পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের চেয়ারম্যান পিটার কারগিল তার সহকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় কেন, জানো? ওরা এসেছে নানা কিছু যাচাই করতে। যেমন পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের যাচাই, মে-জুন মাসের কিস্তি তিন কোটি ডলার শোধ দেওয়া এখন সম্ভব নয় বলে ছয় মাস সময় চেয়ে পাকিস্তান সরকারের আবেদন, এমন কিছু বিষয়। আবার জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যে সাহায্য দেওয়া হবে, তা জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। পাকিস্তান সরকার এই সিদ্ধান্তে রাজি নয়। তারা বিবৃতি দিয়েছে যে এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগের কারণে যেসব পাকিস্তানি বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীদের হুমকির মুখে সীমান্তের অপর পারে চলে গেছে, তাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করবে। এ জন্য ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার বিভিন্ন পথে অভ্যর্থনাকেন্দ্র খোলা হবে। এসব বিষয় দেখার জন্য এসেছেন প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান।

খালুজান, এরা সবাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছে। তাই আমাদের লক্ষ্য এদের নাকের ডগায় গ্রেনেড ফাটানো। ওরা যেন বুঝতে পারে, পরিস্থিতি মোটেই শান্ত নয়।

ঠিক। এভাবে রেগুলার আর্মির পাশাপাশি চাই গেরিলাবাহিনী। আমিও তোমাদের সঙ্গী একজন গেরিলা।

ওরা চেয়ার ছেড়ে উঠে আকমল হোসেনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

আব্বা, আমি পারলে আপনাকে মেলাঘর ক্যাম্পে নিয়ে যেতাম।

তুমি যখন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে গেলে তখন ভাবিনি যে বুড়ো বাবাও যেতে পারত। তারও সাহস আছে, যুদ্ধ করার শক্তি আছে।

মিজারুল দুহাত নেড়ে বলে, আপনি গেলে ঢাকা শহরের এই দুর্গ আমরা কীভাবে পেতাম।

ওমর আকমল হোসেনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, খালুজান, আমাদের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বলেন, ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার প্রচুর ছেলের দরকার। আমি যে কয়জন ছেলে পেয়েছি তা আমার জন্য যথেষ্ট নয়, তোমরা যে যত পারো ছেলেদের নিয়ে আসবে। আমি দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে গ্রহণ করব। প্রশিক্ষণ দেব। আপনি গেলে তিনি আপনাকেও ট্রেনিং দিতেন।

আকমল হোসেন হেসে বলেন, আপাতত আমি তোমাদের গাড়িচালক। তোমাদের প্রথম অপারেশনে আমি যে থাকতে পারছি, এটাই আমার ভাগ্য। আমরা অবশ্যই বিজয় নিয়ে ঘরে ফিরব।

ইনশা আল্লাহ। ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে, স্বাধীনতার লাল সূর্য আমরা ছিনিয়ে আনব।

কাছে এসে দাঁড়ান আয়শা খাতুন আর মেরিনা।

হইচই বেশি হচ্ছে, বাবারা।

আমাদের কন্ঠস্বর বাইরে যাবে না, খালাম্মা। পারলে তো আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতাম। এখন তো পারছি না। আপনি আমাদের কাছে বসেন, খালাম্মা।

মারুফ হাততালি দিয়ে বলে, বাবার মতো মা-ও আমাদের গেরিলাসহযোগী।

তোমরা কেউ বললে না, ভাইয়া, আমিও গেরিলা।

মিজারুল দুহাত তুলে বলে, তোমার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা তো জানি, তুমি আমাদের সঙ্গে আছ।

মেরিনা মায়ের ঘাড়ে মুখ রাখে। রান্নাঘর ছাড়া বাড়ির কোথাও আর বাতি জ্বলে না। রান্নাঘরের আলোয় ডাইনিংরুমে আলো-আঁধারি তৈরি হয়েছে, যেন আজ জ্যোৎস্না রাত। সবাই গেছে বনে। আয়শা খাতুনের বুক ধড়ফড় করে। একসময় মন্টুর মা রান্নাঘরের বাতি বন্ধ করে দেয়। টিমটিম করে মোমবাতির শিখা। তখন গুনগুন করে আয়শা খাতুন

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা...।

আস্তে আস্তে গুনগুন ধ্বনি বাড়তে থাকে। ছড়াতে থাকে ঘরে। ঘর থেকে বাইরে যায়। শহর নীরব। হঠাৎ দু-একটা আর্মির গাড়ি শাই করে চলে যায়। রাস্তায় কুকুর ডাকে না। শহরজুড়ে জেগে থাকে গেরিলাদের পায়ের শব্দ। ওরা চারদিক তোলপাড় করে আসছে। ঘিরে ধরছে শহর।

একসময় গান থামে।

আয়শা খাতুন আস্তে করে বলেন, ঘুমোত যাও, বাবারা। শরীর ঠিক রাখো। কাল তোমাদের অনেক কাজ।

ছেলেরা উঠে এসে আয়শা খাতুনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

দোয়া করবেন, খালাম্মা। এই মুহূর্তে আমাদের মা কাছে নেই। আপনি আমাদের মা।

মায়ের দোয়া ছাড়া ছেলেরা যুদ্ধে যাবে কী করে?

আয়শা খাতুন ওদের মাথায় হাত রাখেন। কারও কারও মাথার ওপর ঝরে পড়ে মায়ের চোখের পানি। সবার বুকের মধ্যে ধ্বনিত হয় একটি তারিখ। কাল ৯ জুন। ঢাকা শহরে গেরিলাদের প্রথম অপারেশন শুরু হবে। আয়শা খাতুন সবার মাথা কাছাকাছি টেনে ওদের মাথার ওপর হাত রেখে বলেন, জয় বাংলা।

ঘরের ভেতর জয় বাংলা ধ্বনি গমগম করে। সবাই মিলে বলতে থাকে। মন্টুর মা-ও সবার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, জয় বাংলা।

কেউ ঘড়ি দেখেনি। রাতের কোন প্রহর সেটা, কেউ জানে না। জানতেও চায় না। সবাই জানে, এখন ঘুমাতে যেতে হবে। কেটে যাবে রাত। ওদের সবার জীবনে আরেকটি নতুন সূর্য উঠবে।

সবার আগে ঘুম ভাঙে আকমল হোসেনের। দিনের প্রথম আলো দেখা তাঁর প্রিয় অভ্যাস। আগে রমনা পার্কে হাঁটতে যেতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আর যান না। নিরাপদ বোধ করেন না একদিকে, অন্যদিকে ভাবেন, তাঁর জীবনে একাত্তর অন্য রকম সময়। এই সময়কে অন্যভাবে সাজাতে হবে। নিজের বাড়িকে দুর্গ বানাতে হবে। গেরিলাযুদ্ধ নয়তো সীমান্তের রণক্ষেত্র। একটা জায়গা তো বেছে নিতেই হবে। নিজেকে যুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে না-পারা দেশ ও জাতির সঙ্গে বেইমানি করা। এমন একটি ভাবনা তিনি নিজের মধ্যে সক্রিয় রাখেন।

সকাল দশটার দিকে ওমর, কায়েস, মারুফ, স্বপন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের চারপাশ রেকি করতে যায়। আকমল হোসেন দুজনকে শাহবাগে নামিয়ে দেন। অপর তিনজনকে মিন্টো রোডের দিকে বড় নাগলিঙ্গম ফুল গাছের কাছে নামিয়ে দেন। মিজারুল তার সঙ্গে থাকে। রমনা থানার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার কোনায় তারা অপেক্ষা করবেন। বিভিন্ন সময়ে ঘোরাঘুরি করে জায়গা বদল করে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াবেন। বারোটার মধ্যে যে যার মতো ফিরে আসবে।

পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়। ছেলেরা নেমে যায়। মিজারুল পেছনের সিটে বসে আছে। আকমল হোসেন ঘাড় না ঘুরিয়ে বলেন, তোমার কী মনে হলো, মিজারুল?

সন্ধ্যায় ওদের আমরা গেটের আশপাশে নামাতে পারব, খালুজান। হোটেলের গেটের পাহারা তেমন জোরদার নয়। তেমন কোনো অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না।

আমিও তা-ই মনে করছি। এবার তো তোমরা শুধু আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য গ্রেনেড ছুড়বে। ওরা হকচকিয়ে যাবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝতে বুঝতে তোমরা সরে পড়বে।

মিজারুল আবার বলে, খালুজান, আপনি এখন কোথাও না দাঁড়িয়ে কাকরাইল হয়ে প্রেসক্লাবের দিকে চলে যান। তারপর শাহবাগ হয়ে আমরা আবার এদিকে আসব। ততক্ষণে ওরা ফিরে আসতে পারবে। আপনি কী বলেন?

হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তা-ই করি।

গাড়ি ঘুরে রমনা থানা পার হয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই যে যেদিকে আড়ালে ছিল সেদিক থেকে বের হয়ে গাড়িতে এসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট অন করে রাখা গাড়ি ছেড়ে দেন আকমল হোসেন। গাড়িতে ওরা হইচই করে। খানিকটুকু উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে, মনে হয় না কাজটা কঠিন হবে।

আমাদের সময়ও ঠিক আছে। উপযুক্ত সময় বলতেই হবে।

মারুফ বলে, ঠিক করেছি, গেটের পাশের দেয়াল টপকে আমি হোটেলের ভেতরে ঢুকে যাব।

তোমরা এখন থামো। চুপচাপ বসে থাকো। বাড়ি গিয়ে বাকি পরিকল্পনা হবে।

ছেলেরা কথা থামায়। পরস্পরের হাত চেপে ধরে। ওদের ভেতরে প্রবল উত্তেজনা টগবগ করে। ওরা বুঝতে পারে, স্বাধীনতার পক্ষে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষে জীবনের ঝুঁকির সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত। আর সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন হওয়া মানেই এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। ওদের গেরিলা অপারেশনের সবগুলো কার্যকর করা হলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কেমন করে সবাই এক হচ্ছে লক্ষ্যের দিকে। প্রবাসী সরকার বুঝবে যে ওরা পারছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঢাকা শহরকে জাগিয়ে রাখতে। আমাদের গেরিলাযোদ্ধারা-গেরিলা হো-হো-হো...। সুরের মতো বাজে শব্দের বাঁশি। আকমল হোসেন ভাবেন, আয়শা খাতুন গুনগুন করছেন। সেই গানের শব্দ এখন এই গাড়ির ভেতরে। মেরিনা গ্রেনেডগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখছে। সন্ধ্যায় এগুলো নিয়ে বের হবে গেরিলারা।

আর কয়েক ঘণ্টা পর সূচিত হবে একটি মাহেন্দ্রক্ষণ।

গাড়ি এসে থামে বাড়ির সামনে। গাড়ির পাশাপাশি দৌড়ে এসে আলতাফ গ্যারেজ খুলে দেয়। গ্যারেজে ঢোকানোর আগে গাড়ি থামান আকমল হোসেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের বলেন, নামো।

ওরা এক লাফে নেমে দুই লাফে বারান্দায় ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মেরিনা। হেসে বলে, সবাইকে বেশ উফুল্ল দেখাচ্ছে। বলব কি, ব্রাভো, গেরিলা ফাইটার।

মিজারুল থমকে দাঁড়িয়ে বলে, বলতে পারো। আস্তে করে বলো। তোমার গলা যেন রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।

এই সাহস হারালে চলবে কেন? চেঁচাব এখনই।

পেছনে বাবা আছে। অকারণে ধমক খেয়ো না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। টেবিলে লেবুর শরবত বানানো আছে। যে যার মতো খেয়ে ফেলেন।

দুপুরে কী?

মা আপনাদের সারপ্রাইজ দেবেন।

তাহলে চেঁচিয়ে বলি, জয় বাংলা, মামণি।

ছেলেরা ঢুকতে ঢুকতে বলতে থাকে, জয় বাংলা। দুর্গবাড়ি অমর হোক। বারান্দায় উঠে আসেন আকমল হোসেন। প্রবল ঘামে মুখ ভিজে আছে। গ্যারেজে আলতাফ বলেছিল, স্যার পানি খাবেন, তিনি না করেছিলেন। অনেক ঘেমে গেছেন স্যার, আলতাফের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল। তিনি বলেছিলেন, কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? একদম কাঠফাটা রোদ আরকি। আলতাফ হোসেনের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, আপনার অনেক ধকল গেছে কি, স্যার? তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, যুদ্ধে জড়ালে কোনো কাজকে ধকল বলতে হয় না, আলতাফ। কথাটা শুনে আলতাফ লজ্জা পেয়ে বলেছিল, আমি ভুল করেছি। আমার বলা উচিত ছিল জয় বাংলার সময় সব কাজই জয় বাংলা, স্যার।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

এটুকু বলে আকমল হোসেন বারান্দায় উঠেছিলেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল মেরিনা। বাবার ঘর্মাক্ত মুখ দেখে দ্রুতকণ্ঠে বলে, শরবত দেব, আব্বা?

কথা বলিস না। তোর মা কই?

গোসল করছেন।

ভালো হয়েছে। এক গ্লাস শরবত খেয়ে আমি বাথরুমে ঢুকব।

আপনাকে কখনো এত ঘামতে দেখিনি, আব্বা।

তোর মা দেখেছে। সে জন্য তোর মাকে আমার ঘামঝরা মুখ দেখাতে চাই না।

যা গরম পড়েছে! আপনি তো ঘামতেই পারেন।

সে তো ঘামতেই পারি। যুদ্ধের সময় না হলে এই ঘামভরা মুখ দেখলে তোর মা আমাকে বাথরুমে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু এখন দেবে না। অন্য কথা বলবে।

কী কথা, আব্বা? আপনার কথা শুনে আমি খুব অবাক হচ্ছি।

এখন আমাকে দেখলে তোর মা বলবে, তোমার আর ওদের সঙ্গে যেতে হবে না। তুমি এই বাড়ির অস্ত্রগুলো পাহারা দাও। তোর মা তো বলে আমাকে দুর্গের পাহারাদারই বেশি মানায়। সব কথা তো আর তোদের সামনে হয় না। রাতে ঘুমানোর সময় অনেক কথা হয়।

বোধ হয় ঠিকই বলেন, আব্বা।

তুই তোর মায়ের পক্ষে গেলি!

পক্ষে-বিপক্ষে না, আব্বা, মায়ের কথাটা আমার ঠিক মনে হয়েছে।

আকমল হোসেন মেয়ের কথায় সায় দেন না। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দুগ্লাস শরবত খান।

আব্বা, আপনি কি মন খারাপ করলেন?

মন খারাপ নয়। কথাটা ভেবে দেখার মতো। যাকে যেভাবে কাজে লাগানো যাবে, সেটাই হবে যুদ্ধের সময়ের স্ট্র্যাটেজি। দেখলি না, রোদে ঘোরাঘুরি করেও ছেলেরা কিন্তু ঘামেনি। ওরা ঠিকই আছে। ওরা তো কেউ শরবতও খায়নি দেখছি।

আমি ট্রে ভরে গ্লাসগুলো ভাইয়ার ঘরে দিয়ে আসব।

হ্যাঁ, তা-ই কর। সন্ধ্যার আগেই ওদের আবার বের হতে হবে।

আকমল হোসেন নিজের ঘরে যেতে যেতে দেখতে পান আয়শা খাতুন। গোসল করে বেরিয়েছেন। হাতে একগাদা ভেজা কাপড়। মন্টুর মাকে ডেকে কাপড়গুলো রোদে শুকানোর জন্য দেন। তারপর ঘরে ফিরে আসেন। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলেন, কেমন হলো তোমাদের?

ভালোই হয়েছে। এখন সন্ধ্যার অপেক্ষায় আছি।

গোসলটা সেরে নাও। তোমার গোসল হলে টেবিলে খাবার দেব।

আকমল হোসেন তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েন। স্বস্তি পান এই ভেবে যে আয়শা খাতুন তার ঘর্মাক্ত মুখ খেয়াল করেননি। অবশ্য শরবত খাওয়ার সময় তিনি নিজেও হাত দিয়ে মুখ মুছেছেন। আলতাফ ও মেরিনা যতটুকু দেখেছে, অতটুকু দেখার সুযোগ আয়শা খাতুনের ছিল না। বাথরুমে ঢুকে আকমল হোসেন প্রবল স্বস্তিতে গায়ে পানি ঢালেন। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তার মনে হয়, পানি তাঁর শরীরে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁর পুরোনো কথা মনে হয়—স্মৃতির নদীতে পুরোনো কথা স্রোতের মতো বয়। নইলে যৌবনের সময়ের কথা এখনকার সময়ে বয়ে এল কী করে! পাঠশালার শিক্ষক প্রতিদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কাছে দাঁড় করিয়ে বলতেন, মনে রাখিস, যে নদীতে তুই বারবার নামিস, সে নদী কখনো এক রকম থাকে না। নদীর জল নতুন স্রোত তৈরি করে। নদী নতুন হয়।

তাহলে তো, দাদু, আমিও এক রকম ছেলে থাকি না। আমিও নদীর মতো প্রতিদিন নতুন ছেলে হই। না দাদু?

ঠিক ধরেছিস। এ জন্যই তো তুই ক্লাসে ফার্স্ট হোস। ভগবান তোর মগজভরা মেধা দিয়েছেন। তোকে আশীর্বাদ করি রে, দাদু।

নতুন ছেলে, নতুন ছেলে বলতে বলতে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। এখন মনে হয়, সেদিন এক আশ্চর্য সময় ছিল তার জীবনে। সময়কে, জীবনকে বুঝে ওঠার সময়। বুঝেছেন সব চোখ খোলা রেখে, করোটিতে সাদা আলো জ্বালিয়ে রেখে। সেই বোঝা ফুরোয়নি তার জীবন থেকে। এখন আবার নতুন সময় এসেছে নতুনের হয়ে ওঠার সাদা আলোয় নিজেকে চেনার। ভাবতে ভাবতে হাত বাড়িয়ে শাওয়ারের ট্যাপ বন্ধ করেন। শুনতে পান, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আয়শা খাতুন বলছেন, কী হলো, আজ এত সময় লাগছে কেন তোমার? গায়ে এত পানি ঢাললে ঠান্ডা লাগবে।

তিনি সাড়া দেন না। নিজেকেই বলেন, প্রতিদিন নতুন হওয়া সহজ কথা নয়। আমি কঠিনের সাধনা করছি। একাত্তর কঠিনের সাধনার সময়। এ সত্য তোমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে! আমি তো জানি, গুনগুন করে গান গেয়ে তুমি নিজে কঠিনের সাধনা করো।

তিনি তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে শুরু করলে আয়শা খাতুন আবার দরজায় শব্দ করেন। তিনি এবারও সাড়া দেন না। ভাবেন, ওই শব্দ করে আয়শা খাতুন তার জন্য অপেক্ষা করুক। এরকম ভাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভালো লাগা তাকে আচ্ছন্ন করে। তিনি দ্রুত হাতে শরীর মুছে বেরিয়ে আসেন। দরজা খুললে দেখতে পান দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আয়শা খাতুন দাঁড়িয়ে আছেন।

এখনো দাঁড়িয়ে আছ?

তোমার জন্য, দেরি করলে যে?

ভীষণ খিদে পেয়েছে। টেবিল রেডি?

না, টেবিলে খাবার আনিনি। ছেলেরা দরজা বন্ধ করে মিটিং করছে। বলেছে, ওরা নিজেরা দরজা খুলবে; ওদের যেন ডাকাডাকি না করা হয়। মেরিনাও ওদের সঙ্গে আছে।

মিটিং করছে ওরা? ভুরু কোঁচকান আকমল হোসেন।

শুনলাম কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। গুলশান থেকে কোনো অবাঙালির গাড়ি হাইজ্যাক করবে। সেটা নিয়ে ওরা সন্ধ্যায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে যাবে।

ও, আচ্ছা।

আকমল হোসেন ভেজা চুলে ঝাঁকি দেন।

তোমাকে খাবার দেব?

না, ওদের জন্য অপেক্ষা করি। একসঙ্গে খাব।

আকমল হোসেন শোবারঘরে ঢুকে মাথা আঁচড়ান। তারপর আলনা থেকে সাদা পাঞ্জাবি নিয়ে পরতে পরতে বলেন, আমি কি খুব বুড়ো হয়েছি, আশা?

এমন প্রশ্ন কেন করলে?

তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি যে ওরা আমার গাড়িতে যাবে না।

তুমি নিজে নিজে ভেবো না। ওদের পরিকল্পনার কথা শোনো। ওদের হয়তো দুটো গাড়ি লাগতে পারে। কিংবা অপরিচিত কারও গাড়ি নিয়ে গেলে ওদের ধরা পড়ার ভয় কম থাকবে। পুলিশ সেই গাড়ি দেখে খুঁজতে শুরু করলে ওদের খুঁজে পাবে না।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আশা। ওরা গাড়িটা যেখানে-সেখানে ফেলে নিজেদের মতো করে ভিন্ন ভিন্ন পথে পালিয়ে যেতে পারবে। এটা ওদের যুদ্ধের কৌশল। ঠিকই ভাবছে ওরা।

তুমি বয়স নিয়ে মন খারাপ করলে।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে বলেন, কী খাওয়াবে আমাদের?

এটা যুদ্ধের সময়। খাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে না।

আয়শা খাতুন তর্জনী তুলে কথা বললে তিনি বুঝতে পারেন যে আয়শা তার কথা তাঁকেই ফেরত দিয়েছেন। তার পরও হেসে বলেন, যুদ্ধের সময় সব খাবারই অমৃত। রেডিওটা ছেড়ে দাও, আশা। দেখি, কোনো খবর আছে নাকি, যে খবর ছেলেদের কাজে লাগবে।

আয়শা খাতুন রেডিও ছেড়ে দেন। করাচি থেকে উর্দু ভাষায় পড়া খবর শোনা যায়। আকমল হোসেন ইজিচেয়ারে বসেন। আয়শা খাতুন ভেজা তোয়ালে নিয়ে বাইরে যান। বারান্দার রশিতে তোয়ালেটা ঝুলিয়ে দেওয়ার সময় টের পান ছেলেরা ঘরের দরজা খুলেছে। হুড়মুড় করে বের হচ্ছে ওরা।

মন্টুর মা কাছে এসে দাঁড়ায়।

লুচি ভাজা কি শুরু করব, খালাম্মা?

হ্যাঁ, করো। ওরা বের হয়েছে।

ছুটে আসে মেরিনা।

মা, টেবিলটা সাজাই।

হ্যাঁ, সাজাও, মা। দুপা এগিয়ে মেরিনা ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ওরা আজকের অপারেশনের দারুণ পরিকল্পনা করেছে। আমি বলব না। ওদের কাছ থেকে শুনবে। আমি যাই।

আয়শা খাতুনের মনে হয়, এখনই একটা গান গাওয়ার সময়। কী গাইবেন? ধনধান্য পুষ্পভরা-

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি...

গানের ধ্বনি আর সুর ছড়ায় পুরো বাড়িতে। আকমল হোসেন কান খাড়া করেন। ছেলেরা যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে একমুহূর্তে গানের বাণী নিজেদের বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। বুঝতে পারে, তাদের জয় বাংলা মামণি তাদের কী মেসেজ দিচ্ছেন। মেরিনা গুনগুন ধ্বনি শুনে ভীষণ আপ্লুত হয়ে বলে, মায়েদের বুঝি এমনই হতে হয়। আয়শা খাতুন তখন রান্নাঘরে বিভিন্ন ডিশে খাবার সাজান। লুচি, আলুর দম, মুরগির রোস্ট, গরুর রেজালা। আর একটি বড় কেক। আজ ছেলেদের নতুন জন্মদিন। তাই সবাইকে দিয়ে কেক কাটাবেন তিনি। বলবেন, শুভ হোক তোমাদের যাত্রা। আমরা তোমাদের অপেক্ষায় থাকব।

খাবার টেবিল দেখে ছেলেদের চোখ ছানাবড়া।

মামণি, এত কিছু?

হ্যাঁ, এত কিছুই। বসে যাও। মন্টুর মা লুচি ভাজা শেষ করবে না। ওটা গরম গরম আসবে।

খাওয়া শুরুর মাঝামাঝি সময়ে আকমল হোসেন প্রশ্নটি ওঠান, তোমরা কখন বাড়ি থেকে বের হবে?

তিনটার দিকে।

প্রশ্নের উত্তর দেয় ওমর। একই সঙ্গে মিজারুল বলে, আমরা পরিকল্পনা বদলে ফেলেছি, খালুজান। আমরা ঠিক করেছি, আপনার গাড়ি আমাদের নেওয়া ঠিক হবে না। আমরা গাড়ি হাইজ্যাক করব।

এখান থেকে আমরা গুলশানে যাব। ওখানে রশীদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে গুলশান ১-এর শপিং সেন্টারের কাছে। হাইজ্যাক করবে রশীদ। তারপর গাড়িটি স্বপনকে দেওয়া হবে। ও চালিয়ে এই বাসায় আসবে। এখান থেকে গ্রেনেড নিয়ে আমরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে যাব।

মিজারুল থামলে আকমল হোসেন বলেন, বেশ। তোমাদের পরিকল্পনা ঠিক আছে।

কায়েস বলে, যদি আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল না হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, আমরা চাই না আর্মি আমাদের পিছু নিয়ে আমাদের এই দুর্গবাড়ি চিনে ফেলুক। তাহলে ভবিষ্যতের আরও নানা পরিকল্পনা আমাদের ভেস্তে যাবে।

ঠিক বলেছ। আমি তোমাদের সঙ্গে একমত। তবে আমার মনে হয়, তোমাদের সবার গুলশান যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা তিনজন গুলশান যাও। বাকিরা এই বাড়িতে অপেক্ষা করো। গাড়ি নিয়ে এলে এরা উঠবে। এরা গ্রেনেড নিয়ে রেডি থাকবে।

ওরা একসঙ্গে আকমল হোসেনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর কথা থামলে ওরা একটু পরে মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছেন, খালুজান। গাড়ি চালাবে মিজারুল। তাহলে মিজারুলের সঙ্গে কায়েস আর স্বপন যাক। মারুফ, ফয়েজ

আর আমি দুর্গবাড়িতে থাকি।

হ্যাঁ, তা-ই করো।

মেরিনা উৎসাহ নিয়ে বলে, গ্রেনেডগুলো আমি গুছিয়ে দেব। কয়টি গ্রেনেড দেব, আব্বা?

আটটি। আটটির বেশি দরকার হবে না।

আমরা ঠিক করেছি, ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড ছোড়া ঠিকঠাকমতো হলে আমরা কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মির্জা শফিকুলের বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়ব। ওর মগবাজারের বাড়ি হোটেল থেকে বেশি দূরে নয়। এক সন্ধ্যাতেই কাজটি হয়ে যাবে। মানুষকে জানানোর দিকটি জোরদার হবে। আকমল হোসেন প্লেটের ভাতটুকু শেষ করে বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টি করার কাজটি জোরেশোরে হওয়াই ভালো।

এক গ্লাস পানি খেয়ে তিনি উঠে পড়েন।

আয়শা খাতুন বলেন, হাত ধুয়ে আবার টেবিলে ফিরে এসো। আরেকটি আইটেম বাদ আছে।

তাই নাকি? আসছি। এই ছেলেরা, তোমরাও হাত ধুয়ে নাও। আরেকটি আইটেম খাওয়া শেষ হলে তোমাদের আক্রমণের পরিকল্পনাটাও আমাকে বুঝতে হবে।

হ্যাঁ, আমরা সেটাও আপনাকে বলব।

হাত ধোয়ার জন্য কেউ কেউ রান্নাঘরে ঢোকে, কেউ টেবিলের পাশের বেসিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সবাই ফিরে এলে কেক কাটা হয়। সবার মুখে কেকের টুকরো তুলে দেন আয়শা খাতুন। মারুফ হাসতে হাসতে বলে, মা, জন্মদিনের মোমবাতি নেই। আপনি কি মোমবাতি কিনতে ভুলে গিয়েছিলেন?

মোটেই ভুলিনি, বাবা। আজকে গেরিলাদের জন্মদিনের মোমবাতি হলো জয় বাংলা। ওই ধ্বনি আমাদের সামনে আলোর শিখা। ওটাকে ফু দিয়ে নেভানো যাবে না। এটা আমাদের সামনে জ্বলবেই। যুদ্ধের সময় জ্বলবে। স্বাধীন দেশেও জ্বলবে।

ওহ্, মামণি, আপনি—আপনি—

ছেলেরা কথা বলতে পারে না। ওদের সবার চোখ জলে ভরে যায়। বাইরে দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ স্তিমিত হতে থাকে। গাড়ির হর্ন শোনা যায়। মানুষের কন্ঠস্বর ভেসে আসে। সঙ্গে রিকশার টুনটুন শব্দ। মন্টুর মা টেবিল থেকে বাসন-কোসন সরাতে থাকে। ওরা সবাই এখন ড্রয়িংরুমে। মেরিনা সবার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে। কথা শুরু করে মিজারুল।

আমরা ঠিক করেছি, মিন্টো রোড দিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে এগোতে থাকব। বড় নাগলিঙ্গমগাছটার নিচে প্রথমে গাড়ি থামবে। আমাদের দুজন সেখানে নামবে। ওরা ফুটপাত ধরে সামনে এগোবে। বাকিরা হোটেলের গেট থেকে একটু সামনে গিয়ে বড় গাছগুলো যেখানে আছে, সেখানে নামবে। তারপর ওরা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকবে। সেখান থেকে মেইন গেটের কাছে গ্রেনেড ছুড়বে। হোটেলের পর্চে যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের গাড়ি থাকে, তবে সেই গাড়ির ওপরও গ্রেনেড ছোড়া হবে। যারা ফুটপাত ধরে এগোবে, তারা হোটেলের সামনের বারান্দার দুপাশে গ্রেনেড ছুড়বে। আমাদের গাড়ি থাকবে মিন্টো রোডে। কাজ শেষ করে আমরা গাড়িতে উঠব। গাড়ি মিন্টো রোড ছাড়িয়ে রমনা থানার পাশ দিয়ে মগবাজারে ঢুকবে। সেখানে মুসলিম লীগের নেতার বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়ে আমরা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসের দিকে যাব। ওই দুই অফিসে গ্রেনেড ছুড়ে আমরা পুরানা পল্টনের গলিতে ঢুকে গাড়ি ছেড়ে দেব। তারপর যে যার মতো নিরাপদ জায়গায় চলে যাব।

রুদ্ধশ্বাসে কথা শুনছিলেন আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন। কথা শেষ হলে আয়শা খাতুন তার ডান এবং বাম হাত মুঠি করে ধরে বলেন, এ বাড়িতে আসবে না তোমরা?

না, মামণি। আমরা এ বাড়িতে আসব না। এটা আমাদের যুদ্ধের কৌশল।

মারুফও সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমিও আসব না, মা। আমরা কে কোথায় যাব, সে বাড়িগুলো ঠিক করা আছে। ঢাকা শহরে এখন এমন অনেক বাড়ি আছে। তারা গেরিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

মেরিনা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, তাহলে তুমি কখন বাড়িতে আসবে, ভাইয়া?

যুদ্ধের সময় এমন প্রশ্ন করতে নেই, মেরিনা।

আকমল হোসেন চুপ করেই ছিলেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, তোমাদের জন্য দোয়া করি। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। তোমরা যেন সবকিছু ঠিকমতো করে মায়েদের কোলে ফিরে আসতে পারো।

ওরা সবাই দুজনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলে দুজনে উঠে দাঁড়ান। শোবারঘরের দিকে যেতে যেতে আকমল হোসেন বলেন, তোমাদের সঙ্গে মেরিনা থাকবে। তোমাদের গ্রেনেড ও গুছিয়ে দেবে। এখন থেকে ও নিজেও তোমাদের গেরিলাবাহিনীর একজন। মনে রেখো, যুদ্ধ শুধু ছেলেদের নয়, যুদ্ধ মেয়েদেরও।

বাবার কথা শুনে মেরিনা উচ্ছ্বসিত স্বরে দুহাত ওপরে তুলে বলে, জয় বাংলা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিম আকাশজুড়ে লাল আলো ছড়িয়েছে। পুরো ডুবে যায়নি। দুর্গবাড়ির তিনজন মানুষ ড্রয়িংরুমে চুপচাপ বসে আছে। টেলিভিশন ছাড়া। ভলিউম দেওয়া নেই বলে শব্দ হচ্ছে না। পর্দাজুড়ে নানা ছবি ভেসে উঠছে। গান হচ্ছে কিংবা অন্য কিছু। খবরের সময় হয়নি বলে টেলিভিশনে খবর নেই। কিছুক্ষণ পর মন্টুর মা এসে ড্রয়িংরুমে মেরিনার পাশে মেঝেতে বসে। মেরিনা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

ভয় করছে।

ভয়? কেন?

জানি না। ভয়ের কিছু নাই, খালা।

আছে। ওদের যদি কিছু হয়।

আপনি রান্নাঘরে যান। নইলে আপনার ঘরে যান। অজু করে জায়নামাজে বসেন। ওদের জন্য দোয়া করেন।

মন্টুর মা মাথা নেড়ে চলে যায়।

একটু পর আলতাফ আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না। আকমল হোসেন হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বলেন, কিছু বলবে?

গেট বন্ধ করে দিয়েছি। রাস্তায় লোক চলাচল খুব নাই।

বেশ করেছ। তুমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারো।

আমি শুয়ে পড়লে চলবে কেন? ভাইয়ারা কখন আসবে তার তো কিছু ঠিক নাই।

ভাইয়াদের কথা তোমার ভাবতে হবে না।

আলতাফের শরীর সোজা হয়ে যায়। খানিকটা ক্ষুন্ন স্বরে বলে, আমাকে তো ভাবতেই হবে, স্যার। গেট তো আমি খুলব। আমি ঠিক করেছি, আজ নিজের ঘরে ঘুমাব না। বারান্দায় শুয়ে থাকব, যেন গেটে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিতে পারি।

আকমল হোসেন কথা না বাড়িয়ে বলেন, ঠিক আছে, তোমার যা ভালো মনে হয়, তা-ই করো।

আলতাফ আবারও ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলে, বারান্দায় শোব কি না এ কথাটি জানতে এসেছিলাম।

আকমল হোসেন উত্তর দেন না। আলতাফ দরজা ছেড়ে চলে যেতে যেতে ভাবে, এ বাড়ির সবার হলো কী আজ। দুপুর পর্যন্ত উৎসবের মতো কত কিছু হলো। এখন, ধুৎ! ও আর ভাবতে চায় না। বাড়ির বাইরের সব বাতি অফ করে দিয়ে আলতাফ বারান্দার সিঁড়ির ওপর চুপচাপ বসে থাকে। ভাইয়ারা জয়ী হয়ে ফিরে আসবে এমন একটি আশায় তার মন-প্রাণ উত্তেজিত। কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। উঠে গেটের কাছে যায়। গেটের গায়ে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ফিরে আসে বারান্দায়। মন্টুর মা তার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। এগিয়ে দিয়ে বলে, পানি খান, আলতাফ ভাই?

আমার তো পিয়াস লাগেনি।

পানি খেলে আপনার স্বস্তি লাগবে। বুকের ভেতর ঠান্ডা হবে।

তাহলে খাই। আলতাফ গ্লাস নিয়ে পানি খায়। মন্টুর মা যেতে যেতে বলে, এখন নামাজ পড়েন। শান্তি পাবেন। নামাজ পড়ে দোয়া করেন, আমাদের ছেলেরা যেন যুদ্ধে জেতে।

ঠিক। যতক্ষণ ঘুম আসবে না, ততক্ষণ দোয়া পড়ব। যাই, জায়নামাজ নিয়ে আসি।

মন্টুর মা রান্নাঘরে গ্লাস রেখে নিজের ঘরে যায়। তার ভাবতে ভালো লাগে যে, সে মানুষটির অস্থিরতা কাটিয়ে দিতে পেরেছে। যুদ্ধের সময় মানুষকে অনেক বেশি অস্থির করে। মন্টুর মা নিজেও ছেলেদের জন্য দোয়া করবে বলে নামাজের জন্য অজু করে। জায়নামাজ পেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে মন্টুর মায়ের বুক প্রশান্তিতে ভরে যায়। ভাবে, ছেলেরা যে যুদ্ধে গেছে, সেটায় জয়ী হয়েছে। ঠিকই জয়ী হয়েছে। দুদিন পর এ বাড়িতে

আবার জড়ো হয়ে বলবে, আমরা এসেছি। আমাদের গ্রেনেড দেন। মন্টুর মা ওদের জন্য দোয়া করে।

ঘরের ভেতরে মেরিনার ভাবনার শেষ নেই। ও প্রতি মুহূর্তে সময়ের হিসাব কষছে। ওরা গাড়ি হাইজ্যাক করছে। বাড়িতে এসে গ্রেনেড নিয়েছে। ওরা এখন কোথায়? টিভিতে সন্ধ্যার খবর পাঠ করা হচ্ছে। কিন্তু গেরিলা অপারেশনের কোনো খবর নেই। নিশ্চয় কালকের পত্রিকায় ওদের খবর ছাপা হবে। আয়শা খাতুন বই পড়ছিলেন। এখন তিনি বই পড়ছেন। সন্ধ্যার আগে থেকেই তিনি চুপচাপ হয়ে আছেন। কারও সঙ্গে তেমন কথা বলছেন না। মেরিনা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও মা ওর দিকে তাকান না। ও বাবার দিকে তাকায়। দেখতে পায়, বাবা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছেন। শব্দহীন টেলিভিশনের স্ক্রিন তিনি দেখছেন, নাকি দেখার ভাণ করে আছেন, তা বুঝতে পারে না মেরিনা। ওর মাথার মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের পুরো চত্বর যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায়। সরাসরি যুদ্ধ-গোলাবারুদ, মেশিনগান, ট্যাংক ইত্যাদিসহ পুরো যুদ্ধের চিত্রটি নিজের মধ্যে জাগিয়ে রেগে মেরিনা বাথরুমে আসে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখমুখে পানি দেয়। ভাবে, আজ তো আর ওদের কোনো খবর পাওয়া যাবে না। সময়কে এখানে থামিয়ে রাখা উচিত।

কারণ সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেছে। এখন রাত আটটা বাজে। ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা সব কাজ শেষ করেছে। নিশ্চিত করেছে। সময় এখন থেমে থাকুক। কোনো একদিন পুরো ঘটনা ওদের কাছ থেকে শুনতে হবে। ওরা হোটেলের দেয়াল ঘেঁষে লাগানো বড় গাছগুলোর আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকেছে। মোটা গাছের কাণ্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড ছুড়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের গাড়ির ওপর গ্রেনেড ফেলেছে। ওরা সমস্ত মানুষের চিত্তার দুকান ভরে শুনেছে। ওদের ছোটোছুটি দেখেছে। প্রধান গেটের সামনে গ্রেনেড ছুড়ে সিকিউরিটি গার্ডদের হতবিহ্বল করেছে। তারপর ওরা ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠেছে। গাড়ি স্টার্ট করা ছিল। গাড়ি শাঁই করে মগবাজারের শান্তি কমিটির অ্যাডভোকেটের বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছে।

তারপর ওরা মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার অফিসের সামনে গিয়ে দেখেছে, পাহারা দিচ্ছে পাঞ্জাবি দারোয়ান ও মিলিশিয়া জওয়ান। ওরা একটি গ্রেনেড

ঠিকই ছুড়েছে। কিন্তু ওটা ঠিক জায়গায় পড়েনি। জামার আস্তিন গাড়ির দরজার লকে আটকে যাওয়ার ফলে গ্রেনেড অন্য জায়গায় পড়ে। ওরা আর অপেক্ষা করেনি। শহর টেরোরাইজ করে, চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে ওরা যার যার পথে চলে গেছে।

মেরিনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। ভাবে, একজন গেরিলা হওয়ার সাহস নিয়ে ও এখন নিজের মুখোমুখি হয়েছে। একাত্তরের এই সময়ে সাহস দরকার—প্রতিজ্ঞা দরকার—ঘরের মধ্যে থেকে কিংবা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের হাতের মুঠোয় সময়ের সবটুকু নিতে হবে। কোনো অপচয় নয়—বৃথা সময় কাটানো নয়। ওর কপাল কুঁচকে থাকে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছে। ভাবে, সময়ের হিসাবে গেরিলারা অপারেশন শেষ করেছে। তবে ওর মায়ের কণ্ঠে গুনগুন ধ্বনি নেই কেন? মা কি ওদের স্বাগত জানাবে না? মেরিনা মন খারাপ করে। বুঝতে পারে না যে আয়শা খাতুন কী ভাবছেন। তাঁর মনে কোনো আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কি? ভাবছেন, ছেলেরা কোনো অনিশ্চয়তায় আছে? যতক্ষণ না খবর আসবে যে সবকিছু ঠিকঠাকমতো হয়েছে, ততক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। হয়তো এটাই সত্যি। তার বুকের ভেতরে সংগীত স্তব্ধ হয়ে আছে।

মেরিনা বাথরুম থেকে ড্রয়িংরুমে এলে দেখতে পায়, আয়শা খাতুন বইটা বুকের ওপর রেখে সোফায় মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন। আকমল হোসেন সেন্ট্রাল টেবিলটা সামনে টেনে নিজের বানানো শহরের ম্যাপের ওপর ঝুঁকে আছেন। মেরিনা বেরিয়ে এসে মন্টুর মায়ের ঘরে যায়। দেখতে পায়, মন্টুর মা ঘরের মৃদু আলোয় মৃদুস্বরে দোয়া পড়ছে। ও বেরিয়ে বারান্দায় আসে। আলতাফ তখনো সিঁড়ির ওপর বসে আছে। মেরিনাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

আপা, ভাইয়ারা কখন আসবে?

জানি না তো। আমাকে কিছু বলেনি।

এতক্ষণে তাদের তো কাজ শেষ হয়েছে, না?

সময় হিসাব করলে হয়ে যাওয়ার তো কথা।

তাহলে যেকোনো সময় আসবে। চুপিচুপি করে ডেকে বলবে, আলতাফ ভাই, দরজা খোলেন। তাই না, আপা? তাদের যে-ই আমাকে ডাকুক না কেন তার গলা আমি চিনি। তাদের নাম ধরেই আমি বলি, দাঁড়ান, দরজা খুলছি, মিজারুল ভাই। আজকে কে আমাকে ডাকবে, আপা, আপনি বলেন?

আপনিই বলেন?

আমার মনে হয়, আজকে সবাই একসঙ্গে আমাকে ডাকবে। আলতাফ ভাই, দরজা খোলেন। তাই না, আপা? ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, তাই তো। ঠিকই বলেছেন। ওদের নিয়ে আজ আমাদের নিজের মতো করে ভাবার সময়। সময় খুব সুন্দর।

আজ আমি বারান্দায় বসে নামাজ পড়ব। আমি কোথাও যাব না।

তাই বুঝি জায়নামাজ এনেছেন এখানে?

হ্যাঁ। আলতাফ হোসেন মাথা নেড়ে মৃদু হাসে।

সেই ভালো। আমিও দেখতে এসেছিলাম যে আপনি কী করছেন।

বাড়ির দারোয়ানের তো গেট খোলারই কাজ, আপা। কিন্তু আজকে যাদের অপেক্ষায় গেট খোলার জন্য বসে আছি, তারা সবাই ফেরেশতা। তারা যখন কাজ শেষ করেছে, তখন আমাদের ঢাকা শহরের ওপর সাদা আলো ছড়িয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই আলো আর নিভবে না।

আলতাফ ভাই! মেরিনা অস্ফুট ধ্বনিতে একজন সাধারণ মানুষের স্বপ্নের কথা শোনে। বিস্ফারিত হয় ওর চোখ। ভাবে, এভাবে যুদ্ধ। এভাবেই স্বাধীনতার স্বপ্ন। একজন মানুষও বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবে। ওহ, এই শহরে এখন আর কোনো মানুষের ভয় নাই।

রাত বাড়ে।

এখন পর্যন্ত বাড়ির টেলিফোন বাজেনি। খবরের জন্য অপেক্ষারত মানুষেরা এখন ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করছে। আয়শা খাতুন বুকের ওপর থেকে বই সরিয়ে উঠে পড়েছেন। আকমল হোসেন সোফায় নেই। বাড়ির পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মন্টুর মা নামাজ শেষ করে রান্নাঘরে এসেছে। আলতাফ মিয়া লোহার গেটের ওপর মুখ রেখে ভাবছে, ফিরছে না কেন ভাইয়ারা? তারা এই বাড়িতে এলে সে-ও চলে যাবে তাদের সঙ্গে। যুদ্ধের সময় মানুষ কীভাবে ঘরে বসে থাকতে পারে।

তখন বাড়ির টেলিফোন বেজে ওঠে।

ছুটে যায় মেরিনা। গিয়ে ফোন ধরে।

হ্যালো, ভাইয়া।

ছুটে আসেন আকমল হোসেন, আয়শা খাতুন।

আমরা সাকসেসফুলি সব কাজ শেষ করেছি। শুধু পত্রিকা অফিসের সামনে ছোড়া গ্রেনেডটা ঠিক জায়গায় পড়েনি। আব্বাকে দে, মেরিনা।

ফোন চলে যায় আকমল হোসেনের হাতে।

বলো, বাবা–

আমরা পেরেছি, আব্বা। আমরা বিদেশিদের সামনে দেখাতে পেরেছি যে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি শান্ত না। পাকিস্তান সরকার যা কিছু প্রচার করছে তা মিথ্যা।

তোমাদের জন্য দোয়া করি, বাবা। সাবধানে থাকো। জয় বাংলা।

ফোনটা মাকে দেন, আব্বা।

হ্যালো, বাবা।

মাগো, সব ঠিকঠাকমতো হয়েছে। আমার জন্য একটুও ভাববেন না। আপনি তো বলেন, দেশের জন্য আমরা সবাই জীবন দিতে তৈরি হয়েছি।

তোমার জন্য দোয়া করি, বাবা। আমি জানি, তোমার বুকভরা সাহস আছে। তুমি পিছু হটবে না।

মাগো, আমাদের সময়কে তো আমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। ফোন রাখছি, মা। কবে দেখা হবে জানি না।

ফোনের লাইন কেটে যায়। আয়শা খাতুন একটু সময় রিসিভার বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। যেন তিনি অগণিত গেরিলাযোদ্ধার বুকের ধুকধুক ধ্বনি শুনছেন। যেন তার চারপাশে এখন আর কোনো ধ্বনি নেই, তিনি দুপা বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে ওঠে। ফোনের অপর প্রান্তে মারুফ।

মাগো, দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার... গানটি শোনান।

আয়শা খাতুনের গুনগুন ধ্বনি ছড়িয়ে যায় ফোনে এবং ঘরে—লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার ছড়াতে থাকে সুর :

কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।...

ফোনের রিসিভার ওঠায় মিজারুল। ওর মনে হয়, জয় বাংলা মামণি ওর বুকের ভেতর সাহসের ধ্বনি ছড়াচ্ছেন। ও টেলিফোন কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে :

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার...।

গুনগুন ধ্বনি উজ্জীবিত করে মিজারুলকে।

রিসিভার ওঠায় স্বপন। টেলিফোন টোনে গুনগুন ধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিল সে। বুঝতে পারে না কোথা থেকে এমন শব্দ আসছে। ফোনের চারপাশে এ কিসের ধ্বনি! তারপর দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরে। শুনতে পায়, জয় বাংলা মামণির কন্ঠস্বর—ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান—গুনগুন ধ্বনি ছড়াতে থাকে ঘরে। ছুটে আসে তপন। দাদা, কে গান গাইছে? তুমি টেলিফোনে কার গান শুনছ? আমাকে শুনতে দাও। ফোনের রিসিভার কেড়ে নেয় তপন। গুনগুন ধ্বনি বুকে নিয়ে স্বপন ঘরে পায়চারি করে। টেলিফোন ওঠায় ফয়েজ :

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়াছে তাঁরা
দিবে কোন বলিদান?

থরথর করে কাঁপে ফয়েজের শরীর। বুঝতে পারে, জয় বাংলা মামণি ওর শরীরের সবটুকু শক্তি কেড়ে নিচ্ছেন। ও দুহাতে টেলিফোন রিসিভার ধরে রাখে।

টেলিফোন ওঠায় কায়েস। টেলিফোনে কোনো রিংটোন ছিল না। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হয়েছিল, কোথাও কিছু ভুল হয়েছে বোধ হয়। টেলিফোনে মেসেজ

আসার কথা। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। দেখতে পায় দিনের প্রথম আলো ফুটছে। মায়াবী আলো ওর দুচোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ করে। কায়েস বাইরে ছুটে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। টেলিফোনের অদৃশ্য ধ্বনি ওর পথ রোধ করে। ও রিসিভার ওঠায়—আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?—জয় বাংলা মামণি ওদের পথে আলোর হাতছানি। ওরা তো তার কাছে পৌঁছেই যাবে। কায়েসের মা এসে ওর কাছে। দাঁড়ালেন। এত ভোরে উঠেছিস কেন রে? আগের মতো কি আমাকে কিছু না বলে পালিয়ে যাবি বাড়ি থেকে? না মা, এবার তোমাকে বলেই যাব। কার সঙ্গে কথা বলছিস? শোনো কার সঙ্গে-গুনগুন ধ্বনিতে ঝংকৃত হয় :

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?

ব্যাপার কিরে? কে তোদের ডাকছে? সব মায়েরা। সব মায়েরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য ডাকছে। কায়েস দুহাত ওপরে তুলে মায়ের চারপাশে পাক খায়।

বাবার হাত থেকে টেলিফোন নেয় ওমর। তখন মধ্যদুপুর। ভাত খাওয়ার সময়। বাবা ওকে বলেন, তোর ফোন, ওমর। কেউ তোকে খুঁজছে। এবার যদি বাড়ি থেকে যাস তাহলে আমাদের বলে যাবি। লুকিয়ে পালাতে হবে না।

না, বাবা, লুকিয়ে পালাব না। রিসিভার কানে লাগায় ওমর :

কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার...

গুনগুন ধ্বনি ওকে আচ্ছন্ন করে। ওর মনে হয়, ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। হাতে রাইফেল কিংবা লাইট মেশিনগান, নয়তো গ্রেনেড। সবাই মিলে গাইছে :

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

গান শেষে সবাই স্যালুট করে বলে, আমরা তৈরি। জয় বাংলা।

শহরে গেরিলা অপারেশনের খবর

শহরে গেরিলা অপারেশনের খবর পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার রাবেয়া। ড্রেন পরিষ্কার করার কাজ রেখে ওকে কাঁদতে দেখে সুইপার পরদেশী জিজ্ঞেস করে, রাবেয়া, কী হয়েছে তোর? হঠাৎ এমন কাঁদতে শুরু করলি কেন?

বুকে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথায় মাথাও জানি কেমন করছে?

বুকে ব্যথা নিয়ে এত জোরে কাঁদতে পারে মানুষ? তুই তো দেখছি একটা উল্লুক। এমন উল্লুক আমি একটাও দেখিনি। তুই আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছিস। বল, তোর কী হয়েছে?

রাবেয়া কথা না বলে কাঁদতে থাকে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে। কান্নায় ওর শরীরে প্রবল ঝাকুনি। কান্নার দমকে মাঝেমধ্যে হেঁচকি উঠছে। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। মাঝেমধ্যে কাশছে। পরদেশী রেগে ওর দিকে তাকায়। একসময় নিজেকে সামলাতে না পেরে বলে, থাম বলছি। রাবেয়া থামে না। থামার জন্য প্রস্তুতিও নেয় না। কান্না যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

পরদেশী ভুরু কুঁচকে বলে, কী হলো, কান্না থামা। নইলে তোকে ঘুষি মেরে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেব।

রাবেয়া ভেজা চোখে পরদেশীর দিকে তাকায়। চোখভরা পানি দেখে পরদেশী বিপন্ন বোধ করে। রাবেয়া চোখ মুছে আস্তে করে বলে, রাগিস না। এখন আমাদের রাগের সময় না। নিজেদের নিজেদের রাগারাগি আমাদের সর্বনাশ করবে।

উপদেশ দিস না, রাবেয়া। উপদেশ শুনে মেজাজ গরম লাগছে। কী হয়েছে, বল?

আমি কি কাঁদি সাধে? দেখিস না সেই কাল রাতের পর থেকে ওরা কত কত মেয়ে ধরে নিয়ে এসে পুলিশ লাইনের ব্যারাকে ভরে ফেলেছে। ওদের গু-মুত সাফ করতে আমি যাই। তোকে যেতে হয় না, পরদেশী। তুই তো শুনতে পাস না যে কত যন্ত্রণায় ওরা চিল্লায়।

চুপ কর, চুপ কর, রাবেয়া। আমি সইতে পারি না। আমাকে তোর বলে বোঝাতে হবে না।

তাহলে শোন, তুই তো আমাকে কতবারই কাঁদতে দেখেছিস। সেই কান্না ছিল কষ্টের, রাগের। তখন কেঁদেছি দুঃখে, যন্ত্রণায়। নিজের হাত কামড়ে নিজের রক্ত নিজে চুষেছি। আজ আমি কাঁদছি আনন্দে। আজ আমার আনন্দের শেষ নাই।

আনন্দ? কিসের আনন্দ তোর? তোর আজকে কী হয়েছে, বল তো?

হোটেল ইন্টারে গেরিলারা গ্রেনেড ফাটিয়েছে। কেউ ধরা পড়েনি। বোমা ফাটিয়ে ঠিকঠাকমতো চলে যেতে পেরেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। তুই চুপ করে থাক, রাবেয়া। এসব শুনলে ওরা তোকেআমাকে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখবে। ন্যাংটো করে ঝোলাবে। তারপর চাবুক দিয়ে পেটাবে।

হ্যাঁ, জানি। এমনই করবে ওরা। সে জন্য হাসছি না, কাঁদছি। হাসির বদলে কেঁদে নিজের খুশি ফোঁটাচ্ছি। যেন ওরা বুঝতে না পারে যে আমার কী হয়েছে।

পঁচিশের প্রথম রাতে তোকে যখন নির্যাতন করল, তখন তো তুই কাঁদিসনি, রাবেয়া।

যে দুঃখ সারা জীবন বইতে হবে, তার জন্য কেঁদে কী লাভ, পরদেশী? কিন্তু কচি কচি মেয়েদের ধরে নিয়ে আসছে, এটা আমি সইতে পারছি না। আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ছে। মনে হচ্ছে, মাটি ফাঁক হয়ে গেলে আমি জ্যান্ত কবরে চলে যাব। আর যদি

ব্যারাকে আগুন জ্বালায়, তাহলে আমি ওই আগুনকে চিতা মনে করে ঢুকে যাব। মরেই নিজের জনম সার্থক করব।

আহ্, থাম, রাবেয়া। এত কথা কেন বলছিস। চল, এই ড্রেনের পাশে একটুক্ষণ বসি। তোর একটু দম নেওয়া দরকার। কেঁদেকেটে হয়রান হয়ে গেছিস।

দুজন সুইপার ড্রেনের ভেতর পা ঝুলিয়ে বসে। খুব অল্পক্ষণের জন্য। এটুকু সময়ই ওদের জীবনে এক বিশাল সময়। সময় প্রাণ খুলে কথা বলার এবং শেখের বেটা যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে, সেই স্বাধীনতার মর্ম বোেঝার। ওরা দুজনেই দুহাতে ঝাড়ু ধরে রাখে, যেন কোনো দিক থেকে ডান্ডা হাতে মিলিশিয়া জওয়ান এলে বলতে পারে আমরা তো কাজ করছি। পরদেশী হাসতে হাসতে বলে, কেউ এলে আমি লাফ দিয়ে ড্রেনে নেমে যাব। পানি ঝাড়ু দিতে দিতে বলব, দেখো, কাজ করছি।

আর আমি কী করব? আমার জন্য তোর পরামর্শ কী, শুনি?

তুই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবি। মাথা নড়বে না। কোনো দিকে তাকানো চলবে না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব কেন?

আকাশের তারা গুনবি।

দিনের বেলা কি তারা দেখা যায়?

কষ্ট সইতে হলে দিনের বেলা তারা খুঁজতে হবে, রাবেয়া। দেখবি বুকের ভেতরের কষ্ট তারার মতো লুকিয়ে আছে। কষ্টের কাছে তোর কোনো হার হবে না।

রাবেয়া অবাক হয়ে পরদেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিস্মিত দৃষ্টি ওর মুখের ওপর স্থির রেখে বলে, তুই এত কিছু বুঝিস, পরদেশী? আগে তো কখনো টের পাইনি।

মাঝে মাঝে বুঝি। সব সময় বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝি, আমাদের জীবনে স্বাধীনতা হলো পেট পুরে ভাত, নয়তো রুটি খাওয়া। লাল জামা কেনা। নীল লুঙ্গি পরা। মদ খাওয়া। গা ছেড়ে ভুঁড়ি ফুলিয়ে ঘুমানো। বেঁচে থাকার যা কিছু দরকার, স্বাধীন দেশে তার সবটুকু চাই। মাথার ওপর কেউ ছড়ি ঘোরাবে না। বানচোত, শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দেবে না।

আর কিছু না?

হয়তো আরও অনেক কিছু, কিন্তু আমি জানি না। মুখসুখ মানুষ, এত কিছু বুঝব কী করে!

আমিও জানি না। শেখের বেটা যেদিন সাতই মার্চের ভাষণ দিল রেসকোর্সে, সেদিন আমি সেটা শুনতে আসছিলাম। সুইপার কলোনির অনেকে এসেছিল। আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে। এটুকু বলে রাবেয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, তার পরও আমরা স্বাধীনতার কথা বেশি জানি না।

রাবেয়ার কন্ঠস্বর এবং চেহারার বিষণ্নতায় মন খারাপ হয় পরদেশীর। ও অন্যদিকে তাকায়। ঝাড়ুটা পা দিয়ে নাড়ায়। ভাবে, এটা যদি একটা রাইফেল হতো, নয়তো মেশিনগান। ওর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

দুজনে আকস্মিকভাবে শুনতে পায় নারীকন্ঠের আর্তনাদ। একটি-দুটির নয়, অনেকগুলোর একসঙ্গে। রাবেয়া পরদেশীর হাত চেপে ধরে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কী হলো রে মেয়েগুলোর? কখনো তো একসঙ্গে এমন জোরালো চিৎকার শুনিনি।

পরদেশী রাবেয়াকে হাত টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে, আর কী হবে। রোজ যা হয়, তা-ই হচ্ছে। ভোগ করার পরে হয়তো চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে।

আজ বেশি চেঁচাচ্ছে ওরা। ছেড়ে দে আমাকে, আমি ব্যারাকের দিকে যাই। দেখি, কতটা নরক বানিয়েছে। তুই ড্রেন সাফ কর।

ঠিক আছে, যা। তোর ওদের কাছে যাওয়াই দরকার।

তখন সুইপার লালু অন্যদিক থেকে ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, সইতে পারি না। দু-একটা অস্ত্র পেলে দিতাম সবগুলোকে সাবাড় করে।

রাবেয়া রুখে দাঁড়িয়ে বলে, আমারও তা-ই মনে হয়। পঁচিশ তারিখে রাজারবাগের পুলিশরা যেমন কিছুক্ষণের জন্য ওদেরকে রুখে দিয়েছিল, ঠিক তেমন। চল না, আমরা অস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা করি।

কথা খালি মনে করাস না, রাবেয়া। মনে করব, কিন্তু কিছু করতে পারব। না, তাহলে তো একটা নেংটি ইদুর হয়ে যাব।

রাবেয়া কথা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে বলে, সেদিন পুলিশরা অস্ত্র পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রের ঘর ওদেরকে খুলে দেওয়া হয়েছিল।

পরদেশী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুই থাম, রাবেয়া। বাকি কথা আমি মনে করি। সেনারা যখন উত্তর দিকের টিনশেড ব্যারাকে বোমা আর পেট্রল ধরিয়ে দিয়েছিল, তখন কয়েকজন পুলিশ আগুনে পুড়ে যায়। আহা রে, এক দিন পরে সেই সব লাশ দেখে আমার বুকের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল রাগে-দুঃখে। সেদিন আমি ভয় পাইনি। কিন্তু অত মৃত্যু দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। আমি লাশ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, প্রতিশোধ নেব। কতটুকু পারব তা আমার মাথায় ছিল না। জেনেছিলাম, এই মুহূর্তে আমাকে লাশ সরাতে হবে। আমি কাঁদতে কাঁদতে লাশ টেনেছিলাম। আমার চোখের জল বুকের আগুন নেভাতে পারেনি। নেভাতে কেউ পারবে না। বুড়িগঙ্গা নদীও না। জন্মেছি ডোম হয়ে। এ জীবনের সাধ আর মিটল না।

দুঃখ করিস না, পরদেশী। দুঃখ করলে হেরে যাব। মনে জোর রাখ।

লালু ওর হাত চেপে ধরে।

ফুহ, দুঃখ করব কেন? দেশের স্বাধীনতা দেখতে পেলে এই জীবনের আয়ু গোনার দিন শেষ হবে। আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না পরদেশী। ঝাড়টা বগলের নিচে চেপে ধরে অন্যদিকে চলে যায়। লালু আর রাবেয়া তাকিয়ে থাকে। মাস ছয়েক আগে পরদেশীর বউ মরে গেছে। ঘরে তিনটে বাচ্চা আছে। বাচ্চাগুলোকে ওর মা দেখে। ওর মা বুড়ো হয়েছে। এখন মায়ের বিশ্রামের সময়। সারা জীবন ঝাড় দিয়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে গেছে। মায়ের কষ্ট পরদেশীর সহ্য হয় না; কিন্তু উপায় নেই। বাচ্চাগুলো অবশ্য বেশি ছোট নয়। দু-এক বছরে ঝাড়া হাত-পা হবে। মায়ের জন্য ভীষণ মায়া হয় পরদেশীর। বুড়িটা আর কত দিন বাঁচবে? স্বাধীনতা দেখতে পাবে তো! পরদেশী শিরীষগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝাড়ুটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে নিজেকে নিষ্পেষণ করে।

তখন প্রবল গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। রাবেয়া দ্রুত পায়ে সামনে এগোয়। ও জানে, ব্যারাকে গিয়ে লাভ নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, এইটুকুই। তার পরও সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে চায় না। হাত ওঠে না। বারান্দা ঝাড়ু দিতে চায়, পারে না। ঝাড়ুটা দূরে ফেলে দিয়ে ঠা ঠা রোদে বসে থাকে। যে হারামিগুলো ভেতরে আছে, ওগুলো বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

ও পুড়ে যাওয়া ব্যারাকের দিকে তাকায়। ঘরগুলো এখনো ঠিক করা হয়নি। পোড়া অবস্থায় আছে। ওই ঘরে কয়েকজন পুলিশের লাশ ছিল। ওই পোড়া লাশ সরানোর সময় পরদেশী, লালু, যাদব, সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। এখন ওরা মাঝেমধ্যে ওই পোড়া ব্যারাকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, আমাদেরও সুযোগ আসবে। তোমরা যেখানেই থাকো, স্বাধীনতার বাতাস বুকে টেনে বলবে, ডোমেরাও আমাদের পাশে ছিল। রাবেয়ার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, ওই ঘরের ভেতরে আটকে রেখে দুজন পুলিশের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া যায় না? তাহলেই প্রতিশোধ নেওয়া জুতসই হয়।

ও নিজের দুহাত মুঠি করে ধরে রাখে। দূরের দিকে তাকায়। আশপাশে দৃষ্টি ঘোরায়। চাকরিজীবনের শেষ বেলায় এতসব মেয়ের এমন দুর্দশা দেখতে হলো। ভেবে ওর মাথার পোকা কিলবিল করে। জীবনভর ভালো কিছু জোটেনি। সে জন্য আফসোস নেই রাবেয়ার। বাবা-মা একটি বয়সী লোকের সঙ্গে বিয়ে দিল। বছর তিনেক সংসার করতে না-করতেই মরে গেল। একদিন ভরদুপুরে কাশতে কাশতে চোখ স্থির হয়ে গেল লোকটার। ছেলেটার বয়স তখন দুই শেষ হয়েছে মাত্র। সেই ছেলে বড় হলো। বিয়ে করল। মদের নেশায় বুদ হয়ে থাকতে শিখল। মাকে বলতে শিখল, পেটে ধরেছিস বলে মনে করিস না যে তোর গর্ভের ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে। আমি তোকে ভাত দিতে পারব না। ওষুধও না। কিছু না। ও যে এসব মদের নেশায় বলে, তা নয়। জেনেশুনেই বলে। ব্যস, হয়ে গেল বুড়ির পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ। সব বুঝে চাকরিটাকে আঁকড়ে ধরল। সুইপারের চাকরি। ভালোই তো কেটেছিল দিন। কিন্তু শেষ বেলায় এসে এসব কী দেখতে হচ্ছে? নরক দেখার চেয়েও বেশি দেখা? রাবেয়া ঝাড়টা উঠিয়ে এনে নিজের পাশে রাখে। জীবনভর যা কিছু দেখা হয়নি, তার সবটুকু কত অল্প সময়ে দেখতে হলো। ও দেয়ালের গায়ে মাথা ঠেকালে ওর চোখ জলে ভরে ওঠে। একসময় দুগাল বেয়ে গড়াতে থাকে।

পঁচিশের রাতে ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এসএফ ক্যানটিনে ছিল। পাঞ্জাবি সেনারা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়েদের এনে ব্যারাকে জমা করতে থাকে। অনেক মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের ওপর তলায় রাখা হয়। যাদের ব্যারাকে রাখা যায়নি, তাদের বারান্দায় রাখা হয়। কখনো জিপে করে ওদের কোথায় নিয়ে গেছে ও জানে না। এক দলকে পাঁচ-সাত দিন রেখে অন্য কোথাও ছেড়ে দিয়েছে। আবার জিপ ভর্তি করে এনেছে নতুন মেয়েদের।

রাবেয়া ঝাড়টা নিজের সামনে রাখে। পা দিয়ে নাড়াচাড়া করে। ও বুঝতে পারে, ওর ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সেনাগুলোকে যদি এই ঝাড়ু দিয়ে পেটানো যেত? পিটিয়ে ড্রেনে ফেলা যেত? যদি ওদের বলতে পারত যে তোরা বেজন্মা। মানুষের বাচ্চা না। তাহলে পৃথিবীর সবটুকু শান্তি ওর সামনে এসে পাহাড় হতো। ওই মেয়েটিকে একটা ছুরি দিলে কি হয় যে ওদের আঁচড়েকামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে? রাবেয়ার চোখ জ্বলে ওঠে। ও ঠিক করে, মেয়েটিকে একটি ছুরি দেবে। ছোট একটি ছুরি। ওদের হাতে নির্যাতিত হয়ে

মরে যেতে মেয়েটির খুব লজ্জা হচ্ছে। এমন কথা ও রাবেয়াকে বলেছে। বলেছে, মরে যেতে আমার ভয় নাই। কিন্তু কিছু না ঘটিয়ে মরতে চাই না। একটাকেও যদি জবাই দিতে পারি, তাহলে বুঝব স্বাধীনতার জন্য কিছু করেছি।

রাবেয়া আঁতকে উঠে বলেছিল, এই যে শরীর দিচ্ছ, এটা কিছু করা নয়? এটাও তো স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধ না বাধলে তোমাকে এখানে আটকাত কোন শালা।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল মেয়েটির মুখ। নিজেকেই বলেছিল, দেশের মানুষ কি যন্ত্রণাকে যুদ্ধ বলবে?

ঝাড়ু নাড়াচাড়া করতে করতে রাবেয়া ভাবে, একটি ঘটনা ঘটিয়ে মরুক মেয়েটি। ওকে ধরে নিয়ে আসার পর থেকে মেয়েটি তো ফাইট করছে। একটুও না দমে ফাইট করতে যা বোঝায়, তা-ই করছে। একটি ঘটনা ঘটাতে পারলে ওর আত্মা শান্তি পাবে। হঠাৎ নিজের ভাবনায় চমকে ওঠে রাবেয়া। ভাবে, যুদ্ধের সময় কারও আত্মা কি শান্তি পায়? স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই।

ও দেখতে পায়, তিনজন সেনা হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। ওদের বুটের শব্দে স্তব্ধ হয়ে যেতে চায় রাবেয়ার হস্পন্দন। তার পরও শব্দ ওকে আড়ষ্ট করে রাখে। ওর দুচোখে বিদ্যুতের আলো চমকায়। ওরা এসব মেয়ের কাছে যখন-তখন আসে। যখন খুশি তখন। যেন উল্লাস করবে বলে ওদের যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধ মানে মেয়েদের শরীর ছিঁড়ে-খুবলে খাওয়া। রাবেয়া দাঁড়িয়ে থেকে তিনজন সেনাকে চলে যেতে দেখে। ও জানে, একটু পর আবার কেউ আসবে।

ও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। দুপা ফেলার পর মনে হয় উঠতে পারছে না। শব্দ ওকে পিছু টেনে ধরে, বিকট শব্দ। ঝমঝম করছে শব্দের তাণ্ডব। কাঁপছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এসএফ ক্যানটিনে লুকিয়ে ছিল রাবেয়া। একদিকে হামলা, অন্যদিকে পুলিশদের বাধা দেওয়া। সারা দিন ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে সেদিন আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। দিনভর উত্তেজনা ছিল। রক্ত গরম ছিল সবার। পুলিশ ভাইদের অস্ত্রের ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, এত কিছু ছেড়ে বাড়ি যাবে

কেন? যুদ্ধ তো ওকেও করতে হবে। যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ওরা এসেছিল কামান, গোলা, বোমা, ট্যাংক নিয়ে। কানফাটা গর্জনে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল চারদিক। ও ধরে নিয়েছিল, শেখের বেটার ভাষণের পর এত দিনে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ও এখন একটা পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আছে।

ও আবার দুপা ফেলে দুটো সিঁড়ি পার হয়। শরীর ভারী হয়ে গেছে। শরীরজুড়ে কাঁটা। কাঁটার খোঁচায় প্রতি মুহূর্তে টুপটুপ করে রক্ত ঝরে। এ এক ভিন্ন ধরনের যন্ত্রণা। অনুভব করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। রক্ত ঝরার দৃশ্যটি বারান্দার শিকে ঝুলিয়ে রাখা মেয়েদের শরীর। রাবেয়ার হাত থেকে ঝাড়ু পড়ে যায়। ও ধপ করে বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকে।

সেদিন থেকে কত কিছু দেখা হলো।

এক জীবনে অনেক কিছু দেখার প্রেরণায় রাবেয়া দু-তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মাথায় ওঠে। লম্বা বারান্দা পার হলে পাবে ঘর। সব ঘরে বন্দী আছে মেয়েরা। তখন ওর বুক ধড়ফড় করে। বুঝতে পারে, ওর দেখার সত্য যুদ্ধের স্মৃতি। এসব মেয়ের বীরত্বের সাক্ষী হয়ে ও নিজের স্মৃতির কথা বলবে সবাইকে। বলবে সবার আগে। যারা ওদের নষ্ট মেয়ে বলবে, তাদের মুখের ওপর।

তখন আর্তচিৎকার ভেসে আসে বারান্দার শেষ মাথার ঘর থেকে। ওকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে ওরা। মেয়েটি ওকে যেন কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে পারেনি। কথা বলার আগেই ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ও কি আর বলতে পারবে? রাবেয়া দ্রুত পায়ে হেঁটে শেষ ঘরটিতে যায়। মেয়েটি পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ঝুলে আছে। পা বেঁধে ঝোলানো হয়েছে ওকে। ওর মাথা নিচের দিকে। ওর শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে। ও একজন সেনাকে আঁচড়ে-খামচে দিয়েছে বলে এই নির্যাতন। ঝুলিয়ে রেখে চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে মেয়েটিকে। এভাবে ও আর কয় দিন বাঁচবে? ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে যে চিৎকার-তোলপাড় করেছিল চারদিক, তা এখন স্তিমিত। রাবেয়া ওর মাথার কাছে দাঁড়ায়। উল্টে থাকা চুল জড়ো করে মাথার ওপর খোঁপার মতো বেঁধে দেয়। ওর হাতের মুঠি বন্ধ। ও হয়তো একটা কিছু খামচে ধরতে চেয়েছিল।

পায়নি বলে শূন্য মুঠি স্থির হয়ে আছে। ওর ন্যাংটা, বিবস্ত্র, উলঙ্গ শরীর দুলছে। রাবেয়া ওর মাথা বুকে চেপে ধরে বলে, চোখ খোলা মেয়ে। দেখো আমাকে।

মেয়েটি চোখ খুলতে পারে না। ওর চোখের পাতা ফুলে আছে। মাথা উল্টো হয়ে আছে বলে রাবেয়াকে ক্ষণিকের জন্য দেখারও সুযোগ নেই।

তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে, বলবে?

আমার মায়ের বাড়ির ঠিকানা দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে। আমার মৃত্যুর খবরটা তাকে দিতে বলতে চেয়েছিলাম। এখন তো আর দিতে পারব না।

মুখে মুখে ঠিকানা বলল, আমি ঠিকই মনে রাখতে পারব। আমি তোমার খবর তোমার মাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব। তুমি আমার মানিক, তুমি আমার সোনা।

কিন্তু মেয়েটি আর কথা বলে না। নিথর হয়ে যায় ওর দেহ। রাবেয়ার বুকে মাথা রেখে ঝুলন্ত অবস্থায় মরে যায় মেয়েটি। রাবেয়া কতক্ষণ ওকে বুকে রেখেছিল, ও জানে না। ওর নিথর শরীর ক্রমাগত শীতল হয়ে যাওয়ার অনুভবও ও টের পায়নি। ও শুধু বুঝেছিল, স্বাধীনতার কথা ওর বুকের ভেতরে তড়পাচ্ছে। ও চিৎকার করে বলছে, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিলে তুমি। তোমার মাকে এ খবর কেমন করে পৌঁছাব? আমি কোথায় খুঁজব তোমার মাকে? তোমার লাশ ওরা কোথায় নিয়ে ফেলে দেবে, তা-ও আমি জানি না। আমি আর তোমাকে খুঁজে পাব না, মেয়ে।

হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে রাবেয়া। ঝুলন্ত মেয়েটির মাথার কাছে বসে পা ছড়িয়ে দেয় ও। যেন ওর দুপায়ের ওপর বালিশ রেখে মেয়েটিকে শোয়ানো হবে। আর ঘুমপাড়ানি গান গাইবে রাবেয়া। সেই গানে দাগ পড়তে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। হায় রাবেয়া, তুমি যা দেখছ, সে দেখার শেষ নেই।

একদিন জেবুন্নেসা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলে, তুমি আমাকে একটা ছুরি দাও, খালা। আমি এভাবে মরতে পারব না। একটাকে মেরে মরতে চাই। এটাই হবে আমার যুদ্ধ।

যুদ্ধ? মাগো, তুমি যুদ্ধ করতে চাও?

হ্যাঁ, চাই তো। যুদ্ধ করে শহীদ হতে চাই। আমাকে একটা ছুরি দিলেই হবে, খালা। এদের নির্যাতনে মরে গেলে কেউ আমাকে শহীদ বলবে না, খালা।

হ্যাঁ, তা বলবে না। এত কিছু দেখে আমিও যদি মরে যাই, আমিও শহীদ হব না।

জেবুন্নেসার কাতরানো শব্দ উঁচু হয়ে ওঠে। গায়ের জোর ঢেলে চেঁচিয়ে বলে, তুমি না বলেছ যে, খালা, আমার শরীর আমার না। এই শরীর এখন স্বাধীনতার। তাহলে আমি মরে গেলে শহীদ হব না কেন? আর বেঁচে গেলেই বা আমার কী হবে? সমাজের মানুষ কি আমাকে বুকে তুলে নেবে? আমার সব ক্ষতি পুষিয়ে দেবে?

জেবুরে, তোমার কি পিপাসা পেয়েছে? পানি দেব?

না, আমার পিপাসা পায়নি। পানি দিতে হবে না। আমাকে ছুরি দাও। কাত হয়ে পড়ে যায় জেবুন্নেসা। রাবেয়া ওকে ধরতে পারে না। শুনতে পায় বাইরে বুটের শব্দ। তোলপাড় করে সেই শব্দ এগিয়ে আসছে। তারপর আর্তচিঙ্কারে ভরে যায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রাঙ্গণ। রাবেয়া ঝাড়বালতি নিয়ে ব্যারাক পরিষ্কারের কাজে লাগে। দুকান ভরে শুনতে থাকে অনেক মেয়ের আর্তচিৎকার। ঘরের ভেতর গর্জন। গোঙানি। ধমক। গালি। সব মিলিয়ে যুদ্ধ রাবেয়া খাতুনের শোনার ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে। ও একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। জেবুন্নেসা মরে গেলে কি শহীদ হবে? রাবেয়া আকাশপাতাল হাতড়ায়। না, এ প্রশ্নের উত্তর ওর কাছে নেই। ও মুখসুস্থ মানুষ, এত প্রশ্নের উত্তর ও কেমন করে বুঝবে। রাবেয়া ঝাড়-বালতি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে।

একবার মাথা টলে ওঠে। ও রেলিং ধরে সামলায়। দেখতে পায় পরদেশী ড্রেন পরিষ্কার করছে। এই মুহূর্তে পরদেশী ওর কাছে ছায়া। দুচারটে কথা বললেও নিঃশ্বাস ফেলা সহজ হয়, নইলে চারদিকের দম আটকানো ভয়াবহতা রাবেয়ার বেঁচে থাকার জীবনটুকু মুড়ে ফেলে। ও দ্রুত পায়ে পরদেশীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

আর তো সইতে পারি না, পরদেশী।

পরদেশী নিজের কাজ করতে করতে এবং মাথা তুলে না-তুলে কঠিন গলায় বলে, পারতে হবে। যুদ্ধ কী, আমি জানি না। শুধু বুঝি, শত্রুরা এমন করে।

তাহলে যে মেয়েটা মরে গেছে, সে কি শহীদ?

কী বললি? আরেকবার বল।

ও কি শহীদ? ওকে কি শহীদ বলবে স্বাধীন দেশের মানুষ?

শহীদ! শহীদ! কী যে যা তা ভাবিস না। এখন এসব কি ভাবা ঠিক। আমি জানি না। ওদের শহীদ বলা হবে কি না।

পরদেশী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। রাবেয়াকে অন্য রকম লাগছে। রাবেয়াও হয়তো একদিন শহীদ হয়ে যাবে। পরদেশী চারদিকে ঝড়ের তোলপাড় অনুভব করে।

রাবেয়া অসহায়ের মতো বলে, কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করব?

কাউকে না। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। চুপ করে থাক। মুখ আটকে রাখ।

পরদেশীকে বিভ্রান্ত দেখায়। এই মুহূর্তে ওকে চিনতে পারছে না রাবেয়া। ও তখন দুহাত ওপরে তুলে হাতের ঝাড় শূন্যে ঘোরায়। বলে, ঝড় তুলব। একটা বড় ঝড়।

পরদেশী ধমক দিয়ে বলে, থাম, রাবেয়া। এমন করলে তোর দিকে একটা গুলি ছুটে আসবে। তুই মরবি। তখন মেয়েগুলোকে দেখবে কে? এই যে গুমুত সাফ করছিস, এটাও তোর যুদ্ধ।

যুদ্ধ? মিথ্যে কথা। ওই শয়তানগুলোর দিকে কামান দাগতে না পারলে আমার আর যুদ্ধ কী!

রাবেয়া সোজা রাস্তা ধরে দৌড়াতে থাকে। ও কোথায় যাবে? যেখানে খুশি সেখানে যাক, পরদেশী ভাবে। ওর ড্রেন পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। ও কাজে মন দেয়। বুকের ভেতরে কষ্ট। পঁচিশের রাতে লাইনের পুলিশদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে যুদ্ধ করা যেত। এখন ও কী করবে? ওর ভাবনা ফুরোয় না। পরমুহূর্তে ভাবে, ওর যাওয়া উচিত নয়। ও গেলে মেয়েগুলোকে দেখবে কে? মেয়েগুলোর যদি ওকে কোনো কারণে দরকার হয়? যদি কোনো কাজের কথা বলতে চায়? সেই জরুরি কাজটি করতে পারলে ওর এই পুলিশ লাইনে থাকা সার্থক হবে। এটিও যুদ্ধের কাজ। ওর দিনগুলো এখন ওর নিজের নয়। দিনগুলো স্বাধীনতার। দেশের স্বাধীনতার। সেদিন যদি ওর জীবনে আসে, তখন ও দেশের মানুষকে বলবে, আমাকে পুরো দেশ পরিষ্কার করার কাজ দাও। আমি দেশের সব রাস্তা ঝাড় দেব।

বাতাসের শনশন কান পেতে শোনে পরদেশী। কবে বাবা-মার হাত ধরে এ দেশে এসেছিল, কবে কতগুলো দিন ঝোড়ো বাতাসের মতো উড়ে গেল। কোনো কিছুর তো হিসাব করেনি। বেঁচে থাকা নিয়েই খুশি ছিল। বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, তার সবকিছুই করেছিল। শুধু যুদ্ধ দেখা হয়নি। একদিন রেসকোর্স ময়দানে শেখের বেটার বক্তৃতা শুনতে গিয়ে তার কথায় যুদ্ধ টের পেয়েছিল। তার মুখে যুদ্ধ দেখেছিল। এখন যুদ্ধ দেখছে ওই মেয়েগুলোর শরীরে। পরদেশী ড্রেনের ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোজে। শুনতে পায় আর্তনাদ। চেঁচাচ্ছে রাবেয়া। সেনাদের কেউ ওর পিঠে রাইফেলের বাট দিয়ে মেরে বলছে, এধার কিউ আয় হ্যায়? কাম মে যাও। রাবেয়া মাটিতে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। পরদেশী ড্রেন থেকে উঠে রাবেয়ার দিকে যেতে চাইলে একজন ওর দিকে বন্দুক তাক করে চেঁচিয়ে বলে, খবরদার। খামোশ! পরদেশী থমকে

দাঁড়ায়। দু-চার পা পিছিয়ে ফিরে আসে ড্রেনের কাছে। সারা দিন রাবেয়ার সঙ্গে ওর আর দেখা হয় না। ভাবে, রাবেয়া কি একদিন শহীদ হবে!

এর কয়েক দিন পর রাবেয়া ওকে জেবুন্নেসার গল্প বলে। বলে, জেবুন্নেসার জন্য ছুরি কিনতে হবে। বেশি বড় নয়, কিন্তু শক্তপোক্ত এবং খুবই ধারালো। যেন অনায়াসে পেটের ভেতর ঢুকে যায়। কিনতে হবে আজই। দেরি করার সময় নেই। আজই।

আজই কেন? আজ কি বিশেষ দিন যে আজই কিনতে হবে।

বিশেষ দিনটিন বলে কিছু নেই। ও ওর যুদ্ধ শেষ করতে চায়। ও আর দিন গড়াতে চায় না। বুঝলি?

পরদেশী একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলে, তাহলে আমাদের উচিত ওকে অস্ত্র দেওয়া। ওরা যত মরবে, যুদ্ধ তত বাড়বে।

হ্যাঁ, আমাদের উচিত। আজই কিনতে হবে। আমিও চাই না এমন যন্ত্রণা সহ্য করে ওরা বেঁচে থাকুক। যুদ্ধ যখন করতেই হবে হয়ে যাক এসপারওসপার।

আমি কাজ থেকে ফিরেই দোকানে যাব। কোনো সময় নষ্ট করবে না। রাবেয়া আঙুল উঁচিয়ে বলে, ও আরও দুটো জিনিস চেয়েছে। বলেছে, ওর খুব দরকার।

কী? পরদেশী ভুরু কুঁচকে তাকায়। কী চেয়েছে?

এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল।

কী করবে?

চিঠি লিখবে।

কাকে? এমন নরককুণ্ড থেকে কাকে চিঠি লিখবে ও?

তা আমাকে বলেনি। আমিও জানতে চাইনি। কেন জানতে চাইব। ওর যাকে খুশি তাকে লিখবে।

লিখতে পারবে? কেমন করে লিখবে? ওদের শরীর তো আর শরীর নেই।

মাটিতে উপুড় হয়ে লিখবে বলেছে। লিখতে পারবে ও। ওর মনের জোর আছে। সাহস আছে। খুব জেদি মেয়ে। একরোখা। মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করে। টু শব্দ করে না। বলে, শুধু প্রতিশোধ নিতে পারলে ওর যন্ত্রণা শেষ হবে। সেদিন ও প্রাণফাটা চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেবে।

ভালোই তো, আমরা ওকে কাগজ দেব। পেনসিল দেব। যা চাইবে, তা-ই দেব।

আমি কাগজ আনতে গিয়েই মার খেয়েছি।

পেরেছিস আনতে?

পেরেছি। আমার এই রাউজের ভেতরে কাগজ আর পেনসিল আছে। ওকে এখনো দিইনি। ছুরির সঙ্গে একসঙ্গে দেব।

কাগজ-পেনসিল দিয়ে দে। ওর লিখতে সময় লাগবে। লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতে হবে তো।

ও পারবে। তুই ওকে তো কাছ থেকে দেখিসনি। ওর সঙ্গে কথা বললে আমারও সাহস বাড়ে।

চা খাবি, রাবেয়া?

হ্যাঁ, চা চাই। শরীর চাঙা করতে হবে।

তুই এখানে থাক। আমি ক্যানটিন থেকে চা নিয়ে আসছি।

পরদেশী চলে গেলে রাবেয়ার মনে হয়, ও ভয় পেয়েছে। পরদেশী বেশি কিছু ভাবতে পারছে না। জেবুন্নেসা একটি চিঠিই তো লিখবে। ওর যাকে খুশি তাকে, তাতে কী এসে-যায়। ওর দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, অপমানের জ্বালা আছে। স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞা আছে। এত কিছু বুকে নিয়ে ও এখানে কেন বন্দী থাকবে। রাবেয়া আঁচল নেড়ে বাতাস লাগানোর চেষ্টা করে। বৈশাখের শেষ। দারুণ গরম পড়েছে।

চা আর একটা করে ডালপুরি নিয়ে ফিরে আসে পরদেশী। ডালপুরি দেখে খুশি হয় রাবেয়া।

ডালপুরি এনেছিস? কী যে মজা! ডালপুরি দেখেই বুঝেছি যে খিদে পেয়েছে। সে জন্য পেটটা মোচড়াচ্ছে।

ও ডালপুরিতে কামড় বসায়। পরদেশী আড়চোখে ওর খুশি মুখ দেখে। কিছু বলে না। নিজের ডালপুরি আর চা খেয়ে শেষ করে। তারপর আস্তে করে বলে, ক্যানটিনের মিলিশিয়া সেপাইটা তোকে উদ্দেশ করে বলেছে, ওই মেয়েলোকটার সঙ্গে তোকে যদি বেশি কথা বলতে দেখি, তাহলে অফিসে নালিশ দেব। তখন দেখবি গুলি খেয়ে মরবি। এখন থেকে সাবধান হয়ে যা।

তুই বললি?

তুই তো জানিস, ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না হয়। আমি কিছুই বলিনি। চা নিয়ে সোজা তোর কাছেই তো চলে এলাম। দেখুক কথা বলি কি বলি না।

ঠিক আছে, যা খুশি করুক। অত ভয় পাই না। তবে এখন থেকে আমরা ব্যারাকের পেছনে বসে কথা বলব।

জায়গা খোঁজার দরকার নেই। যেখানে কাজ সেখানেই কথা হবে। আমাদের তো কথা বলতে হবে। আমাদের মেয়েগুলো স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছে আর আমরা কথাও বলব না?

ঠিক বলেছিস। যাই।

রাবেয়া আর পরদেশীর দিকে ফিরে তাকায় না। আঁচল দিয়ে নিজের মুখহাত মুছে নেয়। ঝাড় নেয়, সেটা বগলের নিচে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। সিঁড়ির মুখে সূর্যমণির মুখোমুখি হয় রাবেয়া। ওকে দেখে থমকে দাঁড়ায় সূর্যমণি। চোখ মুছতে মুছতে বলে, আর চাকরি করব না ঠিক করেছি। এত নির্যাতন সহ্য হয় না। আমি ভাত খেতে পারি না। রাতে ঘুমোত পারি না।

চুপ কর, সূর্য। কী করছে ওরা?

পরিষ্কার করে দেওয়ার পর একটু স্বস্তিতে আছে।

ঘুমোতে পারছে?

কেউ কেউ চোখ বুজেছে।

তাহলে এখানে একটু বসি। ওরা একটু ঘুমিয়ে নিক।

জেবুন্নেসা তোমাকে খুঁজছিল।

রাবেয়া চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস টানে। সূর্যমণিকে জেবুন্নেসার কথা বলা হয় না। যেটুকু পরদেশীকে বলেছে, সেটুকু আর কাউকে বলবে না। দুজনে পাশাপাশি সিঁড়িতে বসে। রাবেয়ার কানে ভেসে আসে জেবুন্নেসার কন্ঠ—আমি আব্বা-আম্মা-ভাইবোনের সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। আব্বা বলেছিলেন, এই গণহত্যার পরে আমরা আর ঢাকায় থাকব না। গ্রামে চলে যাব। তারপর কী করব দেখা যাবে। যুদ্ধে যাওয়ার পথে যাব। কিন্তু সদরঘাটে ওরা আমাকে

ধরে। আব্বাকে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়। আম্মা ছোট ভাইবোনদের নিয়ে কোথায় আছে, আমি জানি না। আম্মাও জানে না আমি কোথায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জেবুন্নেসা আবার বলে, মারুফও জানে না আমি কোথায়। মারুফের সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে? মারুফ কোথায়, তা আমি জানি। ও কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। ও আমাকে বলেছিল, যুদ্ধ শুরু হলে ও দেশে থাকবে না।

রাবেয়া মৃদু হেসে বলেছিল, মারুফের সঙ্গে তোমার পেরেম না?

ও ঘাড় নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ। ছয় মাস আগে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সময় ও আমাকে বলেছিল, আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করব, জেবু। আমি বলেছিলাম, যুদ্ধ হবে তুমি তা কী করে জানলে? ও শপথের মতো করে বলেছিল, এই ভাষণের পরে যুদ্ধ না হয়ে পারে না। যুদ্ধ হবে। দেশও স্বাধীন হবে। রাবেয়া খালা, মারুফ তো আমাকে আর খুঁজে পাবে না, না?

রাবেয়া চুপ করে ছিল। রাবেয়া নিজেও বোঝে, এসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। জেবুন্নেসাও বোঝে যে উত্তর হয় না। পুরো সময়টাই অনিশ্চয়তায় ভরা। কোথায় কাকে কখন পাওয়া যাবে, এ কথা কেউ জানে না।

জেবুন্নেসা ওর হাত ধরে বলেছিল, তুমি আমার একটা চিঠি মারুফকে পৌঁছে দেবে, রাবেয়া খালা?

চিঠি? কোথায় পৌঁছাব? মারুফকে তো আমি চিনি না।

মারুফের বাড়িতে পৌঁছাবে। ওকে তোমার চিনতে হবে না। ওর বাড়িতে ওর বাবা-মা, বোন থাকে। ওনাদের কারও হাতে চিঠিটা দিয়ে আসবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে মারুফ জানতে পারবে যে আমি নেই। আমি শহীদ হয়েছি।

ঠিকানা আছে?

সব দেব। তুমি আমাকে কাগজ-পেনসিল জোগাড় করে দিয়ো। দেবে তো, খালা? তোমার পায়ে ধরি, খালা। মরার আগে তুমি আমার এই ইচ্ছাটা পূরণ করো।

এখনো জেবুন্নেসার অনুরোধ দুকান ভরে বাজে রাবেয়ার কানে। ব্লাউজের ভেতরে এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল রাখা আছে। ওরা দেখতে পায়, ওদের খেতে দিতে তিন-চার বালতি ভরে ভাত-ডাল-তরকারি আনা হচ্ছে। এখন ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। রাবেয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবার জেবুন্নেসার কন্ঠস্বর শুনতে পায়, খালা, আমি মরে গেলে তুমি আমার কথা মারুফকে বলবে। নাকি বলা ঠিক হবে না? আমার এই দুর্দশার কথা শুনতে বোধ হয় ওর ভালো লাগবে না, খালা। থাক, তোমাকে কোনো কথা বলতে হবে না। আমি জানি, ও ওর স্মৃতি থেকে আমাকে সরাতে পারবে না। ও বলেছে, আমার সঙ্গেই ওর প্রথম প্রেম। আমিও মারুফ ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসার কথা বলিনি। ওর সঙ্গে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় হয়। আর্টস বিল্ডিংয়ের দোতলায় প্রথম কথা হয়।

রাবেয়া ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি ঘুমাও, মেয়ে।

এত কথা বললে তোমার শক্তি কমে যাবে। তোমাকে আমি ছুরি দেব। তোমার সামনে যুদ্ধ আছে।

হ্যাঁ, আমি যুদ্ধ করব। তার পরও তোমাকে মারুফের কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। মারুফের বাড়িতে কেউ আমাকে চেনে না। ওর বোন মেরিনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। মারুফকে না পেলে আমার চিঠিটা মেরিনার কাছে দিয়ো। মেরিনাকে যতটুকু দেখেছি, ভালো মেয়ে মনে হয়েছে। ও আমার ওপর রাগ করবে না।

তুমি আর কথা বোলো না, জেবুন্নেসা।

আমার তো কথা বলতে ভালো লাগছে। আমি তো ভাবতে পারছি যে আমি মারুফের সঙ্গে কথা বলছি। অসহযোগ আন্দোলনের পুরো সময় আমরা অনেক কথা বলেছি। আমরা দুজনেই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিলাম। আমরা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। মিছিল

করেছিলাম। যেদিন আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল, সেদিন ও বলেছিল, ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত। আমি হেসে বলেছিলাম, ইয়াহিয়া খান দেশে অস্ত্র আর সৈন্য এনে ভরে ফেলেছে, তুমি বসন্তের কথা বলছ? ও বলেছিল, অস্ত্রের ফাঁক গলিয়ে যে ফুলটি ফুটবে, সেই ফুলটি আমি তোমাকে দেব, জেবু। বলব, তোমার খোঁপায় স্বাধীনতা খুঁজে দিলাম। ওর সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেতাম, খালা। আমার যুদ্ধের কথা তুমি ওকে বোলো, খালা।

বলব, বলব। আমি সব বলব ওকে। তুমি থামো।

সেদিন জেবুন্নেসা আর কথা বলেনি। ওর চোখ বুজে এসেছিল। ও নেতিয়ে পড়েছিল। জ্ঞান হারিয়েছিল। আমি ওর চোখমুখে পানি ছিটিয়ে বলেছিলাম, জেবু, ওঠো। জেবুন্নেসা ওঠেনি। আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, স্যার, মেয়েটাকে দেখেন। ও বোধ হয় বাঁচবে না।

ডাক্তার বিরক্তির সঙ্গে আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, এদের মরাই উচিত। এগুলো বাঁচবে কোন সাধে? ভাগাড়ের শকুন সব।

ডাক্তার জেবুন্নেসাকে দেখতে আসেনি। পুলিশ লাইনের বাঙালি ডাক্তার। সেদিন রাবেয়া মনের সুখে গাল দিয়েছিল, জাউরা একটা। হারামি। যুদ্ধ বোঝে না। স্বাধীনতা বোঝে না। হারামি নিজের জীবন বোঝে শুধু। হারামি, তুইও বাঁচবি কোন সাধে?

তারপর একদিন ভরদুপুরে, যখন হালকা মেঘের আড়ালে রোদ ঝিমিয়ে পড়েছে পুলিশ লাইনের ওপর, কোনো জরুরি অপারেশনে বেরিয়েছিল বেশির ভাগ মিলিটারি গাড়ি, সেদিন এক শ টা কমলা নিয়ে এসেছিল ডাক্তার আহমদ। বলেছিল, ওদের দেখার মতো মনের জোর আমার নাই, রাবেয়া। ওদের জন্য ওষুধ বরাদ্দ নাই। চিকিৎসাব্যবস্থার কিছু নাই। ওদের জন্য আমি কিছু করতে পারব না বলে আমি আসি না। তুমি আমার কথায় কিছু মনে করবে না।

স্যার, আপনি কী যে বলেন।

রাবেয়া বিব্রত এবং লজ্জিত হয়েছিল।

এই কমলাগুলো রাখো। লুকিয়ে রাখবে। ওদের খেতে দিয়ো। আর বলবে, লাইনের ডাক্তার ওদের জন্য কিছু করতে পারেনি বলে তার মরে যেতে ইচ্ছা করে।

যুদ্ধে যেতে ইচ্ছা করে না, স্যার?

হ্যাঁ, করে। কিন্তু বিছানায় পড়ে যাওয়া বাবাকে ফেলে আমার যুদ্ধে যেতে ভয় করে। মানুষটা আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে। বলে, আমাকে বিষ দে, খোকা। আমি মরে যাই। তুই যুদ্ধে যা। আমি এসব কথা শুনলে বোকা হয়ে যাই। আমার চারদিকে অন্ধকার।

সেদিন ডাক্তার আহমদকে একজন অসহায় মানুষ মনে হয়েছিল রাবেয়ার। মনে হয়েছিল, ওর নিজের যে মনের জোর আছে, সেটুকু এই ডাক্তারের নেই। ও হাত উল্টে মাফ করে দিয়েছিল তাকে। নিজেকে বলেছিল, কোনো কোনো মানুষ এমন। গর্তে লুকিয়ে থেকে ভাবে, দিনটা আজ বড্ড ঠান্ডা। কোথা থেকে এত শীত পড়ল। কুয়াশা এমন ঘন কেন? দৃষ্টি বেশি দূরে ছড়ানো যায় না। ওদের মাথা কোনো দিনই আকাশসমান হয় না।

জেবুন্নেসা আরও বলেছিল, মরার আগে ভালোবাসা বুঝেছি। আরেক জীবনে ঠিকই মারুফের সঙ্গে দেখা হবে আমার। আবার প্রেমের কথা শুনব ওর কাছ থেকে। বলব, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছিলাম। এবার প্রেমের জন্য জীবন দেব। ও ঠিকই হাসতে হাসতে বলবে, আর জীবন দিতে হবে না। এখন আমাদের শান্তির জীবন কাটবে। আমাদের সংসারের বাগানে ফুল ফুটবে। রাবেয়া খালা, ওর নাম মারুফুল হক। ওদের বাড়ি হাটখোলায়। তোমাকে আমি ঠিকানা লিখে দেব।

রাবেয়া উঠে দাঁড়ায়। সূর্যমণিকে বলে, আমার সঙ্গে আয়। এদের খেতে দেব।

আমি যাব না। ঝুলিয়ে রাখা মেয়েটাকে কী করে খাওয়াব?

পরদেশীকে ডেকে নিয়ে আয়। সবাই মিলে ধরে ওকে নামাব।

গুলি খেতে চাও? এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুলি করবে তোমাকে। মরার পথ খুঁজে বের করেছ, ভালোই।

মারলে মারবে। ওরা কিছু বললে বলব, আমরা তো তোমাদের জন্য ওকে সুস্থ রাখতে চাই। সে জন্য ওকে খেতে দিয়েছি।

ওরা বলবে, আমাদের লাশ দরকার নাই। দশটা যাবে, আমরা আবার নতুন দশটা আনব।

রাবেয়া ওকে ধমক দিয়ে বলে, তোর কাছে এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না, সূর্যমুখী। লাথি মেরে তোকে দোতলা থেকে ফেলে দেব।

যা খুশি কর। কিন্তু আমি পরদেশীকে এখানে ডেকে আনতে পারব না।

তাহলে তুই আর আমি কাজটা করব।

, সেটাও আমি পারব না। তোমাকেও করতে দেব না।

কেন? রাবেয়া দুহাত কোমরে দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

এরা আমাদের কাউকে বাঁচতে দেবে না। এই মেয়েগুলোকেও না। তুমি বলেছ ওদের একজন একজন করে ছেড়ে দিতে পারলে দেবে। ওরা যুদ্ধ করতে যাবে। বলোনি?

বলেছি তো। সুযোগমতো ছেড়েও দেব।

তাহলে চিন্তাভাবনা করে এগোনো ভালো না?

রাবেয়া চুপ। তারপর মাথা নাড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জেবুন্নেসার কাছে গিয়ে বলে, কেমন আছ?

এমন কথা জিজ্ঞেস কোরো না। আমার কাগজ-পেনসিল এনেছ?

হ্যাঁ, এনেছি। এখন দেব না। তুমি তো লিখতে পারবে না।

এভাবে পারব না। পাশের ঘরে নীলু আছে। ওকে ডাকো। ও লিখবে। তোমাকে ভাত খাইয়ে দিই?

না। আমি আর কথা বলতে পারব না, খালা।

রাবেয়া বুঝতে পারে, কথা বলতে মেয়েটির কষ্ট হচ্ছে। ও হয়তো আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবে না। ওর সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়া সময়ের আগে ওকে ওর নিজের মতো থাকতে দিতে হবে। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা এক আশ্চর্য পৃথিবী এখন ওর সামনে। সেই পৃথিবীর দেখা-না-দেখার আকাঙ্ক্ষায় ওর বুকের জমিন তোলপাড়। ও আর কথা বলবেই বা কেন? ও দেখুক নিজের জীবনের কাটিয়ে আসা সময়টুকু। ফাঁকফোকর-গলিঘুপচি সবটুকু হাতড়ে দেখুক-পায়ে হেঁটে দেখুক-একছুট দিয়েও দেখে আসতে পারে। এটা মানতে হবে যে যুদ্ধের সময় অনেক অনেক মেয়ে কেবলই ক্ষতবিক্ষত হয়। রক্তাক্ত হয়। তারপর টুপটাপ রক্ত ঝরে। ঝরতেই থাকে। মেঝেতে রক্ত ছড়ায়। আর মেয়েরা শ্বাস নিতে ভুলে গিয়ে ঝুলে থাকা দৃষ্টি দিয়ে রক্তমাখা মেঝে দেখে। জেবুন্নেসা ধরে নেয়, এভাবে দেখতে শেখা যুদ্ধের সময়ের নিয়ম। মেঠো মাটি নয় যে রক্ত শুষবে। পিচ্ছিল মেঝেতে রক্ত কালো দাগ হয়ে দু-চার শ নদীর মতো শুকিয়ে থাকা। গড়িয়ে যাওয়া রক্তের আঁকাবাঁকা রেখা জেবুন্নেসার দৃষ্টিতে এক মানচিত্র, যেখানে জনপদ আছে, মানুষের বসবাস আছে। এসব জায়গা এখন দুর্গ, মিলিটারি কনভয় এবং যুদ্ধের তাণ্ডব। রক্ত, মৃত্যু, জীবন এক সুতায় সমান্তরাল গাঁথা। এই মানচিত্রে শত শত মাইল শস্যক্ষেত্র আছে, পতিত জমি ও সীমান্তরেখা মানচিত্রের পৃষ্ঠার রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র। সারা দেশের শহরগুলো গেরিলাযুদ্ধে আক্রান্ত। লড়ছে শহরবাসী—নানা কৌশলে, নানা সূত্রে-পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রেখে অথবা না রেখে।

সত্য শুধু লড়াই। জেবুন্নেসা তাকিয়ে থাকলে নিজের পরিবারের হারিয়ে যাওয়া ছবি দেখতে পায়। ভাবে, ওরা কোথাও না কোথাও আছে গ্রামে অথবা শহরে, নানা অথবা দাদার বাড়িতে। নয়তো চাচা-মামা কারও সঙ্গে ওর মা সব ভাইবোনকে নিয়ে চলে গেছে। হয়তো ওদের সঙ্গে মারুফের দেখা হতে পারে। মারুফকে ওর মা চেনে না, মারুফও ওর মাকে দেখেনি। তার পরও দেখা গেল, কাকতালীয়ভাবে পরিচয় হয় মারুফের সঙ্গে। পথের ধারে একজন নারীকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে থাকতে দেখে মারুফ এগিয়ে যায়। বলে, মাগো, আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছে দেব। কোনো ভয় করবেন না। আমি আপনার দেখাশোনা করব। তখন মা বলবেন, আমার জেবুন্নেসাকে আর্মি তুলে নিয়ে গেছে। ওকে আমি কোথায় খুঁজব, বাবা?

জেবুন্নেসা! মারুফের ভুরু কুঁচকে যাবে। তারপর বলবে, ঠিক আছে, আপনার জেবুন্নেসাকে আমি খুঁজে দেখব। শরণার্থী শিবিরের সব মেয়ের নাম আমি জিজ্ঞেস করব। ওকে খুঁজে পেলে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

ওকে তো আর্মি নিয়ে গেছে, বাবা।

মাগো, আমি সাধ্যমতো খুঁজব।

ভালোবাসার মানুষটিকে মনে করে জেবুন্নেসা চোখ বুজে বড় করে শ্বাস টানে। ভাবে, যুদ্ধের সময় প্রিয়জনকে তো এভাবেই মনে করতে হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতির বাইরে তো কাউকে স্মরণ করা যায় না। যুদ্ধের সবটুকু সেই স্মরণে থাকে।

একসঙ্গে শহরের আনন্দে ফুটে ওঠে দৌড়ে যাওয়া গেরিলাদের সন্তর্পণ বিচরণক্ষেত্র। যেখানে অস্ত্র এবং সাহস এক সুতায় গাঁথা হয়। যেখানে জীবনের পক্ষে নানা উপচার সজ্জিত গৃহগুলো সাহসীদের হাত ধরে বলে, আবার এসো, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় আছি।

আর গোলাবারুদ-ট্যাংক-মর্টার-মেশিনগান আশ্চর্য দ্যুতিময় ঝলকানিতে স্বাধীনতার জন্য লড়াকু মানুষের চকচকে দৃষ্টি হয়ে বলে, ডর নেই। আমরা জয়ী হবই। যত রক্ত এবং জীবন দিতে হোক না কেন, দেবই। স্বাধীনতার সোনালি শস্যক্ষেত্রে দেখো অলৌকিক ফুল ফুটেছে। যে ফুলের নাম জীবন।

জেবুন্নেসার চোখ বুজে আসে।

জেবুন্নেসা মুখ দিয়ে শ্বাস টানে।

জেবুন্নেসার শরীর রক্তে ভাসিয়ে দিচ্ছে মেঝে। ওর জীবনপ্রদীপের শিখায় প্রবল বাতাসের ধাক্কা—ওটা নিবুনিবু প্রায়।

তখন নীলুকে নিয়ে ফিরে আসে রাবেয়া। নীলু স্কুলের ছাত্রী। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। ওর কৈশোরের চোখজোড়া আশ্চর্য শাণিত। বলছে, জেবু আপা, আমি আপনার কী কাজে লাগব?

তুমি আমার জন্য একটি চিঠি লিখবে।

চিঠি? এত সামান্য কাজ দিচ্ছেন?

সামান্য নয়, নীলু। এটি অনেক বড় কাজ। আমি এক সত্য কথা বলতে চাইব এখন।

আপনি বলুন, আমি লিখছি।

জেবুন্নেসা অস্ফুট ধ্বনিতে বলে, প্রিয় মারুফ, আমি তোমার ভালোবাসায় একটি সুখী মেয়ে ছিলাম। তোমার ভালোবাসা স্বাধীনতার জন্য আমার প্রিয় দেশ এখন। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। ওরা আমার লাশ শিয়ালশকুনকে খেতে দিলেও আমি বলব, ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত। যুদ্ধের বসন্ত। তুমি সবাইকে বলবে, যুদ্ধের বসন্তে

জেবুন্নেসা শহীদ নারী। ও স্বাধীনতার জন্য নিজের সবটুকু দিয়েছে। এই নিবেদনে ওর ত্যাগ ছিল, কিন্তু ভয় ছিল না।

জেবুন্নেসার কথা ফুরিয়ে যায়। ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মেধাবী ছাত্রী। ও অস্ফুট ধ্বনিতে বলে, এই চিঠি মারুফের কাছে পৌঁছে দিয়ো, খালা। ওকে পেলে ওর বোনকে দিয়ে। ওকেও না পেলে ওর মাকে দিয়ে। নইলে ওর বাবাকে। কেউ না কেউ যেন জানতে পারে জেবুন্নেসা যুদ্ধের আর একটি ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে। ওকে জয়ের তিলক পরানো হবে, কলঙ্কের নয়।

সেই রাতে মৃত্যু হয় জেবুন্নেসার। ডডামেরা এসে সরিয়ে নিয়ে যায় জেবুন্নেসার লাশ। কোথায় নিয়ে যাবে, তা জানতে পারে না রাবেয়া। ও শুধু অনুভব করে ব্লাউজের ভেতর রাখা আছে জেবুন্নেসার চিঠি আর বাড়ির। ঠিকানা। শীতল হয়ে থাকে রাবেয়া। মুখে কথা নেই। নীলু ওকে ডাকে, খালা। আপনার কী হয়েছে?

রাবেয়া ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে।

নীলু রাগতস্বরে বলে, নিঃশ্বাস ফেললা না, খালা। নিঃশ্বাসের শব্দ পেলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। তুমি যদি আমাকে একটা ছুরি না দাও, তাহলে তোমাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব।

চুপ কর, নীলু। গলা নামিয়ে কথা বল।

আমার গলা আর নামবে না। তোমাকে বলে রাখলাম, একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

করিস। আমি নিচে যাচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রাবেয়া শুনতে পায় নীলু চিৎকার করে কাঁদছে। ওর মনে হয়, ও নামছে তো নামছেই। সিঁড়ি আর শেষ হয় না। কতকাল লাগবে এই সিঁড়ি শেষ হতে?

পরক্ষণে নিজে সিঁড়ির ওপর বসে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ওর ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে যায় পুলিশ লাইনের সুইপারদের কাছে।

পরদিন দুপুর।

হালকা মেঘের আড়ালে রোদ ঝিমিয়ে পড়েছে পুলিশ লাইনের প্রাঙ্গণে। শত শত মৌমাছি কোথা থেকে উড়ে আসছে কেউ বলতে পারে না। তাদের গুঞ্জনে মুখরিত প্রাঙ্গণ। প্রত্যেকে মুখ তুলে চারদিকে তাকায়। ভাবে, আজ এত মৌমাছি কেন? কোথা থেকে এল? পুলিশ লাইনের ব্যারাক-অফিস-প্রাঙ্গণ তো সরষেখেত নয় যে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করতে এসেছে? প্রতিটি ব্যক্তির কপাল কুঁচকে থাকে। তারা ফিসফিস করে বলে, হলো কী আজ? বেলুচিস্তানের সৈনিক বুখারি পাঞ্জাবি সেনা গিলানিকে বলে, কেয়া হুয়া ভাইয়া? বুখারি দেখতে পায়, ওর রাইফেলের বাটে মৌমাছি এসে বসেছে। ভরে গেছে পুরো রাইফেল। দোতলার ঘরে যন্ত্রণায় তড়পাতে তড়পাতে নীলু ভাবে, জেবু আপার চিঠিটা নিতে এসেছে মৌমাছির ঝাঁক। একজন শহীদ নারীর কথা ওরাও ছড়াবে তো! ও ব্যারাকের সব জায়গায় দৌড়ে দৌড়ে বলে, আমরা শহীদ নারী হব। আমাদের কথা পৌঁছে যাবে দেশের মানুষের কাছে। আজ আমাদের এখানে কোনো সেনা নেই। আজ এই ব্যারাক আমাদের আর শত শত মৌমাছির। দেখো, বারান্দায় ঘরের দেয়ালে ফুলের মতো বসে আছে ওরা। ওরা জেবু আপার চিঠি বয়ে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ, এ জন্যই এসেছে।

পরদেশী যাদবকে বলে, মৌমাছিরা আমাদের বন্ধু। ওরা কোন ফুলের ঘ্রাণে এখানে এসেছে রে?

গতকাল যে ফুল ফুটেছে তার ঘ্রাণে এসেছে ওরা।

ঠিক বলেছিস, একজন শহীদ নারী স্বাধীনতার সৌরভ।

এই সৌরভ পেয়েই উড়ে এসেছে মৌমাছি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে কিছু মৌমাছি ধরে বাড়ি নিয়ে যাই। আজ ওরা আমাদের হুল ফোটাবে না।

না থাক, ওদেরকে ওদের মতো করেই থাকতে দে। বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

তখন ড্রেনের পাশে এসে দাঁড়ায় রাবেয়া। পরদেশীকে বলে, এই শহীদ মেয়েদের জন্য তোর কাছে কাজ এসেছে পরদেশী। কাজটা আজই করতে হবে। এক দিনও দেরি নয়।

কাজ? কী করব ওদের জন্য? দুহাতে নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, ওদের জন্য কাজ করে ধন্য হতে চাই আমি।

এই চিঠিটা পৌঁছাতে হবে হাটখোলার একটি বাড়িতে। এই যে ঠিকানা।

দে, দে। আমি আমার বুকপকেটে রাখব?

হ্যাঁ, বুকপকেটেই রাখ।

সিকিউরিটির লোকেরা যদি আমার শরীর হাতড়ায়? যদি চিঠিটা কেড়ে নেয়?

তাহলে পকেটে রাখিস না। জামার ভেতরে রাখ। চিঠিটা যেন তোর বুকের সঙ্গে মিশে থাকে।

পরদেশী খুব যত্ন করে চিঠিটা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। তারপর শার্টের সব বোম লাগায়।

আমার মুক্তিসেনা বোনটা আমাকে একটা কাজ দিয়েছে। আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আমি গেলাম। আয় যাদব। তুইও আমার সঙ্গে যাবি।

রাবেয়া বাধা দেয়। দুহাত বাড়িয়ে বলে, না, দুজন একসঙ্গে যাবে না। বিপদ হলে একজনেরই হবে। যাদবকে থাকতে হবে আর একজন শহীদ মেয়ের জন্য।

হ্যাঁ, ঠিক। আমি একাই যাই।

পরদেশী চলে যায়। যাদবও অন্যদিকে যায়। রাবেয়া একা দাঁড়িয়ে থাকে। দুহাতে চোখের জল মোছে।

পরদেশী যখন হাটখোলার বাড়িতে আসে চিঠির ঠিকানা ধরে, তখন শেষ বিকেল। পশ্চিম আকাশটা অদ্ভুত লাল রং ধরে আছে। অথচ এক ম্লান আলোয় ভরে আছে শহর। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার রাস্তায় চোখ রেখে, পরদেশীর এমনই মনে হয়। মনে হয়, শহর খুব বিষণ্ন হয়ে আছে। ও বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টুকটুক শব্দ করে। গেটের কাছে আলতাফ ছিল। কাছে এগিয়ে আসে। গেটের অল্প ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা যে কে এসেছে, কিন্তু পরদেশীর পুরো শরীর দেখা যায় না। মুখ তো নয়ই। কারণ ও ঘাড়টা রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। লোকজনের চলাচল খেয়াল করছে। বাড়ির ভেতরে আকমল হোসেন সামনের ছোট পরিসরে পায়চারি করছিলেন। কখনো আকাশ দেখেন, কখনো কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকেন-কী শুনতে চান তিনি নিজেও তা বুঝতে পারেন না। বোমার শব্দ, আর্মি কনভয়ের চলাচল, আয়শার গুনগুন ধ্বনি, কিংবা উচ্চস্বরে কান্নার শব্দ—বুঝতে পারেন সবকিছু একসঙ্গে চলছে বলে তিনি কোনো কিছু আলাদা করার কথা ভাবেন না। কিন্তু তার পরও তার মনে হয়, কারও পায়ের শব্দ এ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কোনো বার্তা নিয়ে এসেছে কি? মারুফ কেমন আছে? ও এখন কোথায়, তা তার জানা নেই। তিনি নিজের সঙ্গে নিজের চিন্তা যোগ করতে পারেন না। মনে হয়, চিন্তার পরিসর বেড়ে যাচ্ছে, তারও বড় জমিন। তৈরি হয়েছে তার জন্য। এখন তার অপেক্ষার সময়। তিনি আকাশের দিকে তাকান—অদ্ভুত রংটা আরও বেশ অনেকখানি ব্যাপ্তি নিয়ে ছড়িয়েছে।

পরদেশী আবার গেটে শব্দ করে। এবার বেশ জোরে। বোঝাতে চায় যে ও এই বাড়িতেই এসেছে। ও ঠিকানা ভুল করেনি বলেই নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। পরদেশীকে গেটের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে আলতাফ দুপা এগিয়ে বলে, কাকে চান?

এ বাড়ির কাউকে। এটা তো জনাব আকমল হোসেনের বাড়ি?

হ্যাঁ, তার বাড়ি। কোথা থেকে এসেছেন?

রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে।

ফিসফিস করে বলে পরদেশী। চারদিকে তাকায়। আলতাফ বুঝে যায় যে ও কোনো খবর নিয়ে এসেছে।

পরদেশী অস্থির হয়ে ওঠে। যেন ধৈর্য ধরার সময় নয় এখন। যা কিছু করার তা করতে হবে বিদ্যুৎ-গতিতে। বুকের ভেতর উত্তেজনা থরথর করে কাঁপে পরদেশীর।

কে আছেন বাড়িতে? তাঁকে ডাকেন।

আপনি ভেতরে আসেন। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হবে না।

আলতাফ গেট খুলে দেয়। ও বুঝতে পারে যে লোকটি হয়তো গেরিলাদের খবর নিয়ে এসেছে। ওকে দেখে আকমল হোসেন এগিয়ে আসেন। পরদেশী কাঁপা গলায় তাকে বলে, আমি একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।

চিঠি? কার চিঠি?

একজন শহীদের।

শহীদ? মারুফের বন্ধু নাকি?

শুনেছি বন্ধু। মারুফ কই?

ও তো যুদ্ধে গেছে। গেরিলা হয়েছে।

যখন বাড়িতে আসবে, তাকে এই চিঠিটা দেবেন।

ও চারদিকে তাকিয়ে জামার বোম খুলে চিঠি বের করে আকমল হোসেনের হাতে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি জল খাব। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

আকমল হোসেন চিঠিটা নিয়ে বলেন, আলতাফ, পানি। তুমি আমার সঙ্গে এসো। বসো।

আলতাফ পানি আনতে যায়। রান্নাঘরে গিয়ে জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে গেলে গ্লাস উপচে পানি পড়ে মেঝেতে। মন্টুর মা রাগতস্বরে বলে, কী হয়েছে? হাত কাঁপে কেন?

আলতাফ উত্তর দেয় না।

আকমল হোসেন পরদেশীর হাত ধরেন। বারান্দায় যে চেয়ার ছিল, সেটা টেনে বসতে দেন। বুঝতে পারেন, ওর ভেতরে একধরনের অস্থিরতা কিংবা প্রবল আবেগ কাজ করছে। ও খুব স্বাভাবিক নয়। তিনি খুব শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ?

রাজারবাগ পুলিশ লাইন। ওখানে সুইপারের কাজ করি।

বুঝেছি। আকমল হোসেন মাথা নাড়েন। হেঁটে এসেছ বোধ হয়, তোমাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, হেঁটেই এসেছি। তবে টায়ার্ড না। আমি অনেক কাজ করতে পারি। আমি যুদ্ধ করতেও পারব।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আয়শা খাতুন আর মেরিনা। আকমল হোসেন চিঠিটা আয়শা খাতুনের হাতে দিয়ে বলেন, ও এই চিঠিটা এনেছে। তুমি আগে পড়ে দেখো।

পরদেশী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি পরদেশী। সুইপার।

তুমি এখানে বসো। মেরিনা, ওকে হালুয়া আর চা দে।

না, মাইজি, হালুয়া খাব না। শুধু জল।

তা হবে না। যুদ্ধের সময় এখন। সব যোদ্ধাকে একটু কিছু খেতে হবে এই বাড়িতে। এটা হলো যোদ্ধাদের জন্য দুর্গবাড়ি।

ও ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বলে, বহুত আচ্ছা, মাইজি, বহুত আচ্ছা। আমি চেয়ারে বসব না। এখানে বসি।

পরদেশী সিঁড়ির ওপর পা গুটিয়ে বসে। সুজির হালুয়া খায়। প্রাণভরে কয়েক গ্লাস জল খায়। বুঝতে পারে না এই বাড়িতে বসে আজ ওর এত তেষ্টা পাচ্ছে কেন? কোথাও কিছু কি ভেঙেচুরে পড়ে যাচ্ছে? পরদেশী যাওয়ার জন্য দাঁড়ালে আকমল হোসেন বলেন, পুলিশ লাইন তো আমাদের আরেকটা যুদ্ধক্ষেত্র, না?

হ্যাঁ, স্যার। ওখানে এই শহরের অনেক মেয়ে যুদ্ধ করছে।

বুঝেছি। আমার ছেলে এলে বলব তোমাকে মেলাঘরে নিয়ে যেতে। তোমার বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিয়ে রেখো।

না, স্যার, আমি অন্য কোথাও যাব না। আমি আমাদের মেয়েদের বাঁচাতেই যুদ্ধ করব। আমি যাই, স্যার। আকমল হোসেন পরদেশীর সঙ্গে হেঁটে গেটের কাছে যান। ও বেরিয়ে গেলে গেট বন্ধ করে আলতাফ। তিনি আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। দিনের আলো শেষ হয়েছে। আকাশের লাল রং আর নেই। ওখানে ছাই রঙের ফ্যাকাশে

বিবর্ণ ভাব ছড়িয়ে আছে। অন্ধকার পুরো নামেনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে। তিনি দাঁড়িয়েই থাকেন। ভাবেন, পরদেশী তার চোখ খুলে দিয়েছে। যুদ্ধের সময় যে অনেক রকম যুদ্ধক্ষেত্র হয়, সেই কথা বলে গেছে ও। এর চেয়ে বড় সত্য আর কী হতে পারে? তিনি নড়তে পারেন না। পঁড়িয়েই থাকেন। মনে হয়, তার কী যেন হয়েছে। তিনি তা বুঝতে পারছেন না। পেছন ফিরে দেখেন, আয়শা খাতুন আর মেরিনা ঘরে চলে গেছে। একসময় মেরিনা চিৎকার করে ডাকে, আব্বা-আ-ব-বা—।

তিনি ধীরপায়ে ঘরে ঢোকেন। সোফায় বসেন। দেখতে পান, মা-মেয়ে কাঁদছে। কান্না থামিয়ে একসময় আয়শা খাতুন বলেন, এটি জেবুন্নেসা নামের একটি মেয়ের চিঠি। মারুফের সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। পঁচিশের রাতে আর্মি ওকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিয়ে আটক করে।

মেরিনা চোখ মুছে বলে, ভাইয়া আমাকেও জেবুন্নেসার কথা বলেনি। সম্পর্ক বোধ হয় বেশি দিনের না। তাহলে আমি জানতে পারতাম। আমি ইউনিভার্সিটিতে জেবুন্নেসাকে দেখেছি। ফিজিকস পড়ত। কার্জন হলের বারান্দায় হেঁটে যেতে দেখেছি। তবে তেমন পরিচয় ছিল না।

চিঠিটা তুমিই যত্ন করে রেখে দাও, মা। আমাদের কাছে থাকা ঠিক হবে না।

আকমল হোসেন সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। মেরিনাও উঠে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, ভাইয়া বাড়িতে এলে দেব? নাকি অনেক পরে দেব?

না, ও বাড়িতে এলেই দিয়ো। ওকে একা দিয়ো আগে। আমাদের সামনে দিয়ো না। ও যদি আমাদের কিছু বলে তা আমরা শুনব।

তিনি কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে আসেন। আয়শা খাতুনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, মেয়েটি আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম শহীদ। কয়েকজনকে ডেকে ঘরোয়া মিলাদের আয়োজন করো। আর ফকির খাওয়াও। ওর কুলখানি হবে এই বাড়িতে।

আয়শা খাতুন চুপচাপ বসে থাকেন। আকমল হোসেনের কথায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানান। মেরিনা চলে গেছে নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে কপালে হাত দিয়ে রাখে। আকমল হোসেন পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসে থাকেন। বুক ভীষণ ভার হয়ে আছে। এই প্রথম একটি ঘটনা তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলে। ভাবেন, কত দিন লাগবে এই সামলে উঠতে!

তখন গুনগুন ধ্বনি ছড়াতে থাকে ঘরে। আয়শা খাতুন সোফায় মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। ঘরে বাতি নেই। অন্ধকার গুমরে ওঠে সুরের ছায়ায় :

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো॥...

মেরিনা শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের ছাদ দেখে। ইলেকট্রিক বাতির চারপাশে পোকা জমেছে। কোথা থেকে এল এরা? দুচোখ ববাজে মেরিনা। ভালো লাগে না। আবার উঠে দাঁড়ায়। ভাবে, বাতি বন্ধ করলে পোকাগুলো বেরিয়ে যাবে। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত পাল্টায় ও। বাতি বন্ধ করলে পোকাগুলো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে ওগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। মেরিনা টেবিলের ড্রয়ারে যত্ন করে রাখা জেবুন্নেসার চিঠিটা আবার বের করে। টেবিলের ওপর মেলে রেখে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়। তাকিয়ে থাকে পেনসিলে লেখা অক্ষরগুলোর দিকে। এটা জেবুন্নেসার হাতের লেখা নয়। পরদেশী বলেছে, জেবুন্নেসা বলেছে আর একজন মেয়ে লিখে দিয়েছে। হঠাৎ মেরিনার মনে হয়, পেনসিলের লেখা যদি ঝাপসা হয়ে যায়, তাহলে মারুফ কীভাবে পড়বে? তখন ও কাগজ-কলম বের করে কালো কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে পুরো লেখাটা লিখে ফেলে। ভাবে, মারুফ ইচ্ছা করলে এই চিঠিটা অনেক দিন সংগ্রহে রাখতে পারবে। হায় ভাইয়া,

তোমার প্রথম প্রেম। দেশ স্বাধীন হলে যদি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক জাদুঘর হয়, তখন জেবুন্নেসার ছবি আর এই চিঠিটা সেখানে রাখা যাবে। দেশের ইতিহাসে যুক্ত হবে জেবুন্নেসার নাম। মেরিনা চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না। দুহাতে চোখের পানি মোছে আর ফোঁপায়।

আয়শা খাতুন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। অন্ধকারে পা ফেলেন। জানালার পর্দার ফাঁকে রাস্তার বাতির আলো আসছে। তিনি ক্ষুদ্র একটি আলোর বৃত্তের পাশে দাঁড়ান—সুরের ধারা আলোকিত করে ঘর :

পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু–
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত॥
আলসেতে বসে ছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।
ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে—
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হৃদয়ক্ষত।।

আকমল হোসেন কান খাড়া করে গুনগুন ধ্বনি শুনছেন। একসময় দুহাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। এমন বুক উজাড় করা কান্না আরও একবার কেঁদেছিলেন মায়ের মৃত্যুতে। বাবার মৃত্যুতেও এমন করে কাঁদেননি। ছেলেটির প্রথম প্রেম ভেবে এমন কান্না তাঁকে ভাসিয়ে দেয়।

তখন আয়শা খাতুন নিজের ঘরে আসেন—সুর থামে নাস্তিমিত হয়–হাহাকারের ধ্বনি তোলে ঘরের ভেতর—দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হৃদয়ক্ষত॥–দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো—আয়শা খাতুন কাঁদতে থাকেন। বুঝতে পারেন, এই মুহূর্তে কান্না ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারছেন না।

তাঁর কান্নার ধ্বনি ছড়ালে দরজায় এসে দাঁড়ান আকমল হোসেন। তাঁর পেছনে মেরিনা।

বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে

শুক্রবার।

আকমল হোসেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনো জুমার নামাজ শুরু হয়নি। মুসল্লিরা ঢুকছেন। মাথায় টুপি দেওয়া লোকজনে ভরে আছে প্রাঙ্গণ। যারা আশপাশে আছে, তাদের মাথায়ও টুপি। আকমল হোসেন নিজেও মাথায় টুপি দিয়েছেন। মিনিট দশেক আগে এসেছেন। তিনি জানেন, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। তাহলে আশপাশের লোকজন মনে করবে তিনি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই তিনি ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে এদিক-ওদিক যাচ্ছেন। কোনো দোকানে ঢুকছেন কিংবা ফুটপাতের দোকানদারদের সঙ্গে কোনো কিছু দরদাম করছেন। টুকটাক কিছু কিনছেনও। মাঝেমধ্যে চারদিকে তাকান। দেখতে পান, তাঁর গাড়ির কাছে আলতাফ দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছে। তিনি টুপিটা খুলে পকেটে ঢোকান। ভাবেন, টুপি মাথায় দিয়ে ঘোরাঘুরি করা ঠিক নয়। লোকে অন্য রকম ভাবতে পারে।

গত রাতে মেরিনার কাছে চিরকুট এসেছে মারুফের। ও লিখেছে : দুটি অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে আবার শহরে ঢুকব। বাসায় যাব কি না ঠিক নেই। বেশি যাতায়াত করলে বাড়ি চিহ্নিত হয়ে যাবে। তাই এমন কৌশল। বাবা যেন শুক্রবার জুমার নামাজের আগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে থাকেন। ওখানে বাবার সঙ্গে দেখা হবে এবং একই সঙ্গে গুলিস্তান এলাকা রেকি করা হবে। তুই কেমন আছিস, মেরিনা? এখন আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, মনে রাখিস।

কিন্তু আধা ঘণ্টা হয়ে গেলেও মারুফের দেখা মিলছে না। কোথায় গেল ছেলেটি? আটকালই বা কোথায়? নাকি এখানে আসার সময় বদলেছে? আকমল হোসেন চিন্তায় পড়েন। দুদিন পর ওরা পরপর দুটি অপারেশন করবে। গুলিস্তানের গ্যানিজ ও ভোগ—অবাঙালিদের দোকান। গেরিলারা এ দোকানে অপারেশন চালাবে। এতক্ষণ অপেক্ষা করে আকমল হোসেনের অস্থির লাগছে। তিনি নিজেই গ্যানিজ দোকানটির চারপাশ রেকি করবেন ঠিক করেন। তার নজরে কিছু পড়লে তিনি তা মারুফকে জানাতে পারেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে আকমল হোসেন রাস্তা পার হয়ে দোকানের সামনে আসেন। তারপর ভেতরে ঢোকেন। বড় দোকান। ঘরভর্তি মালপত্র। বেশির ভাগ দ্রব্যই

পোশাকসামগ্রী। তিনি অনেকবার এ দোকানে এসেছেন। প্রয়োজনীয় কাপড় কিনেছেন। আজ দোকানের ভেতরে ঢুকে চারদিক খেয়াল করেন। নিরাপত্তাকর্মীদের অবস্থান লক্ষ করেন। একসময় ফিরে আসেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে। মারুফের পাত্তা নেই। কী হলো ছেলেটির? নিশ্চয় পরিকল্পনায় কোনো রদবদল হয়েছে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। ভাবছেন, ফিরে যাবেন। আবার ভাবলেন, আর কিছুক্ষণ থাকবেন। ছেলেটা কোথাও হয়তো আটকে গিয়েছে। কাজ শেষ হলে ছুটতে ছুটতে আসতেও পারে। সেই চিন্তায় ফলের দোকানে দাঁড়ালেন। আয়শা খাতুন। পেয়ারা ভালোবাসেন। মেরিনা আমড়া-কামরাঙা খোঁজে। তিনি নিজে জাম্বুরা খেতে ভালোবাসেন। তিনজনের তিন ধরনের ফল পছন্দ। এ জন্য বাড়িতে সব রকম ফলই থাকে। এত কিছুর পরও কমলা-আপেল কিনলেন। ভাবলেন, যোদ্ধা ছেলেদের যদি কেউ আসে তাদের জন্য এসব ফল দরকার হতে পারে। আলতাফকে ডেকে সেগুলো গাড়িতে পাঠালেন।

যাওয়ার আগে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, যাবেন না, স্যার? আর কতক্ষণ থাকবেন?

আর কিছুক্ষণ পর যাব। ছেলেটা যদি আমাকে এসে না পায়, তাহলে মন খারাপ করবে।

এখনই হয়তো নামাজ শেষ হবে।

সমস্যা কী? মুসল্লিরা যে যার পথে চলে যাবেন।

ভিড় হবে, স্যার। আর সময় তো ভালো না। আমরা তো শত্রুপক্ষ।

ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি আসছি।

তিনি ফলের টাকা দিতে দিতে চারদিকে তাকান। কোথাও মারুফ নেই। তার মন খারাপ হয়। শুধু মানসিক নয়, শারীরিকভাবেও বিষণ্ন বোধ করেন। পরক্ষণে সচেতন হয়ে ওঠেন। এবং নিজেকে ধমকান, এভাবে ভাবা ঠিক নয়। এটা যুদ্ধের সময়।

তখন মসজিদ থেকে স্রোতের মতো মানুষ বের হয়। তিনি একমুহূর্ত দাঁড়ান। দেখতে পান, সবার আগে বেরিয়ে আসছেন খাজা খয়েরউদ্দিন। এপ্রিল মাসে গঠিত হয়েছে শান্তি কমিটি। এই কমিটি শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখবে। শহরের পরিস্থিতি আগের অবস্থায় নিয়ে আসবে। তাদের অনেক কাজ। আকমল হোসেন মৃদু হাসলেন। আর দুদিন পর শহরবাসী বুঝবে, স্বাভাবিক অবস্থা কী! তা ফিরিয়ে আনার সুযোগ ওদের জীবনে আর আসবে না। খাজা খয়েরউদ্দিন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক। আকমল হোসেন দেখলেন, খয়েরউদ্দিন উত্তেজিত স্বরে কথা বলছেন। তাঁর অনুসারীদের কিছু বোঝাচ্ছেন। আকমল হোসেন স্মৃতি হাতড়ে দেখলেন, যেদিন শান্তি কমিটি গঠিত হয়, সেদিন টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি খুঁটিয়ে কাগজ পড়ে এসব বিষয় একটি পুরোনো ডায়েরিতে লিখে রাখেন, যেন ভুলে না যান সে জন্য। আজও দেখতে পেলেন মিছিলের তোড়জোড় চলছে।

একটু পর খয়েরউদ্দিনের নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। শুনতে পান বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত মিছিল যাবে। তিনি পেছনে সরে আসেন। একজন হুড়মুড়িয়ে নামতে নামতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, থু, বাঙালি গাদ্দার।

তিনি শুনে অন্যদিকে তাকান। কোনো ভাবান্তর প্রকাশ করেন না। তিনি আরও দুপা পিছিয়ে আসেন। পরে আরও অনেকখানি। ততক্ষণে মিছিল গুলিস্তানের রাস্তায় উঠেছে। নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে চারদিক। ওদের হাতে ব্যানার-পোস্টার। নানা স্লোগানে ওরা একটি বিদ্বেষপূর্ণ বার্তায় চারদিক তোলপাড় করছে।

আকমল হোসেন মনে করলেন, শান্তি কমিটির প্রথম সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—এই সভা মনে করে যে, হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেশপ্রেমিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করছে। শেষ সিদ্ধান্তটি ছিল—এ সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।

দেশপ্রেমিক জনগণের মিছিল যাচ্ছে। চারদিকে পাকিস্তান রক্ষায় জীবনদানকারী হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেশপ্রেমিকেরা। ভালোই তো, দেখা যাবে ওরা কতটা খাঁটি। আকমল হোসেন চোখের ওপর ডান হাত রেখে রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মিছিলের শেষ মানুষটিকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। তিনি ফেরার কথা ভাবলেন। পেছনে ফিরলে দেখতে পান, একজন ফেরিওয়ালা তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ফিরতেই লোকটি বলে, স্যার, ওরা আপনাকে গাদ্দার বলেছে। আপনি কিছু বললেন না কেন, স্যার?

ও তো ঠিকই বলেছে। ওর চিন্তায় আমি তো তা-ই। তিনি নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেন। মৃদু হাসেন।

গাদ্দার মানে কী, স্যার?

বিশ্বাসঘাতক।

লোকটি চমকে উঠে বলে, বিশ্বাসঘাতক! কী বলে ওরা? বিশ্বাসঘাতক! আপনি কি বিশ্বাসঘাতক, স্যার?

হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক তো বটেই।

কেন, স্যার? কেন?

কারণ আমি বাঙালি, সে জন্য। আমরা ওদের মুখোশ খুলে দিতে চাই। বলে।

নেমে যায় লোকটির কণ্ঠস্বর। বলে, ও, এই। আমিও তো বাঙালি। আমার বাড়ি বলেশ্বর নদীর ধারে। গ্রামের নাম মাছুয়া। মহকুমা পিরোজপুর। জেলা বরিশাল।

বাহ, তুমি তো একদম খাঁটি বাঙালি। ব্র্যাভো।

কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতক না। আমি বিশ্বাসঘাতক হব কেন? এটা আমার জন্মভূমি।

ওরা তো আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলবেই।

কেন, স্যার? আমরা কী করেছি?

আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন দেশ চাই। ওরা যা বলে বলুক। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা যুদ্ধ করছি।

সে জন্য বিশ্বাসঘাতক শুনে আপনার খারাপ লাগেনি।

হ্যাঁ, তাই। তুমি যে ব্যাপারটা বুঝেছ সে জন্য আমার ভালো লাগছে।

আমি তো ভেবেছিলাম আপনি লোকটিকে ঘুষি মারলেন না কেন? কুত্তার বাচ্চা বলে কী!

আস্তে কথা বলো।

তোমার নাম কী, ভাই?

মোতালেব।

কোথায় থাকো?

নারিন্দায়।

এখানে রোজ বসো?

বসি।

ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

লোকটি আকমল হোসেনের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি পর্যন্ত আসে। আকমল হোসেন গাড়িতে উঠে বসলে মোতালেব ফিসফিস করে বলে, স্যার, আগামী সপ্তাহ থেকে আপনি আর আমাকে এখানে পাবেন না। আমি দেশে চলে যাব। ওখান থেকে যুদ্ধ করতে যাব। ওরা আপনাকে গাদ্দার বলেছে—আমার গায়ে আগুন ধরে গেছে। কারণ, আপনি গাদ্দার হলে আমিও গাদ্দার। আপনি আমাকে দোয়া করবেন।

আকমল হোসেন ওর মাথায় হাত রাখেন। বলেন, বিজয়ীর বেশে ফিরবে দেশে—এই দোয়া করি।

দেশ স্বাধীন হলে আপনি আমাকে এখানে খুঁজতে আসবেন তো, স্যার?

আসব। অবশ্যই আসব। তোমার জন্য আমি ফুল নিয়ে আসব। বিজয়ীকে ফুলের মালা দেব।

মোতালেব হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর নিজেই গাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়। আকমল হোসেন গাড়িতে স্টার্ট দেন। বুকের ভেতর শান্তি কমিটি কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। প্রথম বৈঠকের পর যেদিন ওরা শহরের পথে মিছিল করেছিল, সেদিনও তিনি দূরে দাঁড়িয়ে ওদের মিছিল দেখেছেন। সেদিনও মিছিল বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে চকবাজার মসজিদ হয়ে নিউ মার্কেটের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়েছিল। মিছিলে বিহারিদের সঙ্গে বাঙালি দালালেরাও ছিল। মিছিলে ব্যান্ড পার্টি ব্যবহার করা হয়েছিল। যেন উৎসব, এমন ভাব। পাকিস্তানের পতাকাসহ ব্যানার-ফেস্টুন বহন করেছিল মিছিলকারীরা। ইয়াহিয়া, আইয়ুব, জিন্নাহ, ফাতেমা জিন্নাহ, এমনকি আল্লামা ইকবালের ছবিসহ প্ল্যাকার্ড ছিল ওদের হাতে। সেদিন বৃষ্টি ছিল। তার পরও মিছিলকারীরা কোথাও থামেনি। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে শেষ করেছিল নির্ধারিত স্থানে গিয়ে। সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন। মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন গোলাম আযম। গাড়ি নিয়ে এসব দেখার জন্য সেদিন তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছিলেন।

কয়েক দিন পর পত্রিকায় পড়েছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিনের প্রচারিত প্রেস রিলিজ। সেখানে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা সারা প্রদেশে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় এখন পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হত্যা করছে। যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেনাবাহিনী দেশকে খণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে। তাদের সাফল্যের জন্য কমিটি আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করছে।

আকমল হোসেন এ স্মৃতি মনে করে হা-হা করে হাসেন। রাস্তায় গাড়ি তখন লাল বাতির সামনে থেমে গেছে।

আকমল হোসেনের হাসি শুনে আলতাফ পেছন থেকে ডাকে, স্যার।

ওদের প্রেস রিলিজের কথা মনে করে হাসছি। ওরা নিজেরা যে নিজেদের ফাঁদে পা ঢুকিয়েছে, তা ওরা বুঝতে পারে না। ওরা মনে করছে, ওরা সাফল্যের মধ্যে আছে।

আমিও এটা মনে করি, স্যার। ওদের আনন্দের ডুগডুগি শুনলে আমার হাসি পায়।

ভেবে দেখো, ওরা কী বলছে? বলছে রাষ্ট্রবিরোধীরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করছে। মানে গেরিলারা অপারেশন চালাচ্ছে—এর অর্থ তো তা-ই দাঁড়ায়।

ঠিক, স্যার।

রেড লাইট সিগন্যাল শেষ হয়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি বলেন, ওরা বলছে, সেনাবাহিনী দেশকে খণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করছে। স্বাধীনতাযুদ্ধকে স্বীকার করার বাকি থাকল কী? বিদেশের মানুষেরা এত বোকা না যে এর মর্ম বোঝে না।

আবার তিনি হো-হো করে হাসেন। আলতাফের মনে হয় স্যারের মনে আজ খুব ফুর্তি। সামনে আরেকটি গেরিলা অপারেশন হবে—এ আনন্দে তিনি আছেন। গাড়ির দরজা

খোলার আগে তিনি বলেন, আলতাফ, আমাদের বাড়িতে রাখা অস্ত্রগুলো আজ চেক করতে হবে। তুমি অন্য কোথাও যেয়ো না।

না স্যার, কোথাও যাব না। এখন তো আপনাকে না বলে কোথাও যাই না। আমার সময়টাও এখন যুদ্ধ, স্যার। রাত-দিন মনে করি দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমার যা সাধ্য ততটুকু, সাধ্যের বাইরে যদি কিছু করতে হয়, তা-ও করব।

থ্যাংকু, আলতাফ। তোমার কাজ করার ইচ্ছা আমাদের শক্তি। আমরা কখনো পেছাব না।

আলতাফ গাড়ি থেকে নেমে দরজা খোলে। গাড়ি ঢুকে যায় ভেতরে। গ্যারেজে ঢোকে। এ গ্যারেজের মেঝে খুঁড়ে গেরিলাদের গোলাবারুদ রাখা হয়েছে একটি টিনের বাক্সে। রান্নাঘরের ফলস ছাদে আছে। স্টোররুমে আছে। ছাদের ওপরে পানির ট্যাংকে আছে। এসব কিছুর নজরদারি করেন আকমল হোসেন। কখন, কীভাবে, কোথায়, কাকে, কী দিতে হবে তার সবকিছু তিনি নিজে দেখাশোনা করেন। কোথায় কী আছে তা তার নখদর্পণে। আয়শা খাতুন স্বামীর এই ক্ষিপ্র কাজে কখনো খুব বিস্মিত হন। সঙ্গে থাকে বাড়ির অন্যরা। গাড়ি থেকে নেমেই দেখলেন, আয়শা খাতুন আর মেরিনা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আয়শা খাতুন উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, মারুফের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

হয়নি। ছেলেটি তো এল না! বেশ অনেকক্ষণই তো অপেক্ষা করলাম।

হয়তো কোথাও আটকা পড়েছে। হবে হয়তো।

নয়তো ওদের রেকি করার কৌশলে কোনো চেঞ্জ হয়েছে।

সবাই মিলে ঘরে ঢোকেন।

আব্বা, আপনি কিছু খাবেন? শরবত দেব?

এখন কিছু লাগবে না। গোসল করে নিই, একবারে ভাত খাব। তুই ঠিক আছিস তো, মা?

কেন, আব্বা? আমি তো সুস্থ আছি। আপনি কেন ভাবলেন আমার কিছু হয়েছে?

ভুলে যেতে পারি না যে এটা যুদ্ধের সময়। যেকোনো সময় যা কিছু হতে পারে, কে জানে, মা। তুমি টেবিলে খাবার রেডি করো, আমি আসছি।

আকমল হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে আয়শা খাতুনও শোবার ঘরে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, বায়তুল মোকাররমে কী দেখলে? শহরের পরিস্থিতি কী?

পাকিস্তানের পতাকা হাতে শান্তি কমিটির মিছিল দেখেছি এবং পাশাপাশি একজন মানুষ পেয়েছি, যে আমাকে বলেছে, সে যুদ্ধে যাবে। বলেশ্বর নদীর ধারের লোক। বুঝতে পারছি, ওর যুদ্ধক্ষেত্র ৯ নম্বর সেক্টর হবে।

আয়শা খাতুন মৃদু হেসে বলেন, তোমার আজকের দেখা দারুণ। পাকিস্তানের পতাকা হাতে স্বাধীনতাবিরোধীদের মিছিল এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা।

হ্যাঁ, আয়শা। ঠিক বলেছ। দুটিই যুদ্ধের সময়ের চিত্র। দুটিই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, একদিন দেশ স্বাধীন হবে এবং একদিন স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার হবে। অপরাধের দণ্ড ওদের পেতেই হবে।

ঠিক, ঠিক বলেছ। এমন কথা শুনলে আমার মনে হয়, আমার আয়ু বেড়ে যাচ্ছে।

আয়শা খাতুন আবেগে আকমল হোসেনের দুহাত জড়িয়ে ধরলে তিনি বলেন, শুধু হাত কেন? এসো। তিনি আয়শা খাতুনকে জড়িয়ে ধরে তার মাথার ওপর নিজের থুতনি

রেখে বলেন, আমরা যুদ্ধের সময়ের সাক্ষী। এ সময়ের দলিলগুলো আমাদের গুছিয়ে রাখতে হবে।

আয়শা খাতুন অনুভব করেন, যুদ্ধের সময়ও এ মানুষটির বুক প্রবল ওমে ভরা। এ মানুষটি জেবুন্নেসার জন্য কেঁদেছেন। বলেছেন, ওকে শহীদের মর্যাদায় স্মরণ করবে। ওর মৃত্যুর তারিখ ডায়েরির পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছেন। বলেছেন, আয়শা, আমরা যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন ওর মৃত্যুদিনে একটি মোমবাতি জ্বালাব। আর পথের পাঁচটি বাচ্চাকে ডেকে এনে খাওয়াব। ওদের জেবুন্নেসার কথা বলব। পারবে না, আয়শা?

আয়শা নিজেও কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলেছেন, পারব না কেন, আমাদের পারতেই হবে। আমরা না পারলে মুছে যেতে থাকবে জেবুন্নেসাদের ইতিহাস।

সেদিনও প্রবল আবেগে আকমল হোসেন আয়শা খাতুনকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আজও দুজনের ওমভরা শরীর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাখে। পুরো ঘরে এখন ওমভরা সময়। যুদ্ধের সময়। যে যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য। দুজনে অনেকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভাবেন, তাঁদের বিবাহিত জীবনের সাতাশ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু এমন ওমে ভরা সময় আসেনি। এই অন্য রকম সময় দুজনকে নিবিড় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়।

খাবার টেবিলে মেরিনা বলে, আব্বা, ফয়সল ফোন করেছিল।

কী বলেছে? কোনো পরিকল্পনা?

বলেছে, ওরা গেরিলা নামে একটি পত্রিকা বের করবে। আপনাকে লিখতে হবে। বলেছে, ওরা ইংরেজিতে বের করবে। বেশির ভাগই যুদ্ধের খবরাখবর থাকবে। ঢাকায় বসবাসকারী বাঙালিরা যেন সব ধরনের খবর পায়, সে চেষ্টা করবে। আর যুদ্ধের খবর বেশি থাকবে। লিখবেন তো, আব্বা?

বলিস কী, মা! লিখতে তো হবেই। না লিখলে নিজের সঙ্গে নিজেরই বেইমানি করা হবে।

বুঝেছি। এই সময় আপনার কাছে সব কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি এমন বাবা পেয়ে গর্বিত।

আয়শা খাতুন মৃদু হেসে বলেন, আর মা?

মা-ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাগো, আপনার গানের ধ্বনি তো একটা রণক্ষেত্র।

এমন আলোচনায় খাবার টেবিল অন্য রকম হয়ে যায়। মন্টুর মা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কী কথা হচ্ছে, সেটা বুঝতে চায়। বোঝেও। একইসঙ্গে নিজেকে বলে, মেরিনা মন্টুর মায়ের জন্য গর্ব হয় না? মন্টুর মা-ও তো গর্বের মানুষ হতে চায়।

মায়ের সঙ্গে কথা বলে আকস্মিকভাবে মন্টুর মায়ের দিকে তাকায় মেরিনা। চোখ বড় করে বলে, আপনি আমার কাছে আসেন। চেয়ারের কাছে। আমি আপনার হাত ধরব। মন্টুর মা এগিয়ে এলে মেরিনা বলে, আপনার জন্যও আমার গর্ব হয়, খালা। আপনি যুদ্ধকে নিজের করে নিয়েছেন।

মন্টুর মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, যাই।

মেরিনা মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, আব্বা, ফয়সল আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসতে চেয়েছে।

ফোন করে দে। পারলে আজ বিকেলে আসুক।

আচ্ছা, বাবা। মেরিনা খুশি হয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। বলে, বাবা, আমি ঠিক করেছি ওদের সঙ্গে কাজ করব। ওরা আমাকে বাড়ি বাড়ি পত্রিকা বিলি করার দায়িত্ব দিয়েছে। পত্রিকার কপি ঢাকার সব বিদেশি অফিসে পাঠানো হবে।

গুড। এটা খুব দরকার। বিশ্বের সবাইকে অনবরত জানাতে হবে—আমরা আছি। আমরা বসে নেই।

তুমি ডালের স্যুপটা খাও। আজ তুমি তোমার প্রিয় স্যুপ খেতে ভুলে গেছ।

আয়শা খাতুন মৃদু হেসে বলেন, আজ আমি বের হব। অনেক দিন বের হইনি।

কোথায় যাবে? কারও সঙ্গে কথা হয়েছে?

ঢাকা শহরের দুর্গবাড়ি তো শুধু আমরা নই, আরও আছে না। শায়লা আপা ফোন করেছিলেন। এলিফ্যান্ট রোডে যেতে হবে। বলেছেন, জরুরি কথা আছে।

বুঝেছি। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব?

না, আমি রিকশায় যাব। একটু পরেই ফিরে আসব। তুমি তো বাড়িতেই আছ?

হ্যাঁ, আমি আর বের হব না। চলো, উঠি।

তখনই টেলিফোন বাজে। ছুটে যায় মেরিনা।

হ্যালো, ও ভাইয়া। তুমি তো এলে না। বাবা তোমার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরা বায়তুল মোকাররমের সামনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আব্বা-আম্মা কই?

দুজনেই ততক্ষণে টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফোন ধরেন আকমল হোসেন।

হ্যালো, বাবা।

আব্বা, আমরা সকালে বায়তুল মোকাররম যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করেছি। জুমার নামাজের পর শান্তি কমিটির মিছিল হবে সে জন্য। আমরা রিস্ক নিতে চাইনি। অন্য সময় রেকি করা হয়েছে।

ঠিক করেছ। তবে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমার ওদের কর্মসূচি দেখার সুযোগ হয়েছে। তুমি মন খারাপ কোরো না। সকালে যা দেখেছি, তার সবকিছু ডায়েরিতে লিখছি। একজন ফেরিওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়েছে, যে যুদ্ধে যাবে বলেছে।

আব্বা, গ্যানিজ ও ভোগ অপারেশনের সব প্রস্তুতি আমাদের শেষ হয়েছে।

দোয়া করি। তোমাদের জন্য দোয়া করি।

আম্মাকে আমার সালাম দেবেন।

ফোন রেখে দেয় মারুফ। মেরিনা নিজের ঘরে যায়। আয়শা খাতুন রান্নাঘর তদারকিতে ঢোকেন। আকমল হোসেন ভাবেন, তিনি নিজেও দু-এক দিনের মধ্যে ধানমন্ডি যাবেন। ওখানকার দুর্গবাড়িটিও গেরিলা অপারেশনের নানা দিক দেখাশোনা করে। ওই বাড়ির সাতটি ঘরের পাঁচটিতেই ঢালাও বিছানা পাতা আছে গেরিলাদের জন্য। ওই বাড়ির দুই ছেলে যুদ্ধে গেছে। তাদের বড় ছেলে পঁচিশের রাতের পরে তার কলেজের শিক্ষককে পরিবারসহ নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, মা, আমার শিক্ষক হিন্দু। তাদের চার মেয়ে। তাদের এ বাড়িতে থাকতে দাও। নিজের ইচ্ছায় কোথাও না যেতে পারলে তাদের তুমি যেতে বলবে না। আমি জানি, বাবা-মাসহ চার মেয়েকে রাখার সামর্থ্য তোমার আছে, মা। সেই থেকে প্রদীপ সাহার পরিবার ওই বাড়িতে আছে। ছেলেটি সেই যে গেল আর আসেনি। ওর বাবা-মা খবর পেয়েছে যে, ছেলেটি ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া বাড়িগুলো পরস্পর যুক্ত। একে অপরের খোঁজখবর রাখে। একটু পরে আয়শা খাতুন বেরিয়ে যান।

আকমল হোসেন নিজ ঘরে এসে টেবিলে বসেন। আজকের অভিজ্ঞতার বিবরণ ডায়েরিতে লেখেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার দুর্গবাড়িগুলোর ঠিকানা তিনি ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। পুরো তালিকা নিয়ে তিনি একটি বড় কাগজে ম্যাপ বানিয়েছেন। রাস্তাসহ বাড়ির স্থান চিহ্নিত করে লাল কালি দিয়ে গোল গোল দাগ করেছেন। সে জন্য একটি বাড়ির অবস্থান তিনি অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন জায়গার ম্যাপ আঁকা তিনি খুব পছন্দ করেন। এ ম্যাপ গেরিলাদের

কাজেও লাগে। ওদের অপারেশনের আগে তিনিও রেকি করেন। আয়শা খাতুন যে বাড়িতে গেছেন, সেটি একটি সরকারি বাসভবন। আমিরুজ্জামান সরকারি চাকুরে। তার ভাই গেরিলা। শরীরে মুক্তিযোদ্ধার টগবগে রক্ত। দারুণ সাহসী।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে টেবিল থেকে উঠলেন। এভাবে ভাবলে তিনি পুরো ছক নিয়ে রাত পার করে দিতে পারবেন। সবটাই তার নখদর্পণে। তিনি চেনেন সবাইকে। ফার্মগেটের দিকে একটি ঘাটি করার জন্য ছেলেদের পরিকল্পনা আছে। সেটা নিয়েও তিনি ভাবছেন। ওখানে একটি বাড়ি ভাড়া করতে হবে। যত দিন যাচ্ছে, তত গেরিলা তৎপরতা বাড়ছে। দলে দলে ছেলেরা ঢুকছে ঢাকায়। সাঁড়াশির মতো আক্রমণ করবে ওরা—চারদিক থেকে আক্রমণ। ওদের মুখের দিকে তাকালে আকমল হোসেন নিজের বয়সের কথা ভুলে যান। মনে হয়, তিনি ওদের বয়সী। এমন একটি ভাবনা এ যুদ্ধের সময় তার জন্য এক গভীর আনন্দের ব্যাপার। তিনি কিছুক্ষণ রেস্ট করবেন বলে বিছানায় শুয়ে পড়েন। মুহূর্তে চোখ বুজে আসে।

পাঁচটার পরে মেরিনার ডাকে ঘুম ভাঙে তাঁর। সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। কোনো এক সাগরপাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কখনো সঙ্গে আয়শা, কখনো মারুফ, কখনো মেরিনা। কিন্তু সবাই একসঙ্গে নয়। মেরিনার উচ্ছ্বাস সবচেয়ে বেশি। বারবারই বলছিল, আব্বা, ওই দেখেন, পাখিটা কী সুন্দর! ইশ, ওই ফুলটা ছিঁড়ে আনি! সাগর আর মেঘের এমন বন্ধুত্ব আমি কোনো দিন দেখিনি। মারুফ বারবার সাগরে নেমে পা ভিজিয়ে আসছিল। বলছিল, পৃথিবীর কোন স্বর্গ এই জায়গা! আয়শা খাতুন খানিকটা চুপচাপ ছিল। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আয়শার হাত ধরে বলেছিলেন, কী হয়েছে তোমার? আয়শা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেছিল, জানি না। মেরিনার ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি বিষণ্ন বোধ করেন।

আব্বা ওঠেন। ফয়সল আর নাসিম এসেছে। আপনার গভীর ঘুম দেখে আমি অনেকক্ষণ ডাকিনি। আমার মনে হচ্ছিল, আপনি সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন।

তিনি চোখ খোলেন। মেয়েকে দেখেন। বাবার হাত ধরে নাড়িয়ে দিয়ে মৃদু হাসে মেয়ে।

তুই ওদের সঙ্গে কথা বল। আমি আসছি।

মেরিনা রান্নাঘরে ঢুকে কেটলিতে চায়ের পানি চুলোয় বসিয়ে ড্রয়িংরুমে আসে। ওরা দুজন নিচুস্বরে কথা বলছিল। মেরিনাকে ঢুকতে দেখে বিব্রত হয়ে বলে, যুদ্ধের সময় আমরা আস্তে কথা বলার অভ্যাস করেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। ঘরের ভেতরও অভ্যাস রয়ে গেছে।

কী যে বলো না, ফয়সল! এ সময় এত কিছু ভাবারও সময় নেই আমাদের। কত ধরনের কাজ নিয়ে আমরা ঘুরছি। তোমরা তো কাজ নিয়েই এসেছ। আড্ডা দিতে তো নয়। আব্বা এখনি আসবেন।

আকমল হোসেন ঘরে ঢোকেন। হাসিমুখে বলেন, কেমন আছ তোমরা?

আমরা ভালো আছি, চাচা।

তোমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে ভালো লেগেছে। গেরিলা নামটিও আমার পছন্দ হয়েছে। কীভাবে করবে পত্রিকা?

সাইক্লোস্টাইল করে ছাপব। ট্যাবলয়েড সাইজ। আমাদের বন্ধুরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। আমরা চাই, দেশে যারা আছেন, তারা যুদ্ধের খবরাখবর পাবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। আপনাকে প্রতি সংখ্যায় লিখতে হবে, চাচা।

অবশ্যই লিখব। তোমরা উদ্যোগ নিয়েছ আর আমি তার সঙ্গে থাকব না, তা কি হয়! তবে আমার মনে হয়, যারাই লিখবেন, তাঁদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা ভালো। আমি ভেবেছি, শান্তি কমিটি, সেনাবাহিনী, সরকার ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি খবরাখবর দেব। তাদের অবস্থান, তাদের প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ দেব। ঢাকা শহর যেন তোমাদের পত্রিকায় নানা দিক নিয়ে উপস্থিত থাকে।

হ্যাঁ, খুব ভালো হবে, চাচা। আমরা শহরকে সবার সামনে ছবির মতো রাখতে চাই। প্রতিটি ঘটনার বিবরণ তারা পাবেন আমাদের পত্রিকা থেকে।

ছেলেদের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আকমল হোসেন ভাবেন, এই যুদ্ধের সময়েও বেঁচে থাক এমন সাহসী অসংখ্য তরুণ। ওদের পরিকল্পনায় হাজারো স্বপ্নের ফুলকলি ফুটে উঠছে।

মেরিনা ওদের চা-পায়েস খেতে দেয়। ওদের চলে যাওয়ার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলে। যেন কথার শেষ নেই। কথার রেশ ধরে এগিয়ে আসছে কাজ, কাজের পর থাকবে ফলাফল। মারুফ যাওয়ার পরে মেয়েটি এ বাড়ির হাল ধরে রেখেছে। গেরিলাদের যোগাযোগ ওর সঙ্গেই। ও জানে বাড়ির কোন পয়েন্ট থেকে কাকে বের করে দিতে হবে, কোন পয়েন্ট থেকে ঢোকাতে হবে। নতুন আর পুরোনো শহরের মাথায় বাড়িটির অবস্থান হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সহজ যোগাযোগ ছিল এ বাড়ির সঙ্গে। ওরা বলে, পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকার যোগাযোগের সেতুবন্ধ এই বাড়ি। আমাদের খুব সুবিধা হয়। আজও মেরিনা ফয়সল আর নাসিমকে বাড়ির দ্বিতীয় এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে বের করে দিল। মোট চারটি এন্ট্রি পয়েন্ট আছে বাড়িটির। আলতাফ পুরো বাড়ির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আকমল হোসেন ভাবলেন, সময়ই সবচেয়ে বড় বন্ধু। সবাইকে এক সুতায় গেঁথে রেখেছে।

তিনি আবার শোবার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসলেন। নিজের তৈরি ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে গ্যানিজ ও ভোগ অপারেশনের রাস্তার হিসাব-নিকাশ করেন। অবাঙালিদের এই দোকান দুটো স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি যোগাযোগ ঘাটি। এখানে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চায় গেরিলারা। এই গেরিলারা ক্র্যাক প্লাটুন নামে পরিচিত। ক্র্যাক বললে বোঝা যায় তারা কারা। আর দুদিন পর ওরা শহরের রাস্তা তোলপাড় করে তুলবে। বলবে, দেখো, আমরা আছি।

সন্ধ্যার আগেই আয়শা খাতুন বাড়ি ফিরলেন। উফুল্ল হয়েই ফিরেছেন। আকমল হোসেনকে বললেন, যেখানে গিয়েছিলাম সেটা একটা দুর্গবাড়ি। ওই বাড়িতে একজন সিএসপি অফিসার থাকেন ঠিকই, কিন্তু গেরিলাদের জন্য ওটা একটা চমৎকার জায়গা।

ওরা সুযোগমতো ওখানে যায়; খাওয়াদাওয়া করে। তারপর সুযোগমতো বেরিয়ে আসে। নিশাত আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওরা এলে মনে হয় দেবদূত এসেছে। যুদ্ধের সময়ও যে এত আলো থাকে, তা ভাবতে পারতাম না যদি ওদের সঙ্গে আমার দেখা না হতো।

যাক, আমাদের শহরের মধ্যেই আমরা ভিন্ন শহর গড়েছি। এটাই আমাদের সার্থকতা, আয়শা। রাস্তায় তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

না, রিকশাওয়ালা একটানে নিয়ে এসেছে। পথে আর্মির গাড়ি দেখেছি। দেখে মেজাজ খারাপ করেছি।

এটা মন্দ বলোনি। মেজাজ খারাপ করাটাও দরকার। মেজাজ খারাপ না হলে বুঝতে হবে আমরা থিতিয়ে গেছি। যাকগে। ওরা তোমাকে নিশ্চয়ই গান গাইতে বলেছে?

আয়শা খাতুন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেন, হ্যাঁ, বলেছে। ক্র্যাক প্লাটুনের ছেলে দুটো চা খাচ্ছিল। নিশাত ওদেরকে বুটের ডালের হালুয়া বানিয়ে দিয়েছিল। ওরা খাওয়া থামিয়ে বলল, খালাম্মা, বুকের ভেতর আপনার গানের ধ্বনি নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। শুধু দুটো লাইন গুনগুন করবেন—মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম—এই গানটি। আমি করলাম।

এটাই আমাদের যুদ্ধ, আয়শা। পরস্পরের গায়ে গায়ে থাকা। ওদের একধরনের কাজ; আমাদের অন্য ধরনের। কোনো কাজই খাটো করে দেখার নয়।

আমি কাপড় চেঞ্জ করে আসছি। তুমি ড্রয়িংরুমে বসো।

টেলিফোন বাজে। আকমল হোসেন ফোন ধরেন।

চাচা বলছেন?

বলো, বাবা।

আমি শাহাদাঁত। আমাদের হাতে কিছু অস্ত্র এসেছে। রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ রাতেই। আমরা আপনার বাড়ির কাছাকাছি আছি।

নিয়ে এসো আমার বাসায়। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমরা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।

ফোন রেখে তিনি আলতাফকে ডাকলেন।

অস্ত্র রাখার জায়গা এ বাসায় ও-ই তৈরি করে। রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছে। মিস্ত্রি হওয়ার জন্য নয়। অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য কাজ শেখে। রং করার কাজও শিখেছে ও। বাড়িতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও রাখা আছে। আলতাফ কাছে এসে দাঁড়ালে বললেন, অস্ত্র আসছে। রাখতে হবে। কোথায়?

আয়শা খাতুন শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, পেছনের বারান্দায়। ওখানে ভাঙাচোরা যে দুটো টেবিলচেয়ার আছে, সেগুলো সরিয়ে খোঁড়ার ব্যবস্থা করো। তারপর হেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ঢেকে রাখা যাবে।

ঠিক বলেছ। তার ওপর ভাঙাচোরা টেবিল-চেয়ার রেখে দেব। মনে হবে, ভাঙাচোরা জিনিস ওখানে ডাম্প করা হয়েছে।

আরও বুদ্ধি আছে। ওখানে আমরা শুকনো লাকড়ির বোঝ রেখে দেব। আর্মি যদি এ বাড়িতে আসেও, তবু এসব জায়গা চিহ্নিত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

আমারও তেমন ভরসা আছে। আলতাফ, তুমি কাজে লাগো।

সেটাই ভালো। খালাম্মা ঠিকই বলেছেন, স্যার। দরকারের সময় বুদ্ধি ঠিকই মাথায় আসে।

আকমল হোসেন নিজে ভাঙা চেয়ার-টেবিল দুটো সরিয়ে দেন। আলতাফ শাবল-কুড়াল-দা নিয়ে আসে। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়। খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে। শব্দ যেন বেশি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখছেন আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন।

কখনো তাঁরা বারান্দার নিচে নেমে বাড়ির চারদিকে ঘুরে আসেন। কখনো গেটের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। বারান্দায় ওঠেন। ড্রয়িংরুমে আসেন। বসতে পারেন না কোথাও। প্রবল তাড়না তাঁদের স্থির থাকতে দেয় না। দুজনে দুদিকে প্রখর দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আলতাফের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ হওয়ার আগেই ভক্সওয়াগন গাড়িতে করে আসে শাহাদাঁত। আকমল হোসেন নিজেই গেট খুলে দেন। আবার বন্ধ করেন। অল্প সময়ের জন্য মুখ বাড়িয়ে রাস্তা দেখে নেন। গাড়ি গ্যারেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শাহাদাতের সঙ্গে নজরুল আর রতন এসেছে। সবাই মিলে বস্তা দুটো দ্রুত ঘরে ওঠায়। আলতাফ তখন একটি চার কোনা গর্ত করার কাজ শেষ করেছে। বস্তা দুটো অনায়াসে সেখানে রাখা যাবে।

আয়শা খাতুন তাগাদা দিয়ে বলেন, বস্তা দুটো তাড়াতাড়ি রেখে দাও। আলতাফকে আবার গর্তের মুখ বন্ধ করার কাজ করতে হবে। বাড়িতে অস্ত্র এলেই তার ভেতরে প্রবল অস্থিরতা কাজ করে। আজও তার মুখের দিকে তাকিয়ে মেরিনা বলে, আম্মা, আপনি ধৈর্য ধরেন। অস্ত্র তো, অনেক সময় তাড়াহুড়োয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তার পরও সতর্কতার তো শেষ নেই, মারে।

আমরা অনেক সতর্ক। আপনি স্থির হয়ে বসেন। আব্বার সঙ্গে আমি থাকছি।

আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বারান্দায় বসে গেট পাহারা দিই। তুই যা।

যোদ্ধারা অস্ত্রের বস্তা নিয়ে গর্তে ঢোকায়। সাবধানে পাশাপাশি খাড়া করে রাখে। আলতাফ গর্তের মুখ বন্ধ করার কাজ শুরু করে। মেরিনা চায়ের কথা বলতেই শাহাদাঁত আঙুল তুলে বলে, নো টি। আমরা তাড়াতাড়ি চলে যাই।

চলেন, আমি গেট খুলে দিচ্ছি। আব্বা তো এখানে থাকবেন। চোখের সামনে সবকিছু না দেখা পর্যন্ত আব্বার শান্তি নেই।

মেরিনা যোদ্ধাদের সঙ্গে যায়। আয়শা খাতুন বারান্দায় বসে গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখেন। মেরিনা বারান্দায় উঠে এলে দুজনে একসঙ্গে পেছনের বারান্দায় আসে।

সবকিছুই ঠিকঠাকমতো হয়। আকমল হোসেন নিজে তদারক করেন। বারান্দা পরিষ্কার করে পরিকল্পনামতো ভাঙা টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি রাখা হয়। আলতাফ গ্যারেজের কাছে জড়ো করে রাখা শুকনো খড়ি চেয়ার-টেবিলের পাশে জড়ো করে রাখে। আয়শা খাতুন বারান্দার দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। আলতাফ নিজের ঘরে চলে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন আকমল হোসেন, আয়শা খাতুন, মেরিনা। দুই বস্তা অস্ত্র লুকিয়ে রাখার পর পরিস্থিতি তাদের পক্ষে আছে, এটা কেউ ভাবতে পারছেন না। আশঙ্কার প্রহর গুনছে। একবার মনে হয়, আশঙ্কার সময় কেটে গেছে। অনেক সময় পার হয়ে গেছে। যদি কেউ খবর পেয়ে থাকত, তাহলে এই সময়ের মধ্যেই বাড়িতে হানা দিত। তার পরও চুপচাপ বসে থাকেন তিনজন। টিভি ছেড়ে রাখেন। দেখার মতো প্রোগ্রাম নয়। তার পরও সময় কাটাতে হয় তাদের। কোথাও থেকে কোনো ফোন আসে না। যারা অস্ত্র রেখে গেছে, তাদেরও ফোন আসে না। তারা নিরাপদ শেল্টারে যেতে পেরেছে কি না, সে খবরও পাওয়া হয়নি। নিজেরাও কোনো দুর্গবাড়িতে ফোন করেন না। শুধু অপেক্ষা—যেন কোনো দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে না আসে। যেন কেউ অস্ত্র রাখতে দেখেনি এটুকু জেনে স্বস্তিতে থাকা। যেন অস্ত্রগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগে। যেন যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রের ঝনঝনানি সরগরম করে দেয় শহরের রাস্তা।

মধ্যরাত গড়িয়ে যায়।

মেরিনা বলে, আব্বা, আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আমাদের বিপদের সময় কেটে গেছে? ভয়ের আর কিছু নেই? গেরিলারা নিরাপদে আছে।

না, মা। এত সহজ করে কোনো কিছু ভেবো না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমরা ঝুঁকিতে আছি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ভুল যেন আমাদের বিপদে না ফেলে।

মেরিনা মাথা নাড়ে। বলে, বুঝেছি। খবর পাওয়ার অপেক্ষা আমাদের মাথা থেকে কখনো সরবে না। সব সময় নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আলতাফ মুখ বাড়ায়।

স্যার, আমি ঘুমোতে যাই?

যাও। শুয়ে পড়ে গে। আজ তুমি একটা বড় কাজ করেছ। অবশ্য প্রায়ই তোমাকে করতে হয়।

আমিও যাই, আব্বা?

যাও, মা।

মেরিনা নিজের ঘরে যায়। বিছানায় শুয়ে পড়ার পরও ঘুম আসে না। সতর্ক থাকার একধরনের আতঙ্ক আছে। সেই আতঙ্ক নিয়েও টেবিলে এসে বসে। বাবা-মায়ের সঙ্গে যখন ড্রয়িংরুমে ছিল, তখন ওর ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। দুচোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল। হাই উঠছিল। এখন মনে হচ্ছে, দুচোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। মাত্র কতটুকু সময় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে আসা, বাথরুমে যাওয়া, পানি খাওয়া—মাত্র এতটুকু। কিন্তু মনে হচ্ছে, মাঝখানে যোজন যোজন ব্যবধান। ও ঘরের বাতি বন্ধ করতে করতে ভাবে—না, এত রাতে টেবিলে নয়। এখন ঘুমোতেই হবে। খুব অল্প সময়ে বাড়িতে একটি বড় ঘটনা ঘটে গেছে। এই একটি ঘটনার ফলাফল বিপুল বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। ও উঠে

বারান্দায় আসে। দেখতে পায়, আকমল হোসেন আর আয়শা খাতুন বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে আছেন।

আমিও বসব, আম্মা?

ঘুম আসছে না বুঝি?

না। মৃদু হেসে আরও বলে, অস্ত্র রাখার বিষয়টি এত এক্সসাইটেড ছিল যে স্নায়ু এখনো টানটান হয়ে আছে। ঝিমিয়ে যাচ্ছে না।

তাহলে আয়। রাতের অন্ধকারে আয়শার কণ্ঠস্বর পৌঁছাতে সময় লাগে। যেন কণ্ঠস্বর শহর ঘুরে এ বাড়ির ভেতর ঢুকেছে। মেয়েটার জন্য নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করেছে, মা।

বাবা বলে, আমার পাশে বস।

মেরিনা বাবার ঘা ঘেঁষে আদুরে ভঙ্গিতে বসে। মনে মনে ভাবে, সেই বয়সটা ফিরে পেলে লাফিয়ে বাবার কোলের ভেতরে ঢুকত। ও কাছে বসলে বাবা ওর মাথাটা কাত করে নিজের ঘাড়ের ওপর রাখেন।

কতক্ষণ পার হয়ে যায় তা কারও মনে থাকে না।

একসময় মেরিনা বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, ঘুমোতে পারিনি কেন, জানো?

কেন রে? নতুন কোনো কথা মনে হয়েছে তোর?

আমার জেবুন্নেসার কথা খুব মনে হয়েছে। খুব ইচ্ছা হয়েছিল ওর চিঠিটা পড়ার। কিন্তু পড়তে পারলাম না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে ওই চিঠিটা ভাইয়াকে দেওয়া আমার জন্য খুব কঠিন। শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো পারব না দিতে।

আয়শা খাতুন নিজেও বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, তুমি দিতে না পারলে আমি দেব, মা। মারুফের সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক দিয়ে আমরা ওকে জেনেছি। ওকে আমার এই পরিবারের একজন মনে হচ্ছে। ওকে আমরা দেখিনি। কিন্তু ও দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে। নির্যাতিত হয়ে জীবন দিয়েছে। তাতে কিছু এসে যায় না। ওর মৃত্যুই সত্য। ও আমাদের কাছে শহীদ। মারুফের জানা দরকার, যাকে ও ভালোবাসার কথা বলেছিল, তার সঙ্গে তার আর কেন দেখা হলো না। এই যুদ্ধের সময় তার কী হয়েছিল।

আয়শা খাতুন থেমে থেমে কথা বলছিলেন। একটি বাক্য শেষ করে আরেকটি বাক্য বলতে সময় নিচ্ছিলেন। তিনি যখন থামলেন, তখন মেরিনার কান্নার শব্দ শুনলেন। টের পেলেন আকমল হোসেনও চোখের জল মুছছেন।

তখন মধ্যরাত শেষ হয়েছে।

তারা পরস্পর হাত ধরেন। বাইরে রাস্তায় কোনো শব্দ নাই। মানুষ বা গাড়ির চলাচল নাই। বাড়ির পেছনের বুনো ঝোপে কয়েকটি জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। ঝিঁঝির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। থেমে থেমে।

আকমল হোসেন এসবের মাঝে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে বললেন, আজ রাতে আমরা না ঘুমাই?

আমারও তা-ই মনে হয়, আব্বা। আজ রাতে আমরা ঘুমাব না।

মেরিনার কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর মিশে যায় অন্ধকারে।

আয়শা খাতুন অন্ধকার চিরে স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, আজ রাতে আমরা না ঘুমিয়ে অস্ত্র পাহারা দেব। আমাদের গেরিলাযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রের দরকার। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যুদ্ধই বড় কথা। যোদ্ধাদের কাছে গানও অস্ত্রের সমান হয়ে গেছে।

আয়শা খাতুন থামলে অন্য দুজন কথা বলেন না।

তাঁর কন্ঠস্বর গুনগুন ধ্বনির মতো আচ্ছন্ন করে রাখে তাঁদের। জীবনের নিঃশ্বাস অন্ধকারের হাওয়ায় ভাসে।

গ্যানিজ ও ভোগ অপারেশনের জন্য তৈরি হয়েছে ক্র্যাক প্লাটুনের তিনজন সদস্য। আজই সেই দিন। আগের দিন রেকি করেছে ওরা। আকমল হোসেন জানেন, বিকেল চারটার দিকে আক্রমণ করা হবে। দুপুরের আগেই এ বাড়ি থেকে অস্ত্র নিয়ে গেছে জুয়েল আর গাজী। দুপুরের পর থেকে বাগানে পায়চারি করেন তিনি। তারপর চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে থাকেন। গেটের কাছ থেকে নড়ার হুকুম নেই আলতাফের-কেউ যদি আসে। কারও যদি কোনো দরকার হয়!

গতকাল গেরিলারা রেকি করার পর তিনি নিজেও রেকি করতে গিয়েছিলেন। গ্যানিজের ভেতরে ঢুকেছিলেন। তীক্ষ্ণ নজরদারিতে দেখেছিলেন গেরিলা অপারেশনের জন্য পরিবেশ বৈরী নয়। ফোনে তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছিলেন গাজীকে।

বিকেল চারটার দিকে একজন অবাঙালির হাইজ্যাক করা ৯০ সিসি হোন্ডায় চড়ে তারা গুলিস্তানে আসে। রাস্তায় বাস চলাচল স্বাভাবিক। ভিড় তেমন নেই। ওদেরকে একটি টয়োটা গাড়িতে করে কভার দিয়ে এসেছে সামাদ, উলফত আর জুয়েল। ওরাও চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, এই সামান্য ভিড়ে একটানে গাড়ি চালিয়ে যেতে ওদের অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া আক্রমণের সময় গাড়ি-রিকশা নিজেদের উদ্যোগেও সরে যেতে থাকে। ওদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ঘরে বসে আকমল হোসেন ঘড়ি দেখেন। ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন। সময় দেখে বুঝতে পারেন, ছেলেরা বেরিয়ে গেছে। দুপুরের আগে তিনি জুয়েলের হাতের ব্যাগে একটি স্টেনগান, পাঁচটি গ্রেনেড৩৬ ও ফসফরাস বোমা দিয়েছেন। ওরা কীভাবে যাচ্ছে, সে দৃশ্যটি আর দেখা হলো না। তিনি চেয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে ওদের পিছে পিছে যেতে। রাজি হয়নি জুয়েল। চেঁচিয়ে বলেছে, না, আপনি যাবেন না। আমাদেরকে কভার দেওয়া গাড়ি থাকবে। একমুহূর্ত থেমে আবার বলেছে, আপনার

কিছু হোক—এটা আমরা চাই না, চাচা। আপনারা যারা আমাদের দুর্গ, তাদের কিছু হলে আমরা তো আশ্রয় হারাব। যুদ্ধটা কত দিন চলবে, তা তো আমরা জানি না, চাচা। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন।

আকমল হোসেন ওর চেঁচামেচির উত্তর দেননি। মনে হয়েছিল, এই কথার উত্তর হয় না। জুয়েল পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলে তিনি ওর মাথায় হাত রেখেছিলেন। তিনি জানেন, এই অপারেশনে জুয়েল সামাদের গাড়িতে আছে।

হাইজ্যাক করা হোন্ডা সিসিটা চালাচ্ছে মানু। তার পেছনে আছে মায়া আর গাজী। গাজীর কাছে আছে স্টেনগান। বেশ খানিকটা দূর থেকেই ওরা দেখল প্রতিদিনের মতো গ্যানিজের গেটে পাহারায় আছে চারজন পুলিশ। ওরা অবাঙালি। হোন্ডা সিসি চালিয়ে রেকি করে ওরা। সামাদের টয়োটা কার গেট থেকে সামনের দিকে রাখা হয় স্টার্ট অন রেখে। রেকি করার সময় তিনজনই কালো রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে নেয়। তারপর ফিরে আসে মেইন গেট থেকে কয়েক হাত পেছনে। হোন্ডা থামলে প্রথমে নামে গাজী। স্টেনগান হাতে দৌড়ে যায় সামনে। সেই অবস্থায় স্টেনগানে ম্যাগাজিন ভরে নেয়। পেছনে মায়া। ও চিৎকার করে বলে, হ্যান্ডস আপ।

পুলিশরা হতভম্ব। হ্যান্ডস আপ করে না, কিন্তু বন্দুক হাতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে হইচই। বাইরে চিৎকার করে পথচারীরা। ভেতরে আছে। দোকানে কর্মরত লোকেরা। সঙ্গে বেশ কয়েকজন ক্রেতা। তারা ছোটোছুটি করে দোকানের ভেতরের আসবাবপত্রের আড়ালে নিজেদের লুকানোর চেষ্টা করছে। তাদের পায়ের ধাক্কায় ছোট ছোট ঝুড়ি বা ওয়েস্টপেপার বাস্কেট কিংবা কাগজের বাক্স ইত্যাদি উল্টে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। কেউ কারও দিকে তাকায় না। প্রত্যেকে নিজেকে লুকানোয় ব্যস্ত।

দুজনের কেউই তখনো দোকানের ভেতরে ঢোকেনি। পুলিশ চারজন কী করবে বুঝে ওঠার আগেই গাজী ওদেরকে ব্রাশফায়ার করে। পড়ে যায় ওরা। রক্তাক্ত ফুটপাত থেকে রক্তের স্রোত নামে রাস্তায়। উর্ধ্বশ্বাসে মানুষজন পালায়। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বায়তুল মোকাররমের সামনের ফুটপাত থেকে দোকানিরা পাততাড়ি গোটায়। মুহূর্তে রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়।

মেইন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মায়া দোকানের ভেতরে গ্রেনেড-৩৬ ছুড়ে মারে। সঙ্গে একটি আগুনে ফসফরাস বোমা। ভেতরে হইচই-চেঁচামেচিচিৎকার, ক্রন্দন ভেসে আসে ওদের কানে।

গাজী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, বুঝে দেখ, পঁচিশের রাতে তোদের সেপাইরা আমাদের কী করেছে। ভেবে দেখ, আমাদের ইপিআর সদস্যদের কীভাবে মেরেছিস!

আয়। দেখ, আমাদের কভার দেওয়া গাড়ি আড়াআড়িভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

দেখতে পাচ্ছিস কি জুয়েলের হাতে স্টেনগান। স্টেনের নল বের করে রাস্তার দিকে তাক করে রেখেছে ও।

দুজনে ফুটপাত ধরে দৌড়ে গিয়ে হোন্ডায় ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে রাখা হোন্ডা চালাতে শুরু করে মানু। সামনেই আছে কভার দেওয়া টয়োটা। স্টেনগানের নল আর দেখা যায় না। সেটা ভেতরে ঢোকানো হয়েছে। পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে হাত নাড়ে জুয়েল। দুআঙুল তুলে ভি দেখায়। দূর থেকে ওরা কিছু বলতে পারে না।

বেশ গতিতেই হোন্ডা চালাতে চালাতে মানু ঘাড় নাড়িয়ে বলে, কনগ্রাচুলেশন ফর গ্রেট সাকসেস।

গাজী শিস বাজিয়ে বলে, হিপ-হিপ-হুররে।

মায়া ওর ঘাড়ে চাপ দিয়ে বলে, বাড়াবাড়ি হচ্ছে, থাম।

এটা আমাদের বিজয় উৎসব।

ওটা রূপগঞ্জে গিয়ে হবে। শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে, যেখানে গেরিলারা অবস্থান নিয়েছে। আমরা একটা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলেছি।

মানু গম্ভীর স্বরে বলে, তোরা কথা থামা। এটা বেশি কথা বলার সময় না। এটা উল্লাসেরও সময় নয়।

উল্লাস জীবনের ধর্ম। যুদ্ধের সময়ও উল্লাস চাই।

বাব্বা, দার্শনিক ভাবনা! তোরা আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেছিস। এখন চুপ করে থাক, নইলে হোন্ডা থেকে ফেলে দেব।

কেউ কোনো কথা বলে না। সামনে লালবাতির সিগন্যাল না মেনে ছুটে বেরিয়ে যায় হোন্ডা। গতি বাড়িয়ে দেয় মানু। টয়োটা কার অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দোকানপাট বন্ধের সময় হয়ে এসেছে প্রায়। ওরা যাবে ভোগে। ওই দোকানেও আজকে অপারেশন। গুলিস্তানের খবর ছড়িয়ে পড়াতে সন্ত্রস্ত মানুষ ছুটছে। খবর পৌঁছাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। রাস্তায় ছোটার সময় সেটাই টের পায় ওরা।

গাজী বলে, হাতে সময় খুব কম। প্রস্তুতি নিতে হবে।

মায়া দ্রুত একটি ফসফরাস গ্রেনেড পিন-আউট করে গাজীর হাতে দেয়। ওরা জানে, এভাবে পিন-আউট গ্রেনেড নিয়ে ছোটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বেশি ঝাকুনি লাগলে পিন-আউট করা ফসফরাস বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তার পরও ওরা নির্ভীক।

খুক করে হেসে মায়া বলে, দুঃসাহসী অভিযান ভয়হীন। ভয় করবি তো পেঁদিয়ে যাবি।

পেঁদিয়ে যাবি কী রে? আগে তো কখনো শুনিনি।

চুপসে যাবি।

মনে এত আনন্দ যে নতুন শব্দও আবিষ্কার করছিস?

চুপ শালা।

আবার বেগে ছুটে চলা। গতি মাপার সময় নেই। তীব্র গতিতে ছুটছে হোন্ডা সিসি। গাজী খুব সতর্কভাবে ফসফরাস বোমাটি ধরে রেখেছে।

দোকানের কাছাকাছি এলে ওরা দেখতে পায়, ভোগের কর্মচারীরা দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছে। প্রায় বন্ধ করেই ফেলেছে। দোকানের শাটার আর এক হাত মাত্র খোলা। ওরা বুঝে যায়, হোন্ডা থেকে নেমে কাজ করার সুযোগ নেই। তাহলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘাড় না ঘুরিয়ে মানু বলে, সময় নষ্ট করার সময় নেই। হোন্ডা থামাব না।

আমারও মনে হচ্ছে, থামানোর দরকার নেই।

মায়া চেঁচিয়ে বলে, গেট রেডি গাজী।

দোকানের সামনে এসে হোন্ডা স্লো হয় মাত্র। একমুহূর্ত দেরি না করে চলন্ত হোন্ডা থেকে সেই দরজার ওপর ফসফরাস বোমা ছুড়ে মারে গাজী।

হইচই-আর্তচিৎকার শুরু হয়।

শাঁই করে বেরিয়ে যায় হোন্ডা। দোকানের কাছে আসার আগেই কভার দেওয়া গাড়িটি পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের পিছু নিয়েছিল। হোন্ডা বেরিয়ে গেলে কভার দেওয়া গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে ওদের অনুসরণ করে।

ঘড়ি দেখে উন্মুখ হয়ে থাকেন আকমল হোসেন। ভাবেন, এতক্ষণে ওদের অপারেশন শেষ হয়েছে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে তো ওরা? মেরিনা কাছে এসে দাঁড়ায়। আয়শা খাতুনও। আকমল হোসেন ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমরা সবাই একই চিন্তায় আছি, না?

নিশ্চয়ই ওরা এতক্ষণে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে।

আমিও তাই ভাবছি, আম্মা।

মেরিনার কন্ঠস্বরে অস্থিরতা ধ্বনিত হয়। দরজায় এসে দাঁড়ায় আলতাফ ও মন্টুর মা। আয়শা খাতুন বলেছেন, যতক্ষণ ওদের খবর না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ রান্নাঘরে চুলো জ্বলবে না। আলতাফ নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওদের খবর না পাওয়া পর্যন্ত একটি বিড়িও টানবে না।

আম্মা, আমি টেলিভিশন ছাড়ি? মেরিনার অস্থির আচরণ ওর কন্ঠস্বরেও ধরা পড়ে।

ছাড়তে পারো। তবে এত তাড়াতাড়ি ওরা ওদের ভাষায় দুষ্কৃতিকারীদের কোনো খবর দেবে না।

তার পরও ছেড়ে রাখি। যদি কোনো কিছু শুনতে পাই।

আকমল হোসেন বলেন, ভলিউমটা লো করে রাখিস, মা।

আলতাফ আর মন্টুর মা বারান্দায় আসে। সিঁড়ির ওপর বসে মন্টুর মা। আলতাফ গেট খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। গাড়ির চলাচল খেয়াল করে। ভাবে, যদি কোনো গাড়িতে করে ওরা এ বাড়িতে আসে তাহলে ওদের বলবে, আপনাদের পরের অপারেশনে আমাকে নেবেন। আমি ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হতে চাই। ওরা বলবে, আপনার তো ট্রেনিং নেই, আলতাফ ভাই। আমি বলব, আপনারা আমাকে ট্রেনিং দেন। আমি ত্রিপুরার মেলাঘরে ট্রেনিং নিতে পারব না। ঢাকায় কোন মাঠে যেতে হবে আমাকে বলেন। ওরা তখন নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় যেতে বলবে ওকে। ও রাইফেল চালানো শিখবে। গ্রেনেডের পিন খোলা শিখবে।

আলতাফ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢাকে। নিজেকেই বলে, সব সময় বড় ঘটনার সঙ্গী হতে হয়। যে বড় ঘটনার সঙ্গী হতে পারে না, সে অভাগা।

তারপর নিজেকেই বলে, তুমি তো বড় ঘটনার সঙ্গী হয়েছ, আলতাফ মিয়া। তুমি এই দুর্গের পাহারাদার। দরকারমতো অস্ত্র বের করে দাও। দরকারমতো লুকিয়ে রাখো।

হ্যাঁ, তা দেই।

নিজেকেই উত্তর দেয়। তারপর গেটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি ওরা আসে! একমুহূর্ত দেরি না করে গেট খুলতে হবে। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি-রিকশা। পায়ে হাঁটা মানুষ। কখনো দু-একটা মিলিটারির গাড়ি। সেনাদের মাথায় হেলমেট থাকে। আর রাইফেলের নল উঁচিয়ে রাখে। কত দূর থেকে ওরা এই দেশে মরতে এসেছে। আলতাফ দুহাত ওপরে তুলে বলে, তোমাদের গেরিলাযোদ্ধাদের হাতে মরতে হবে। মরতেই হবে। রেহাই পাবে না।

মন্টুর মা সিঁড়িতে বসে থাকতে পারে না। উঠে রান্নাঘরে আসে। ভাবে, ওরা কখন আসবে? ওরা এলে তো আগে পানি চাইবে। তার পরে চা। মন্টুর মা ট্রের ওপর গ্লাস সাজিয়ে রাখে। পানি ঢালে না। আসার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে ঠান্ডা পানি ঢালবে। আর একটি ট্রের ওপর চায়ের কাপ সাজায়। চায়ের পাতা, চিনির কৌটা ওপর থেকে নামিয়ে হাতের কাছে রাখে। চায়ের কেটলিতে পানি ভরে কেরোসিনের স্টোভের ওপর রাখে, যেন শুধু আগুন জ্বালালেই হয়। কাজ গুছিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে পিড়ির ওপর বসে থাকে।

মেরিনা রান্নাঘরে আসে।

ফ্রিজে কয় বোতল পানি আছে, তা দেখতে এলাম।

মন্টুর মা বসে থেকেই বলে, ওনারা যদি দশজনও আসে, তা-ও ঠান্ডা পানি দিতে পারব।

ভালোবাসা আপনাকে, খালা।

ফ্রিজে পনির আর পায়েস আছে।

ব্যস, অনেক। আমার মা তো মা না, এই বাড়ির সেনাপ্রধান। বন্দুক-গুলিগ্রেনেড-বোমা-ভাত-মাংস-পায়েস-পনির-কমলা-আপেল-বিছানা-বালিশ সব তার হাতের মুঠোয়। মা যে কী পারে না, তা আমি বুঝতে পারি না। আমাদের প্রিয় নবীর স্ত্রী আয়শা উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আমার মায়ের নাম আয়শা। যুদ্ধ তাঁর কাছেও ভাবনা।

মন্টুর মা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, শুধু ভাবনা না, শক্তিও। মনের শক্তি।

ঠিক বলেছেন। মেরিনা হাত তুলে নিজেকে ঝাঁকায়।

মন্টুর মায়ের মনে হয়, মেরিনার চেহারায় আলোর ঝলকানি। মেরিনা এক গ্লাস পানি খেয়ে ড্রয়িংরুমে চলে যায়। মন্টুর মা আবার বারান্দার সিঁড়িতে গিয়ে বসে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ এই বাড়িতে আসে না।

এতক্ষণ ধরে আকমল হোসেন অনবরত নিজেকে সামলেছেন। মাগরেবের আজান ভেসে আসছে। তিনি উঠে আলম হাফিজকে ফোন ঘোরালেন। দিলু রোডের তাঁর বাড়িটিও একটি দুর্গ। ফোন ধরল তার মেয়ে সোমা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী। আকমল হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোমার আব্বা কোথায়?

আব্বা নামাজ পড়ছেন, চাচা। নামাজ শেষ হলে আব্বাকে বলি আপনাকে ফোন করতে।

না, আমিই করব। তুমি ছোট্ট করে উত্তর দাও—

আকমল হোসেন কথা শেষ করার আগেই সোমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, ওরা সবাই ভালো আছে, চাচা। একেকজন একেক বাড়িতে চলে গেছে। একসঙ্গে নেই। মোটরসাইকেল মগবাজারের রেললাইনের ধারের গলিতে ফেলে গেছে। আপনি কিছু ভাববেন না। চাচা, আপনি ভালো আছেন তো?

হ্যাঁ মা, ভালো আছি।

তিনি কথা বলার সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আয়শা খাতুন আর মেরিনা। তিনি মুখ ফিরিয়ে আয়শা খাতুনকে বললেন, তোমার চুলোয় আগুন দিতে পারো। অপারেশন সাকসেসফুল। ছেলেরা বিভিন্ন বাড়িতে হাইডে চলে গেছে।

আমার ছেলেটা ফোন করেনি।

আহ্ আশা, এমন করে বলতে নেই। সব সময় মনে করবে, ওরা কোনো কাজে আছে।

তা ঠিক। কখনো পরিস্থিতি মানতে না পারা নেহাতই ছেলেমানুষি।

আয়শা সরে যান। মেরিনা মৃদু স্বরে বলে, মা দুঃখ পেয়েছেন।

তুই মায়ের কাছে যা। তার স্বস্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

এখন মা একা থাকতে চাইবেন। আমি আমার নিজের ঘরে যাচ্ছি।

তখন আলতাফ নিজের ঘরে ঢুকে বিড়ি জ্বালায়। মনের সুখে টানতে টানতে পা নাচায়। ভাবে, একটা অপারেশনে যোগ দিতেই হবে। নইলে জীবন বৃথা। বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনিরা যুদ্ধের গল্প শুনতে চাইলে তখন কী বলবে? শুধু অস্ত্র পাহারা দেওয়া নয়, আরও বেশি কিছু চাই।

সেই সন্ধ্যায় আলতাফ একজন চেইন স্মোকার হয়। আয়শা খাতুন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেন, কেরোসিনের চুলা জ্বলছে। সে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে মন্টুর মা। তিনি ফিরে আসেন ডাইনিং স্পেসে। ফ্রিজ খুলে পানির বোতল বের করেন। ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে তিনি মনে করেন, এই মুহূর্তে পানির চেয়ে আগুনই তার বেশি প্রিয়। তিনি শুরু করেন গুনগুন ধ্বনি-আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...। গানের সুর শুনে আকমল হোসেন মাথা তোলেন। কিন্তু না,

আয়শা খাতুন এ ঘরে নেই। মেরিনা পড়ার টেবিলে বসে দরজার দিকে তাকায়—মা কি এ ঘরে আসছেন?

আয়শা খাতুন মেয়ের ঘরে ঢোকেন না। তিনি পেছনের বড় বারান্দায় এসে বসেন। আকাশ দেখেন। আকাশের পটভূমিতে আগুনের শিখা বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখেন।

মায়ের গুনগুন ধ্বনি শুনে মেরিনার মনে হয়, এই ধ্বনির মধ্যে শুধু সুর আর বাণী নেই, অন্য কিছু যোগ হয়েছে। আকমল হোসেনও এমন ভাবনাই করেন। টেবিলের ওপর রাখা নিজের কাগজপত্র দেখতে দেখতে ভাবেন, পরের পরিকল্পনা সামাদ বলেছে ইন্টারকন্টিনেন্টালে অপারেশন। প্রথম অপারেশনের পর এখানে পাহারার খবরদারি কড়াকড়ি হয়েছে। তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। হোটেলে অনায়াসে প্রবেশ দুঃসাধ্য। সে জন্য হোটেলে ঢুকতে হবে। দেখাতে হবে যে, আমরা পারি।

তিনি মাথা সোজা করে চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বোজেন। একেকটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলে তার ভেতরে প্রশান্তি ছড়ায়। তিনি মনে করেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও ওই প্রশান্তি উপভোগ করা উচিত। আজও সেই শান্ত-স্নিগ্ধতায় শুনতে পান আয়শা খাতুনের পায়ের শব্দ। তিনি মৃদু স্বরে ডাকেন, আশা।

বলো।

তোমার গুনগুনে আজ ভিন্ন কিছু পেয়েছি। শুধু সুর আর বাণী না।

তুমি যে আগুন জ্বালাতে বললে?

তাহলে এ বাড়ির সবকিছুতে আজ আগুন?

আমি তো সেরকমই মনে করছি।

এই মনে করা আমাদের জীবনে সুন্দর হোক। মৃত্যু ও ধ্বংসের সৌন্দর্য।

আয়শা খাতুন কথা বলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘরে এসেছেন টাকা নিতে। আলতাফকে দোকানে পাঠাবেন। সে কথা ভুলে যান। দাঁড়িয়েই থাকেন। চেইন স্মোকার আলতাফের ছোট অ্যাশ-ট্রেতে আরও দুটুকরো সিগারেটের পোড়া জমা হয়। মন্টুর মা স্টোভের ওপর থেকে ভাতের পাতিল নামালে আগুন ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। শুধু মন্টুর মা মাড় পালানোর জন্য ভাতের পাতিল উপুড় করে।

একদিন ক্র্যাক প্লাটুনের পাঁচজন বাড়িতে আসে। আগামীতে ওরা ইন্টারকন্টিনেন্টালের বাথরুমে বিস্ফোরক রাখবে বলে ঠিক করেছে। গতকাল আকমল হোসেন নিজেও হোটেলের চারপাশ রেকি করে এসেছেন। দেখেছেন পাহারার পরিমাণ কেমন এবং কতটা ডিঙাতে হবে। হোটেলের বিভিন্ন জায়গায় পাহারার জন্য অসংখ্য মিলিশিয়া রাখা হয়েছে। আগের চেয়ে তিন গুণ বেশি। হোটেলের তিন দিকের কোনায় বালির বস্তা দিয়ে প্রতিরোধের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। সেই বস্তার ওপর লাইট মেশিনগান নিয়ে সারাক্ষণ পাহারায় থাকছে সেনাবাহিনীর সদস্য।

পায়ে হেঁটে এসব দেখে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। বুঝলেন, এই অপারেশন সাকসেসফুল না হলে মৃত্যু। তার পরও সময় এখন জীবন-মৃত্যুর লড়াই। তিনি গাড়িতে ফিরলেন। আলতাফ বসে আছে গাড়িতে। এসব ক্ষেত্রে তিনি ওকে নিয়ে আসেন। তিনি গাড়িতে উঠলে আলতাফ সরাসরি বলে, কালকে আমি ভাইয়াদের সঙ্গে থাকব, স্যার।

এখন কথা না। আগে বাড়ি যাই।

তিনি গাড়িতে স্টার্ট দেন। তিনি আলতাফের মনোভাবের কথা জানেন। ও বারবারই বলে। কিন্তু গেরিলা অপারেশন তো পাড়ার খেলার মাঠে ফুটবল খেলা নয় যে, যে কেউ খেলায় অংশ নেবে। বলের গায়ে দু-চারটি লাথি মেরে বলবে, ফুটবল খেলেছি।

চা খাওয়ার ফাঁকে তিনি ছেলেদের নিজের রেকি করার কথা বলেন। ওরা মনোযোগ দিয়ে তার বিবরণ শোনে। কথা থামিয়ে তিনি সামাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, এবার তোমার কথা শুনব। কারণ, তুমি ভেতরে ঢুকে দেখে এসেছ।

আমি হোটেলে ঢোকার সুযোগ করে নিয়েছি জামাল ওয়ারিসের মাধ্যমে। তিনি একজন অবাঙালি। ঢাকাতেই থাকেন। আমি তাঁর কাছ থেকে থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নতুন অফিসঘরে নিয়ন সাইনবোর্ড লাগানোর অর্ডার সংগ্রহ করতে যাই। সুযোগ কাজে লাগিয়ে কোথায় কী করব, সেই বিষয়ে রেকি করি। আমার মনে হয়, যেভাবে বিস্ফোরক রাখার চিন্তা করেছি, তা ঠিকমতো রাখতে পারলে আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল হবে।

সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল। থামতেই মেরিনা বলে, ইনশাআল্লাহ, আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে গেলাম। এর পরের অপারেশনে আমি যাব। আম্মা আমাকে একটা ট্রাউজার আর শার্ট কিনে দেবেন। আব্বা, কী বলেন?

তোমার ট্রেনিং দরকার, মা।

আমি ভাইয়াদের কাছ থেকে যা শুনছি এবং দেখছি, তাতে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে। আমি পারব।

বাকের হাসতে হাসতে বলে, তুমি তো এমনিতেই গেরিলা। তুমি আমাদের সবকিছুর সঙ্গেই আছ।

আরও কিছু করতে চাই।

আয়শা খাতুন গম্ভীর স্বরে বলেন, ওকে করতে দেওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ওকে যে কাজ দেওয়া হবে, তা ও পারবে।

আকমল হোসেন অন্যদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, ওকে দিয়ে কী করানো যায়, তা আমাকে ভাবতে দিয়ো। আমাদের কালকের অপারেশন শেষ হোক।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

রূপগঞ্জে মারুফ ভালো আছে তো, মতিন?

হ্যাঁ, ভালো আছে, খালাম্মা। ও প্রায়ই বাড়ির কথা মনে করে। ওর বাড়িটা একটা দুর্গবাড়ি—এ নিয়ে ওর মনে গর্ব আছে।

আয়শার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মৃদু হেসে বলেন, ভয় পাই শারীরিক অসুস্থতার। জ্বর, আমাশা, নিউমোনিয়া...

যুদ্ধের সময় এসব ভাবা ঠিক নয়, আয়শা। হলে হবে। আবার সুস্থও হবে।

ঘরে একমুহূর্ত নীরবতা। আকমল হোসেন যা বললেন, তার বিপরীতে কেউ আর কোনো কথা বলে না। সময় যে কত গভীর এবং মন্ময় হতে পারে, সকলে তা উপলব্ধি করে। সময়ের গভীরতায় নিমগ্ন মানুষের কথা অকস্মাৎ ফুরিয়ে যায়। কতক্ষণ কেটে যায় কেউ জানে না।

মতিন বলে, আমরা এখন যাই। কাল আসব।

এসো। সাবধানে যেয়ো। ভালো থেকো।

ঘরে কথা নেই। জেগে ওঠে পদশব্দ। দরজায় দাঁড়িয়ে মতিন বলে, পুরো রূপগঞ্জ গেরিলা ক্যাম্প হয়েছে। ওখানে গেলে আমাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়।

তোমাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তোমাদের সুস্থ রাখুন।

তোমাদের মঙ্গল হোক।

আয়শা খাতুন ওদের পিছু পিছু বারান্দা পর্যন্ত যান। মেরিনা গেট পর্যন্ত আসে। আলতাফ গেট সামান্য ফাঁক করে একজনকে যেতে দেয়। তারপর চারটি গেটের আরেকটি দিয়ে আরেকজনকে। সবশেষে দুজনকে পেছনের গেট দিয়ে। এখান থেকে ভিন্ন পথে বের হয়ে ওরা আবার মিলিত হবে এক জায়গায়।

আকমল হোসেন জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকান। সেই কবে এই শহরে তাঁর জন্ম, সেই কত বছর ধরে এই শহরে তার বেড়ে ওঠা—শহরের সঙ্গে জানাজানি কতভাবে! এই জানা থেকে ধুলোবালি এবং পোকামাকড়ও বাদ নেই। ঘাস-গাছ-লতাপাতাও বাদ নেই। এখন এই শহর তার সামনে নতুনভাবে জেগে উঠেছে। সামনে সুদিন। শহরের ভৌগোলিক অবস্থান বদলাবে, শহরটি যুদ্ধ করে স্বাধীন করা একটি দেশের রাজধানী হবে। উপমহাদেশের মানচিত্র বদলে দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেবে। তার বুকের ভেতর আনন্দের জোয়ারধ্বনি। আগামীকাল তিনি নিজে ছেলেদের হাতে বিস্ফোরক উঠিয়ে দেবেন।

পরদিন সামাদের ব্রিফকেসে ঢোকানো হয় ২৮ পাউন্ড পিকে এবং ৫৫ মিনিট মেয়াদি টাইম-পেনসিল। ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে রওনা হয়। কোনো কথা নেই। বিদায় নেই। আকমল হোসেন হাতঘড়িতে সময় দেখেন। দেয়ালঘড়ির দিকেও তাকান। তারপর গেরিলা পত্রিকায় শান্তি কমিটির ওপর লিখবেন বলে টেবিলে গিয়ে বসেন।

ততক্ষণে গাড়ি পৌঁছে গেছে ইন্টারকন্টিনেন্টালের কাছে। আগেই ঠিক করা ছিল যে তারা মেইন গেট দিয়ে ঢুকবে না। দুজন ঢুকবে ভেতরে, দুজন গাড়িতে অপেক্ষা করবে স্টেনগান হাতে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুইস এয়ার অফিসঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে সামাদ আর বাকের। ওদের সহযোগিতা করে ওই অফিসে কর্মরত বন্ধু। ফিসফিসিয়ে বলে, সাবধানে যা। ফেরার পথ অন্যদিকে।

জানি। তুই সাবধানে থাকিস।

এক সেকেন্ড মাত্র। বন্ধুর হাত ধরে ছেড়ে দেয় ওরা। বুঝতে পারে, চারপাশে ওরা আছে বলে কাজ সহজ হয়ে গেছে। ওরা আছে বলে প্রসার জায়গা তৈরি হয়। দুজনে পেছন ফিরে তাকায় না। বুঝতে পারে, ওদের বন্ধু নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। আর কিছুক্ষণ পর অফিস ছুটির সময় হয়ে যাবে। বন্ধু বলেছে, ছুটির আধঘন্টা আগে ও অফিস ছেড়ে চলে যাবে অন্যত্র কাজ আছে এই অজুহাতে।

দুজনে টয়লেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে ঢোকে সামাদ। চারদিক দেখেশুনে বেরিয়ে আসে। তারপর ব্রিফকেস নিয়ে ঢোকে বাকের। ব্রিফকেস কমোডের পেছনে রাখে। তারপর টাইম-পেনসিল প্রেস করে। দ্রুত দরজা বন্ধ করে বের হয়ে আসে। দুজন দুপথে বের হয়ে গাড়িতে ওঠে। সামান্য সময় মাত্র। গাড়ি শাঁই করে ছেড়ে যায় হোটেলের এলাকা।

বিকেল পাঁচটা ৫৬ মিনিটে ঘটে বিস্ফোরণ। ৫৫ মিনিট মেয়াদি টাইমপেনসিল ছিল। ওদের বাড়িতে পৌঁছাতে অসুবিধা হয় না। ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর বাড়িটি বেশি দূরে নয়। ধানমন্ডি ২৭ এবং ২৮-ও ওদের টার্গেট ছিল। যে যার মতো পৌঁছে গেল বাড়িতে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আকমল হোসেন বুঝলেন, ওরা যদি বিপদে না পড়ে, তবে এতক্ষণে নিরাপদে বাড়িতে চলে গেছে। তার পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ওদের ফোনের অপেক্ষা।

সন্ধ্যার পর মিজারুল ফোন করে।

চাচা, অপারেশন সাকসেসফুল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠেছে হোটেল। শপিং আর্কেড, লাউঞ্জ এবং আশপাশের ঘরের জানালার কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাথরুমের দেয়ালও ভেঙে পড়েছে। আহত হয়েছে। কয়েকজন।

তোমাদের অভিনন্দন, বাছারা।

আমরা কাল সকালে রূপগঞ্জ চলে যাব। সবাই একসঙ্গে না। ভাগে ভাগে। বিভিন্ন সময়ে।

সাবধানে যেয়ো, বাছারা। তোমরা আমাদের সোনার ছেলে। দোয়া করি, ভালো থাকো।

আকমল হোসেন ফোন রেখে দেওয়ার পর দুহাত ওপরে তুলে নেচে ওঠে মেরিনা।

কী আনন্দ, কী আনন্দ! আব্বা, ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশি সাংবাদিক থাকলে তারা নিশ্চয় এই খবর ছড়িয়ে দেবে সারা দুনিয়ায়।

সেটাই তো করা উচিত। ঢাকা শহরের গেরিলাযুদ্ধ...

আকমল হোসেন আর বাক্যটি শেষ করেন না। আয়শা খাতুন বলেন, তুমি কি চা খাবে? বিকেলে তো খাওনি।

হ্যাঁ, তোমার চুলায় জ্বলে উঠুক আলো। আগুন জ্বালো।

আজ আগুন আমি জ্বালাব।

মেরিনা একছুটে রান্নাঘরে আসে। মন্টুর মা পিঁড়ি পেতে বসে আছে। মেরিনাকে দেখে চোখ বড় করে বলে, বুঝেছি। ওরা জিতেছে।

হ্যাঁ, দারুণ জয়। আজ আগুন আমি জ্বালাব।

না, আমি। আমি জ্বালাব।

মন্টুর মা ঘুরে স্টোভের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইটা নিজের মুঠিতে নেয়। মেরিনার দিকে তাকিয়ে বলে, সব সময় তো আমি জ্বালাই। আজ খুশির দিনে আমি জ্বালাব না কেন? আমিও তো যুদ্ধ করতে চাই।

মেরিনা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মন্টুর মায়ের দিকে। মন্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়ে পানি বসায়। মেরিনা ছুটে ড্রয়িংরুমে এসে বলে, আব্বা, খালা আমাকে আগুন জ্বালাতে দেয়নি। বলেছে, এই আগুন জ্বালানো তার যুদ্ধ। আরও বলেছে, এই যুদ্ধ তাকে করতে দিতেই হবে।

আকমল হোসেন হা-হা করে হাসেন। অনেক দিন পর তার এই প্রাণখোলা হাসি দেখে আয়শা খাতুন ভ্রু কুঁচকে বলেন, হাসছ যে? কিসের এত আনন্দ?

যুদ্ধ সবখানে পৌঁছে গেছে। আমাদের আর ভয় নাই। আমরা জয়ী হবই।

আকমল হোসেন আবার হাসিতে ভেঙে পড়েন। হাসতে হাসতে সোফার গায়ে মাথা ঠেকান।

মেরিনা বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে ডাকে, আব্বা।

বল, মা।

এটা কি আনন্দের সময়?

সবকিছুর সময়। কোনোটা বাদ দিয়ে কোনোটা নয়। তোর মা যেমন গুনগুন ধ্বনিতে আমাদের ভরিয়ে দেয়, তেমন এই হাসি দিয়ে আমি গেরিলাদের বিজয়ের আনন্দ করব। অবশ্যই এটা আনন্দের সময়।

এখন আমরা সবাই মিলে তোমার সঙ্গে হাসব।

অবশ্যই হাসবি। এই হাসি দিয়ে আমরা জেবুন্নেসার মৃত্যুর উৎসব করব। ও এই পরিবারের একজন হতে পারত। হয়নি। তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার ছেলের ভালোবাসা ও পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ও একজন শহীদ। বীর নারী। শত্রুর গায়ে থুতু ছিটিয়ে জীবন দিয়েছে।

আকস্মিকভাবে ঘরে স্তব্ধতা নেমে আসে। কারও মুখে কথা নেই। আয়শা সোফায় মাথা হেলিয়ে চোখ বোজেন। মেরিনা অপলক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা কী আশ্চর্য সৌন্দর্যে ইতিহাসের পাতায় রং মাখালেন। ওর বুকের ভেতর তোলপাড় করে। নিজেকে বলে, জেবুন্নেসা, তুমি অমর।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাকের বারান্দায় বসে রাবেয়া রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে মুখটা উঁচু করে রাখে। যেন সার্বিক দিকে তাকানোর ইচ্ছা ওর আর নেই। পৃথিবীকে ও আর দেখতে চায় না। ওর দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকবে শুধু। রাবেয়ার চোখ জল দিয়ে ভরে উঠতে চায় না।

কিছুক্ষণ আগে ঝুলিয়ে রাখা মেয়েদের পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করার কাজ শেষ করেছে। তখনি টের পেয়েছে ঝুলন্ত অবস্থায় মরে আছে সাফিনা। মাত্র গতকাল বিকেলে ওই অবস্থায় ওর চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দিয়েছিল রাবেয়া। মাথার চারদিকে উল্টে থাকা চুলের গোছায় ওর মুখ আড়াল হয়ে থাকা রাবেয়ার পছন্দ ছিল না। মাত্র দুদিন আগে ওকে এখানে এনে ঝোলানো হয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় বেত দিয়ে মারাও হয়েছে। তার পর থেকে ওর কথা বন্ধ ছিল। মৃত্যুর পর শীতল হয়ে যাওয়া শরীরটি ওর পুরো শরীরে শীতের প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়েছিল। ও প্রথমে ওকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। তারপর হাউমাউ করে কেঁদেছিল। কিন্তু না, ও বেশিক্ষণ কাঁদেনি। শুধু স্তব্ধ হয়ে ভেবেছিল, মমতার জায়গাটি এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা ও ভাবেনি। পরক্ষণে মনে হয়েছিল, মরে গিয়ে ভালো হয়েছে। ওর যন্ত্রণা শেষ হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে গেল! লোকে ওর ত্যাগের কথা মনে রাখবে তো?

রাবেয়া ওর দুপা বারান্দায় ছড়িয়ে দেয়।

যে পাঞ্জাবি সেনারা এই সব ঘরের পাহারায় থাকে, তারা এখন কেউ নেই। ক্যানটিনে গেছে চা খাবে বলে। রাবেয়া ওদের কাছে শুনেছে, সাফিনা অফিসারের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। তার মুখে থামচি দিয়েছে। সে জন্য এই শাস্তি।

রাবেয়া পা গুটিয়ে নেয়। হাঁটুর ওপর মাথা রাখে। আবার মাথা তোলে। ভাবে, ওরা মেয়েদের ওপর দিয়ে যুদ্ধের শোধ ওঠাচ্ছে। বাঙালিকে স্বাধীনতার সাধ বোঝাচ্ছে। ও আবার পা মেলে দেয়। ইচ্ছে হয়, এই পা দিয়ে সেনাদের কাউকে কষে লাথি দিতে।

ঘরের ভেতর থেকে কান্নার ধ্বনি আসে। কিন্তু যে ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে, সে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছে সেনারা। ওরা জানে, এই সব মেয়ে এখান থেকে পালাতে পারবে না। তার পরও।

ও দরজার গায়ে মুখ লাগিয়ে বলে, কাঁদবেন না। আপনাদের কিছু লাগলে আমাকে বলেন। আমি সুইপার। তারপর কন্ঠস্বর নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আমি আপনাদেরই একজন। আমাকে বিশ্বাস করেন।

আমি মায়ের কাছে যেতে চাই। আপনি আমাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিন।

ঘরের ভেতর থেকে ভেঙে ভেঙে শব্দ আসে। কিছু শব্দ স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট। সব মিলিয়ে রাবেয়া বুঝে নেয়। আসলে বোঝার কিছু নেই। ও তো অনবরত এই একই কথা শুনে আসছে। সেই পঁচিশের রাত থেকে। মেয়েরা মায়ের কাছেই যেতে চায়। প্রথমে এই কথাটি বলে, একটা কিছু অস্ত্র পেলে এদের একটাকে শেষ করতে চাই। আমি কোথায় একটি অস্ত্র পাব?

ওদের কাছে এমন কথা শুনলে নিজের দিকে তাকায় রাবেয়া। ওর যুদ্ধ তো এদের নিয়ে। ও দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায়, লালু ডোমকে নিয়ে সেনা দুজন ফিরে আসছে। ওরা সাফিনার লাশ ফেলে দেওয়ার জন্য পায়ে রশি বেঁধে টেনে

নিয়ে যাবে। এর আগেও এভাবে লাশ সরানো হয়েছে। খুব কাছ থেকে দেখা দৃশ্য। সেনাদের একজন প্রথমেই বন্ধ ঘরের তালা খোলার জন্য দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। রাবেয়া দ্রুত সরে যায় দরজার কাছ থেকে। দরজা খোলা হচ্ছে দেখে খুশিও হয়। মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা হবে। দরজা খুলে দিয়ে সেনাসদস্য রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয় মেয়েগুলোকে বারান্দায় সারি করে দাঁড় করাতে। রাবেয়া বুঝে যায়, মরে যাওয়া মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এদের দেখাবে। বোঝাতে চায়, বেয়াদবির শাস্তি এমন। বাঁচতে চাইলে আর এমন করবে না।

লাশ নামানোর জন্য লালু ডোমকে হুকুম দেয় সেনা। লালুর সঙ্গে পরদেশী আছে। দুজনে মিলে লাশ নামায়। পায়ে দড়ি বাধে। তারপর টেনে নিয়ে যায়। মেয়েরা দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সারা শরীরে যন্ত্রণা। নির্যাতনের যন্ত্রণা। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ধপ করে বসে পড়ে। কান্নার রোল ওঠে। চাবুক হাতে ছুটে আসে সেনা। রাবেয়া ওর পা জড়িয়ে ধরে বলে, মেরো না। ওদের মেরো না। আমাকে মাররা। সেনা ওর পা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কষে লাথি দেয়। রাবেয়া দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে।

সাফিনার পায়ে দড়ি বেঁধে লাশ নিয়ে বের হয় লালু ডোম। দেখতে পায় রাবেয়াকে, তখনো কাত হয়ে পড়ে আছে। ওঠার চেষ্টা করছে না। ও ইচ্ছে। করেই টানার সময় সাফিনার হাত ওর মাথায় ঠেকায়। মাথা তোলে রাবেয়া।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে, ও যেন আমাকে কী বলে গেল রে?

তোমাকে উঠতে বলেছে। বলেছে, পড়ে থাকলে চলবে না।

আমি তো ওর জন্য কিছু করতে পারিনি।

ওকে যত্ন করেছ। ওর শরীর সাফ করেছ। ওর চুল বেঁধে দিয়েছ।

তোরা মন খুলে কথা বল, মেয়েরা। এখানে এখন আর কেউ নেই।

ওরা থাকলেই বা আমাদের কী? মারবে? মারুক।

মেয়েরা রাবেয়ার চারপাশে গোল হয়ে বসে।

যুদ্ধ বাধলে মেয়েদের এভাবে ধরে এনে শাস্তি দিতে হয়, খালা?

আমরা ওদের কী ক্ষতি করেছি, খালা?

তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন, খালা? তুমি চুপ করে আছ। কেন?

ওদের কাছে আমাদের একটাই অপরাধ।

কী? কী? কী? কী? কী? কী?

ওদের সবার মুখ থেকে কী ধ্বনি বের হতে থাকে।

বলো, আমাদের অপরাধ কী?

আমরা স্বাধীন দেশ চাই। বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!

কারও কারও পা বেয়ে তখন রক্ত গড়ায়। ভিজে যায় পায়জামা। স্যানিটারি ন্যাপকিন নেই ওদের জন্য।

একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার খুব কষ্ট। আমি আর পারি না। আমি মরে যেতে চাই।

তোকে পুরোনো কাপড় দেই? আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

না না, তোমার যেতে হবে না। ওগুলো দেখলে ওরা আমাকে মারবে। নীলুকে মেরে আধা মরা করেছিল।

রাবেয়া ঘাড় নাড়ে। ও জানে বিষয়টা। ও এটাও জানে যে ওর কিছু করার নেই। নীলু নিজেকে টেনে এনে রাবেয়ার মুখখামুখি হয়। খালা, তোমাকে বলেছিলাম আমাকে একটা ছুরি দিয়ে।

দেব। রাবেয়ার কঠিন স্বর মেয়েদের কানে বাজে।

দেবে? কবে? দেবে দেবে বলছ, আনছ না। তোমার কাছে ছুরি কেনার পয়সা নাই?

কালই দেব। শুধু তোকে একা না। সবাইকে একটা করে ছুরি দেব।

তাহলে আমি একটাকে শেষ করব। তারপর নিজে মরব। তাহলেই। আমার শান্তি হবে। আর কষ্ট থাকবে না।

তুমি আমার মাকে বলবে, নীলু আপনাকে খুবই ভালোবাসে। মরার আগে ও আপনার মুখ স্মরণ করেছে। বলবে তো, খালা? আরও বলবে, ও বলেছে যে আপনি যেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মনে করেন যে আপনার মেয়েটি যুদ্ধে জীবন দিয়েছে। ও কোনো অন্যায় করেনি। তুমি যাবে তো আমার মায়ের কাছে?

না। রাবেয়া অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

না কেন বললে? তুমি কি খুবই নিষ্ঠুর?

তুই যদি আমাকে নিষ্ঠুর মনে করিস, তাহলে আমি নিষ্ঠুর। আমি তোর মায়ের কাছে যাব না। মা জানুক যে একদিন মেয়েটা বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। মায়ের মনে এই

হারানোর ছবিটাই থাকুক। যুদ্ধের সময় এমন অনেক কিছুই ঘটে। মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে, খুন হয়েছে—এত কিছু তাকে আর জানানোর দরকার নাই। তাঁর বুকের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী?

প্রথমে সব মেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর একে একে ওরা বলে, আমাদের মায়েরা শান্তিতে থাকুক। আমাদের মায়েরা শান্তিতে থাকুক।

কয়েকটি কথামাত্র, কিন্তু গানের মতো ছড়ায়।

পরক্ষণে সেটা আর গানের মতো থাকে না। আর্তচিৎকার হয়ে ধ্বনিত হয়—মায়েদের ধোকা দেওয়া যাবে না। মায়েদের বুকের মধ্যে যন্ত্রণা পাথর হয়ে গেছে। বিশাল পাথর। ওই পাথর কেউ নাড়াতে পারবে না। দেশ স্বাধীন হলে পাথরটা একটু নড়বে মাত্র। কিন্তু থাকবে সারা জীবন। মৃত্যু পর্যন্ত।

গমগম করে পুলিশ লাইনের ব্যারাকের বারান্দা। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা মেয়েদের বুকের ভেতরও দম আটকানো পাথরখণ্ড পৃথিবীর যাবতীয় অনুভব আড়াল করে রেখেছে। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো চিত্র ওদের সামনে নেই।

তখন ওদের জন্য খাবার আসে। বালতিভর্তি ভাত আর ডাল। ক্যানটিনের লোকেরা খাবার রেখে চলে যাবে। ওদেরকে ভাত খাওয়াতে হবে রাবেয়ার। এখানে আসার পর থেকে ওরা শুধু ভাত আর ডাল খাচ্ছে। মাঝেমধ্যে মাছ বা মাংস আসে। কখনো তরকারি। তার পরও ওরা হাপুস-হাপুস খায়। যদি বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে তো ওদের খেতেই হবে।

ভাত-ডালের বালতি দেখে ওরা চোখ বড় করে বলে, খালা, ভাত এসেছে। আমরা এখানে বসেই ভাত খাব। খুব খিদে পেয়েছে।

ক্যানটিনের মকবুল আর জয়নালের দিকে তাকিয়ে রাবেয়া আবার বারান্দার রেলিংয়ে মাথা ঠেকায়। মাথা উঁচু করে রাখে। ওদের দেখবে না বলে ওর এই ভঙ্গি।

মকবুল দাঁত কিড়মিড় করে বলে, কী হলো তোমার, এমন করে বসে আছ যে? ওদেরকে ভাত দাও।

ভাতের যা ছিরি। এগুলো মানুষে খায়?

মানুষ খায় না। বেশ্যারা খায়। তুমিও একটা বেশ্যা।

শুয়োরের বাচ্চা, তোর মাথা আমি ফাটিয়ে ফেলব। বেশি বাড় বেড়েছে তোর!

বেশি কথা বললে অফিসারের কাছে তোর নামে নালিশ দেব। তখন বুঝবি ঠেলা।

তুই এখান থেকে যা, মকবুল। আমাকে রাগাস না। তুই ওদেরকে বেশ্যা বলেছিস। এর শোধ আমি উঠাব।

ছাতু করবি। ওদেরকে ভাত-ডাল দে। ওদের জন্য আমাদেরও বুক ভেঙে যায়। কিন্তু কিছু করতে পারি না। একদিন যে ভাগব এখান থেকে, তা-ও পারি না। বুড়া মা যে বিছানায় পড়ে আছে। দেখার তো কেউ নাই। আমি আর বউ ছাড়া।

মকবুলের কথা শুনে ওদের হাত থেমে থাকে।

খুরশিদা মৃদুস্বরে বলে, মকবুল ভাই, আমরা আপনার দুঃখ বুঝি। খাবার নিয়ে আসলে আপনি আমাদের দিকে তাকান না।

মকবুল নিজের চোখ মুছে বলে, আমি যাই। ক্যানটিনের ম্যানেজারকে বলব, কালকে আপনাদেরকে মুরগির মাংস দিতে।

আপনি বললে বকা খাবেন। দরকার নাই বলার।

সব শুয়োরের বাচ্চা। কোনো কোনো বাঙালি কুত্তা আছে ওদের সঙ্গে। ওগুলোও কম শয়তান না। আমি যাই।

মকবুল আর জয়নাল বালতি হাতে ওঠায়। দুজনেই বাম হাতে চোখ মোছে। যাবার আগে মৃদুস্বরে মকবুল বলে, যাই রে রাবেয়া বেশ্যা। রাতে আবার দেখা হবে। রাতে চিচিঙ্গা ভাজি দেবে। আর ডাল। আর বস্তাপচা চালের ভাত। এই বোনেরাও ওদের কাছে আলু। পচবে তো ফেলবে। ফ্রেশ থাকবে তো রাঁধবে।

চলে যায় দুজনে। ওদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। কারও হাত নড়ে না। দেখতে পায়, সিঁড়ির মাথায় গিয়ে ওরা পেছন ফিরে তাকায়। এবং নেমে যায়।

ওরা আবার নিজেদের জগতে ফিরে আসে। থালার মধ্যে হাত ধুয়ে কাছে রাখা বড় গামলায় পানি ফেলে। বারান্দাজুড়ে মুখরিত হয় সময়। নানাজনে নানা কথা বলে, দেখ দেখ, কতগুলো কাঁচা মরিচ দিয়েছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে।

দেখ দেখ, লেবুর টুকরোও দিয়েছে আজ। ডালের সঙ্গে লেবু চিপে ভাত খেলে খুব মজা লাগবে। কাঁচা মরিচ তো এখানে চোখেই দেখিনি। আজ দারুণ হবে খাওয়াটা।

মেয়েরা ততক্ষণে নিজেদের থালা ধুয়ে ভাত নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

রাবেয়া নীলুকে বলে, সবার থালায় তুই ভাত দে, নীলু। আজ আমি কিছু করতে পারব না।

নীলু হিহি করে হাসতে হাসতে বলে, মকবুল ভাই আমাদেরকে বেশ্যা বলেছে তো কী হয়েছে? আমরা কিছু মনে করি না। দেশের স্বাধীনতার জন্য বেশ্যা হতে আমার একটুও খারাপ লাগবে না, খালা। তুমি মন খারাপ করছ কেন? রোজকার মতো তুমিই সবার থালায় ভাত-ডাল দাও।

হিহি করে হাসে অন্য সবাই। মাথা দুলিয়ে বলে, আমরা কিছু মনে করি, আমরা কিছু মনে করি না। ভাত-ডাল চাই। ভাত-ডাল চাই। কাঁচা মরিচলেবু চাই।

ওদের দিকে তাকাতে পারে না রাবেয়া। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের প্রাঙ্গণজুড়ে অন্ধকার নেমে আসে ওর সামনে। পরক্ষণে ওর মাথায় টুং করে শব্দ হয়। বুঝতে পারে, মকবুল ওর রাগের কথা বলেছে। বেশ্যা বলে ও নিজের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছে। আজকের কাঁচা মরিচ আর লেবুর ব্যবস্থা ও করেছে। ক্যানটিন থেকে আনেনি। ক্যানটিন থেকে এসব দেওয়া হয় না মেয়েদের। ওর সামনে থেকে অন্ধকার কাটে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাকের বারান্দা আলোয় ভরে যায়।

তখন সকলের অজান্তে ঝুলিয়ে রাখা আরেকটি মেয়ে মারা যায়। ও নিজের কথা নিজেই বলতে থাকে, আমি মরে গেছি। এই মৃত্যু আমার শান্তি। যে নির্যাতন আমার শরীরের ওপর দিয়ে গেছে, তা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য থাকুক। যেদিন দেশ স্বাধীন হবে, সেদিনও আমি বলব, আজ আমার শান্তি। আমার মৃত্যু স্বাধীনতার জন্য। শান্তি শান্তি।

আমার বাবা-মাও স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। আমার বড় ভাই শাকেরকে ধরার জন্য সেদিন গভীর রাতে ওরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমার বড় ভাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় মিছিল-মিটিংয়ে থাকত। ও একজন ভালো বক্তাও ছিল। তার ভারী কন্ঠস্বরে গমগম করত এলাকা। আমিও রাজপথে থেকেছি। স্লোগানে স্লোগানে মাতিয়ে মিছিলের সঙ্গে হেঁটেছি কতটা পথ। আমি জানি না, পথটা কী ছিল। আমি জানতাম, পথটা জয় করতে হাঁটতে হবে। আমাদের কারোরই সেই হাঁটায় ক্লান্তি ছিল না। আমাদের জীবনে সেই সময় অবিশ্বাস্য এক আশ্চর্য দিনের সমষ্টি ছিল।

যেদিন ওরা আমাদের বাড়িতে তাণ্ডব ঘটাল, সেদিন রাত দশটার দিকে আমার ভাই শাকের বাড়িতে এসে বলল, মা, ভাত দাও। এক্ষুনি। ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়ব। হাতে সময় খুব কম। ও কোথায় যাবে—মা ওকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করারও সুযোগ পাননি।

তারপর ছোট্ট একটা ব্যাগে দুটো কাপড় ঢুকিয়ে নিল। খেতে বসে বলল, আব্বা, ইয়াহিয়া খান চলে গেছে। মনে হয়, আজ ওরা একটা কিছু ঘটাবে। আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। যদি পারতাম, জেনিফারকেও নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি যেখানে যাব, সেখানে ওকে নিতে পারব না। তা ছাড়া পরবর্তী পরিস্থিতি কী হবে, তা আমরা জানি না। ও আপনাদের সঙ্গেই থাকুক, আম্মা। ওকে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই।

ও আব্বাকে বলে, আপনারাও ঢাকায় থাকবেন না। প্রথমে কেরানীগঞ্জে চলে যাবেন। তারপরে অবস্থা বুঝে ইন্ডিয়ায়। কুমিল্লার বর্ডার দিয়ে যাবেন। আমিও এমন পরিকল্পনা করেছি। আমাদের সঙ্গের সব ছেলে তা-ই করবে। আমরা একদল একসঙ্গে সীমান্ত পার হব।

আম্মা প্রথমে বিষণ্ন হয়ে পরে উৎসাহ নিয়ে বলেছিলেন, তাহলে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল?

বোধ হয় হয়েই গেল, আম্মা। বঙ্গবন্ধু কী বলেন আমরা সেই অপেক্ষায় থাকব।

আব্বা তখন বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তো বলেই দিয়েছেন—ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; আমার মনে হচ্ছে। আমি এই বাড়িটাকে দুর্গ বানাব। আমি কোথাও যাব না, শাকের।

আব্বার কথার দৃঢ়তায় ভাইয়া উজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে বলেছিল, আব্বা, আপনি আমার সাহস দ্বিগুণ করে দিলেন। বাড়িটা দুর্গ হলে জেনিফারও আপনাকে সাহায্য করবে।

তারপর দ্রুত ভাত খাওয়া শেষ করেছিল শাকের ভাই। রাত এগারোটার দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলেছিল, আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, আম্মা। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন।

আম্মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। চোখের পানিতে ভিজিয়েছিলেন ওর মাথা।

আব্বা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, সামনের দিকে যাও, বাবা। পেছন ফিরে তাকিয়ো না।

ও আব্বা-আম্মার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ছোট ভাইদের মাথায় হাত দিয়ে আদর করে। আর আমাকে বলেছিল, সাহস নিয়ে থাকবি। মৃত্যুকেই বড় করে দেখবি। ভয়কে না।

আমি আমার ভাইকে বলেছিলাম, আমারও যুদ্ধ আছে, ভাইয়া। তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমার যুদ্ধ আমি আমার মতো করে করব। ফিরে এসে বলবে, তুই এত কিছু পেরেছিস! আয়, তোকে স্যালুট করি।

তারপর মধ্যরাতে তাণ্ডব ঘটিয়েছিল ওরা।

তিনজন বাড়িতে ঢুকেছিল। দরজায় লাথি দিতে থাকলে দরজা খুলে দিয়েছিলেন আব্বা। আব্বার বুকের ওপর রাইফেল ধরে বলেছিল, গাদ্দার।

আম্মা আর আমি আব্বার পেছনেই ছিলাম। একজন এসে আমার হাত ধরে টেনে বলেছিল, বহুত আচ্ছা। খুব সুরত। তারপর ওদের দলের অন্যদের কাছে নিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। একজন শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরেছিল। তখন আব্বার বুকের ওপর রাইফেল ধরে রাখা সেপাই ট্রিগার টিপে দেয়। পড়ে যান আব্বা। আম্মা আব্বাকে ধরতে গেলে আম্মাকেও গুলি করে। আমার পাঁচ বছরের ভাইটিকে বুটের নিচে চেপে রাখে। আমি তাকিয়ে ওর যন্ত্রণা দেখি আর চিৎকার শুনি। হা-হা করে হাসতে থাকে সেপাইটি। ওর বুটের নিচে থেঁতলাতে থাকে ভাইটি। ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ওর শরীর নিথর হয়ে যায়। বাকি থাকি আমি আর আমার দশ বছর বয়সী ভাইটি। ও হাত বাড়িয়ে আমার কাছে আসার জন্য কাঁদছিল। আমি সেপাইটির হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি। তারপর মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে থুতু ছিটাই।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে হা-হা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দেয়। দেখতে পাই, তিনটি হাত একসঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে আসে। একজন চুল ধরে। অন্য দুজন দুই হাত।

তিনজনে জোরে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ছুড়ে মারে দরজার দিকে। আমি দরজার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। চৌকাঠে লেগে আমার কপাল ফেটে রক্ত বের হয়। আমি জ্ঞান হারাইনি। শুনতে পাই, আমার ভাইয়ের আর্তচিৎকার। মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার ভাইটিকে ধরে আছড়াচ্ছে। তিনজনে মিলে বুটের নিচে পিষছে। আমি ওদের একজনের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলি, ওকে একটা গুলি দিন। মাত্র একটা গুলি। এভাবে ওকে মারবেন না।

ওরা আমাকে চুল ধরে টেনে তোলে। তার পরে গাড়িতে ওঠায়। এর পরের বর্ণনা করার সাধ্যি আমার নেই। তখন আমি মৃত্যুর মুখে। জানি, বাঁচব না। আমার ভাইয়ের জন্য একটা চিঠি লিখেছি। রাবেয়া খালাকে দিয়েছি। এই শহরের কোনো দুর্গবাড়ি যদি খালা চেনে, তবে সেখানে পৌঁছে দেবে। বিদায়, তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায়—এই পুলিশ লাইনের বন্দী খাচায় তোমরা যারা আছ, তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায়।

জেনিফারের লাশের দিকে তাকিয়ে লালু ডোম বলে, এই লাশ আমি নামাতে পারব না। তুই নামা, রাবেয়া।

আমি তো নামাতেই পারব। আমি সব পারি।

রাবেয়া দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আবার বলে, এত কিছু দেখেও চাকরি করছি। মাস গেলে মাইনে নিচ্ছি। মাইনের টাকা দিয়ে ভাত গিলছি। আমি কী না পারি? আমি তো সব পারি!

তারপর চোখে আঁচল চাপা দেয়। চোখ মুছে বলে, তুই ওকে নামা, লালু। পায়ে দড়ি আমি বেঁধে দেব। দড়ি ধরে টেনে ভ্যানেও তুলে দেব। ফেলবি কোথায়?

কোথায় আবার ফেলব? জানিস না, ভাগাড়ে। তোকে না এক শ বার বলি যে, লাশ ভাগাড়ে ফেলি। আবার জিজ্ঞেস করিস কেন? বারবার জিজ্ঞেস করে তোর সুখটা কী, বল তো?

মাটিচাপা দিতে পারিস না?

না, পারি না। হুকুম নাই।

তুই আমার সঙ্গে মেজাজ করবি না, লালু।

তুইও আমার সঙ্গে মেজাজ করছিস।

লালু দুহাতে চোখ মোছে।

কোথাও যেতে পারি না কি সাধে? আমরা না থাকলে ওদের দেখবে কে? এই জ্যান্ত এবং মরা মেয়েদের! ভগবান, আমার মরণ দাও।

কথা শেষে আবার চোখ মোছে লালু। এবার মুখ দিয়ে শব্দও বের হয়।

রাবেয়া বারান্দার মাথার দিকে তাকায়। না, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লালুর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, কাঁদিস না, লালু। তোকে কাঁদতে দেখলে এসে লাথি মারবে। আমাকেও মারবে। তোর মতো আমিও বলি, লাথি খেয়ে মরে গেলে মেয়েগুলোকে দেখবে কে?

আমাকে মারুক। এদের জন্য কেঁদে আমি হাজার বার লাথি খেতে পারি। তুই আমাকে শয়তানদের লাথির হাত থেকে বাঁচাতে পারবি না, রাবেয়া। আমার হাড়ি শক্ত আছে। ওদের লাথিতে ভাঙবে না।

তখন দুজন বেদনায় আপ্লুত হয়ে কাঁদে। দুজনের মনে হয়, স্বাধীনতা অনেক বড় কাজ। লাভ করা খুব কষ্টের। ওরা বুঝতে পারে, এই কষ্টের মধ্যে গৌরব আছে। এই মেয়েগুলো শুধু শুধু কষ্ট সহ্য করছে না।

দুপুরের সময় পরদেশীর সঙ্গে রাবেয়ার দেখা হয়। পরদেশী তিন দিন কাজে আসেনি। ওর জ্বর হয়েছিল। ড্রেন পরিষ্কার করতে করতে ওদের যে কথা হয়, সেটুকুই কাজের ফাঁক। আজও রাবেয়া ড্রেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরদেশী মাথা তুলে বলে, খোঁড়াচ্ছিস কেন? পায়ে কী হয়েছে?

লাথি।

আবার?

আবার তো হবেই, ধরে নিয়েছি। লাথি না দিলে ওদের পায়ের সুখ মেটে। যা দেখেছি তার সবকিছু তো বুকের ভেতর ধরে রাখতে পারি না। দুচার কথা বেরিয়ে যায়। কথা বের না হলে নিজেরই দম আটকে আসে।

ড্রেনে নামবি? নাকি ওপরে কাজ আছে?

ড্রেনে নামব। রাবেয়া বগলে ধরে রাখা ঝাড় মাটিতে নামিয়ে রাখে। পরদেশী হাত বাড়ালে ওর হাত ধরে নিচে নামে। কোমরে গোঁজা আছে জেনিফারের চিঠি। সেখানে হাত রেখে বলে, যে মেয়েটির লাশ গেল আজ, ওর একটা চিঠি আছে আমার কোমরে।

চিঠি! আবার চিঠি?

হ্যাঁ রে, ওরা চিঠি লেখে বলেই তো মনে হয় যুদ্ধের কথা লেখা হচ্ছে। নইলে এখানে ওদের জীবনে কী ঘটছে, তার কথা কে জানবে? বাইরের কেউ তো এই সব নির্যাতনের কথা জানতে পারবে না।

ঠিক বলেছিস। রাবেয়া, তুই ওপরে ওঠ।

ড্রেন সাফ করব না?

এই পবিত্র চিঠি নিয়ে তোকে ড্রেন সাফ করতে হবে না। তুই ওপরে উঠে ওই কোনায় গিয়ে বসে থাক। ড্রেন আমি একাই সাফ করব। ধর, আমার হাত ধর।

পরদেশীর হাত ধরে রাবেয়া আবার ওপরে ওঠে। বিল্ডিংয়ের আড়ালে গিয়ে বসে। খানিক স্বস্তি পায়। মনে হয়, পায়ের ব্যথা কমে গেছে। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোমরে গুঁজে রাখা চিঠির ভাষা উড়ে আসে ওর কাছে—পরদেশীর কাছে। লালু, রোহিত, প্রেমলাল এমন আরও কয়েকজন কর্মরত সুইপারের কাছে।

প্রিয় শাকের ভাইয়া, আমি জানি না এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছাবে কি। তবু লিখছি তোমাকে। স্বাধীনতার পরে তুমি যখন দেশে ফিরবে তখন দেখবে, যে বাড়ি থেকে তুমি যুদ্ধ করতে বের হয়ে গিয়েছিলে, সেই বাড়িতে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। আমাদের আব্বা একটি দুর্গবাড়ি গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তাকে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে হয়েছে। আমার আম্মাও সেনাদের গুলিতে জীবন দিয়েছেন। আমাদের দুই ভাইও। তাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

আব্বা-আম্মা-ভাইদের মৃত্যু আমার চোখের সামনে হয়েছে, ভাইয়া। আমার বুকভাঙা কান্না আমি থামাতে পারিনি। ওরা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখনো আমি নিজের কথা মনে করিনি। আমার চোখের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য স্থির হয়ে ছিল। দেখেছি গুলিবিদ্ধ আব্বার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেই রক্তের স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে ঘরে। দেখেছি আম্মার বুলেটবিদ্ধ শরীর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। দেখেছি ছোট দুই ভাইয়ের তেলানো শরীর। স্বাধীনতার জন্য যা কিছু করার, তার সবটুকু আমরা করেছি, ভাইয়া। এখন আমি মৃত্যুর মুখোমুখি। আর হয়তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র বা এক-দুই দিন। তারপর চোখের পাতা বুজব।

যেদিন তুমি রাইফেল কাঁধে নিয়ে জয় বাংলা বলতে বলতে ঢাকায় আসবে, সেদিন আমরা অদৃশ্যে থেকে বলব—জয় বাংলা। আমাদের দুঃখ থাকবে না, কান্না থাকবে না। আমি জানি, আমাদের আব্বা বলবেন, আমাদের জীবনদান সার্থক হয়েছে। ছেলেরা বিজয়ের বেশে ঘরে ফিরেছে। আমি বলব, শান্তি শান্তি। আমার মৃত্যু স্বাধীনতার জন্য। আমার কোনো দুঃখ নাই। যুদ্ধের সময়ে আমার শরীর তো স্বাধীনতার জন্যই বরাদ্দ ছিল।

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে রাবেয়া। মনে হয় একটুখানি ঝিম ধরেছিল। কে যেন ওকে কোথায় যাওয়ার জন্য ডেকেছিল। ও যেতে পারেনি। তাকিয়ে দেখে, পরদেশী তখনো ড্রেনের ভেতরে। ওর কাজ শেষ হয়নি। একবার মাথা তুলে চারদিকে তাকায়। আবার মাথা নিচু করে। আবার মাথা ওঠায়। ওকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। ও যেন কোনো কিছু শোনার জন্য কান পাতছে, কিংবা শুনতে পাচ্ছে না বলে শোনার চেষ্টা করছে। ও বুঝি কাজের মাঝে স্বস্তি পাচ্ছে না। ওকে কোথাও যেতে হবে, এমন ভাবনা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর মুখজুড়ে প্রবল ঘাম জমে আছে। ও হাত উঠিয়ে মোছার চেষ্টা করে না।

রাবেয়া দূর থেকে ওকে ডাকে। প্রথমে হাত ইশারায় ডাকে। পরে গলা উঁচু করে ডাকে।

পরদেশী, উঠে আয়।

পরদেশী রাবেয়ার ডাক শুনে চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ থমকে থেকে চারদিকে তাকায়। তারপর দুহাতে মুখের ঘাম মুছে তারপর ঝাড় ফেলে উঠে আসে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, তুই কি আমাকে ডেকেছিলি? কয়বার ডেকেছিলি? একবার না অনেকবার?

এই তো, এখনই তো ডাকলাম। একবারই ডেকেছি। তুই তো এক ডাকেই আমার দিকে তাকালি।

আরও আগে ডাকিনি?

না, আমি ডাকিনি। ওই দিকে চেঁচামেচি করছে পুলিশ। হয়তো ওটাই তোর কানে গেছে।

ওদের চেঁচামেচি আমার বুকের ভেতর ঢুকবে না। ওদের খুচরো কথা আমার কানে বাড়ি খেয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কেউ ডেকেছে মনে হলে আমার মাথা, বুক নিঃসাড় হয়ে যায়। কোথায় যেন যেতে বলেছিল আমাকে, কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। কী যে হলো আমার, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তুই বস। তোর জন্য আমি ডালপুরি নিয়ে আসি। একটু কিছু খেলে তোর ভালো লাগবে।

চিঠিটা আছে তো?

রাবেয়া কোমরে হাত রেখে বলে, আছে।

ও পা টানতে টানতে ক্যানটিনে যায়। চা-ডালপুরি নিয়ে ফিরে এলে দুজনে হাত-পা ছড়িয়ে চা খায়। ভাবে, এইটুকু সময়ের সঞ্চয়। শুধু ব্যক্তিগত। বাকি সময় ওদের একার থাকে না। পুরোটা সময় ওরা দিয়ে রাখে দেশের জন্য। ওরা মনে করে, এটুকু ওদের স্বাধীনতার জন্য দেওয়া। এটাই ওদের যুদ্ধ।

চা শেষ করে পরদেশী জিজ্ঞেস করে, ও চিঠিটা কখন লিখল, রাবেয়া?

যখন ওকে দুবার ঝুলিয়ে নামাল, তখন। ও বুঝেছিল, শরীর আর চলছে। আমাকে বলল, খালা, আমাকে কাগজ-পেনসিল জোগাড় করে দে। আমি একটা চিঠি লিখব।

তারপর দুদিন পরে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরল এক দিন পরে। ডাক্তারকে বললাম ওকে একটু দেখতে। হারামির বাচ্চা দেখল না। উল্টো আমাকে বলল, তুই আমাকে জ্বালাস না, রাবেয়া।

আমি বললাম, ওষুধ-বড়ি একটু দে। ওর যন্ত্রণা কমুক। উঠে বসতে পারুক। হারামির বাচ্চা বলল, উঠে বসে কী করবে? মরলেই তো পারে। ওদেরকে মরতে বল, হাজারে হাজারে মরুক। হারামির বাচ্চার কথা শুনে আমার শরীর জ্বলে যায়। আমি চিৎকার করে বলি, তুই কী বললি, ডাক্তার!

ডাক্তার তখন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। আমাকে আর কিছু বলল না। আমি আর কী করব! কাঁদতে কাঁদতে ওর কাছে ব্যারাকে ফিরে গেলাম। ওর চোখ-মুখ মুছে দিলাম। গামছা ভিজিয়ে শরীর মুছে দিলাম। ও চোখ খুলেই বলল, কাগজ-পেনসিল জোগাড় হয়েছে রে?

আমি বললাম, হয়েছে। ডাক্তারের টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ডাক্তার কিছু বলেনি।

আমাকে দে, খালা। একটা চিঠি না লিখে আমি মরতে চাই না। একদিন আমার এই চিঠি হাজার চিঠি হয়ে আকাশে উড়বে।

ওর মুখ দেখে মনে হলো, ও বুঝি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। এই মৃত্যুপুরীতে এটাই ছিল ওর খুশির ঝিলিক। পরদেশী, তুই যদি ওকে দেখতি, বুঝতি দুঃখের খুশি কেমন অন্য রকম। আহারে, সোনার ময়না পাখিরা রাবেয়ার কন্ঠ ধরে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। পরদেশীর মুখেও কথা নেই। ওদের মনে হয়, এই পুলিশ লাইনের দালান, প্রাঙ্গণ, গাছগাছালিও স্তব্ধ হয়ে আছে। এত অন্যায় সহ্য করতে পারছে না।

নীরবতা ভাঙে রাবেয়া। বলে, তুই আমাকে একটা কথা বল, পরদেশী।

বল, কী বলবি? ডাক্তারের কথা? রাবেয়া, আমার মনে হয় ডাক্তারের মনেও কষ্ট আছে। ওই বেটা বাঙালি না? নইলে মুখ ঢেকে বসে থাকবে কেন? তুই ওকে গালি দিস না, রাবেয়া। আমি একদিন জ্বরের ওষুধ আনতে গিয়ে ডাক্তারকে মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করব। দেখি, কী বলে। তবে তাকে আবার

একা পেতে হবে।

পরদেশীর কথায় মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে রাবেয়া। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমি তোকে যা বলতে চেয়েছিলাম, তা কিন্তু ডাক্তারের কথা না রে।

তাহলে কী, বল?

জেনিফার আমাকে যে চিঠিটা দিল, এই চিঠি আমি কাকে পৌঁছাব? ও তো বলল ওর কেউ নাই।

কাকে? পরদেশী দুহাতে চুল চেপে ধরে।

ও আমাকে ঠিকানা দেয়নি। ও কার ঠিকানা দেবে? ও তো আমাকে সব কথা বলেছে।

আমাকে ভাবতে দে, রাবেয়া। ভেবে ঠিক করব যে কী করা যায়। তুই তোর মতো ভেবে দেখ। আমি কাজে গেলাম। বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে দেখলে আবার ছুটে আসবে শয়তানগুলো। ছাড়বে না।

দ্বিতীয় দিনের মাথায় আবার একটি মৃত্যু ঘটে।

ওর নাম রুশনি।

এক দিনে চারজন ওকে ধর্ষণ করার পরে ও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বাইশ দিন ধরে মেঝেতে পড়ে ছিল। ঠিকমতো খায়নি। চোখ খোলেনি। শুধু এপাশ-ওপাশ গড়িয়েছে। আর গুঙিয়েছে।

ও সবাইকে বলেছে, ও বস্তির মেয়ে। বাবুপুরা বস্তিতে ওদের বাড়ি ছিল। আগুনে পুড়ে যায়। আর গুলিতে মারা যায় বাবা-মা-ভাইবোন সবাই। শুধু ওকে ওরা আলাদা করে গাড়িতে উঠিয়ে এইখানে এনেছে।

কিন্তু ওর কথা শুনে রাবেয়ার মনে হয়েছে, ও বস্তির মেয়ে নয়। ও যেন অনেক কিছু লুকাচ্ছে।

একদিন ফিসফিসিয়ে রাবেয়াকে বলেছিল, খালা, আমার মৃত্যুর খবর কাউকে দিয়ো না। ওরা আমাকে ভাগাড়ে ফেলে দিলে শেয়াল-কুকুরে খাবে আমাকে। আমি এতেই খুশি। স্বাধীনতার জন্য এর চেয়ে বেশি আমার করার নেই, খালা।

তোমার বাড়ি কোন এলাকায়?

কেন জিজ্ঞেস করছ? বলেছি না বাবুপুরা বস্তি। আগুনে পুড়ে গেছে। আমাদের বাড়ি। সেদিন মধ্যরাতে দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠেছিল বস্তিতে। কী ভয়াবহ মাগো...।

বলতে বলতে ও কুঁকড়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান হারিয়েছিল। ওকে দেখে রাবেয়ার মনে হয়েছিল, ও রাবেয়ার ছোটবেলার কুড়ানো শিউলি ফুল। শরীর ওর ফুলের সাদা রঙের পাপড়ি। স্নিগ্ধ আর পবিত্র। মুখটা কমলা বোটার রং নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর। কেবলই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।

এই বাইশ দিন ধরে মেয়েরা সবাই মিলে ওকে দেখেছে। এখন ওর চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। ওরা দেখেছে কীভাবে মৃত্যু হয়। দেখেছে চোখের পাতা বুজে যায়। ঠোঁটের কাঁপুনি থেমে যায়। হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা থেমে যায়। শ্বাস-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বুকের ধুকপুক শব্দ আর হয় না। এবং গায়ে হাত দিলে বোঝা যায়, শরীরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে যায়। মেয়েরা ভেবেছিল, ওড়না দিয়ে মুখটা ঢেকে দেবে, কিন্তু ঢাকেনি। শিউলি ফুলের মতো মুখটা ঢেকে রাখতে মন চায়নি, ওদের মৃত্যু ওর ফুলের সৌরভ মুছে দেয়নি।

রাবেয়াকে খবর দেওয়া হয়েছে। রাবেয়া এলে বলবে কী করা হবে। রাবেয়া জানে, মেয়েটি বলবে, আমার মৃত্যুর খবর দিয়ে আমি কাউকে কাঁদতে দিতে চাই না। যুদ্ধের জন্য শক্তি দরকার। কেঁদেকেটে শক্তি ক্ষয় করার দরকার নেই।

ও তো যখনই অজ্ঞান হয়েছে, তার পরে জ্ঞান ফিরলে এমন কথাই বলত। ও বলত, আমি একটা একা মেয়ে। একা পৃথিবীতে এসেছি। আমার সঙ্গে দু-চার পাঁচজন ছিল না। তাই একাই আমি হারিয়ে যেতে চাই। সবাই জানুক আমি হারিয়ে গিয়েছি। ব্যস, সব শেষ। তোমরা আমার জন্য চোখের পানি ফেললা না।

ওর এসব কথা শুনে রাবেয়া বুঝেছে, ও বস্তির মেয়ে না। ওর ভেতরে বুদ্ধির সাড়া আছে। ওর পড়ালেখার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেছে, আমি তো স্কুলে যাইনি। মানুষের বাসায় কাজ করেছি। বাবা রিকশা চালাত। মা ইটভাটায় কাজ করত। অনেক ভাইবোনের সংসার ছিল। সব ভাইবোনই কোনো-না-কোনো কাজে ঢুকে গিয়েছিল। আমাদের কোনো দুঃখ ছিল না। আমরা হাসিমুখে ডাল-ভাত খেতাম। এখন মরতে আমার দুঃখ নাই।

কত অবলীলায় ও এসব কথা বলত। ওর মুখ দেখে মনে হতো না যে, ও মিথ্যা কথা বলছে। আশ্চর্য মেয়ে, সবকিছু থেকে নিজেকে আড়াল করে আজ

ওর বিদায়ের দিন।

রাবেয়া ঘরে ঢুকতেই পাশে বসে থাকা মেয়েরা কান্নার শব্দ করতেই রাবেয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, চুপ। ও না মানা করেছে কাঁদতে।

ও মানা করলে আমাদের শুনতে হবে?

থমকে যায় রাবেয়া। তাই তো! ও বললেই তা শুনতে হবে? আর এই তিন মাস যে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে নির্যাতিত হওয়া, একসঙ্গে মৃত্যু দেখা, একসঙ্গে একটা ছুরি হাতে

পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা—এত কিছু ভাগাভাগি করার পরও ও ওদের কেউ না? তা হতে পারে না। ও আমাদের কেউ। আমাদের একজন। আমাদের স্বজন।

খালা।

একজনের কন্ঠ। রাবেয়া তার ডাকে ঘুরে তাকায় না। যেখান থেকেই ডাকুক তার সবটুকু তো ও শুনতেই পায়। শুধু বলে, কী বলবি, বল। বেশি কথা বলবি না কিন্তু।

আমরা ওর জন্য দোয়া পড়ব না?

পড়বি। পড়। দোয়া পড়তে তো মানা নেই।

একজন ক্ষিপ্ত কন্ঠে বলে, কেমন করে দোয়া পড়ব? তুমি আমাদের নাপাক শরীর পাক করে দাও। আমাদের দম যে আটকে আসছে।

রাবেয়া কথা বলে না। রাবেয়া জানে, এখানে এসব কিছু হবে না। সেই সুযোগই এই মেয়েদের দেওয়া হবে না। বাথরুমে যথেষ্ট পানি নেই। একসঙ্গে ওদের গোসল হবে না। এসব চিন্তার সুযোগ নেই। রাবেয়া কথা বলতে পারে না।

খালা।

আর একজনের কন্ঠস্বর।

বল।

আমরা চাই না ওর লাশ পায়ে দড়ি বেঁধে বারান্দা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক। আমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে ভ্যানে তুলে দিয়ে আসব।

রাবেয়া জানে, এটা হবে না। তাই চুপ করে থাকে। মৃত্যুর খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছে অফিসে। একটু পরে ডোমরা আসবে লাশ বের করতে।

অন্যদের মতো ওকেও পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

খালা।

আর একজনের কন্ঠস্বর।

বল।

তুমি কি আমাদের ভোম দাদাদের একটা কথা বলবে?

কী কথা? ডোম দাদারা কি তোদের কথা রাখতে পারবে?

এটা তো একটা সহজ কথা। রাখতে পারবে না কেন? ডোম দাদারা যেন ওকে ভাগাড়ে না ফেলে কোথাও পুঁতে রেখে আসে।

ঠিক আছে, বলে দেখব। তবে আমি তো জানি, ওরা তোদের কথা রাখতে পারবে না।

আমরা সবাই ডোম দাদাদের পায়ে ধরব।

খবরদার, এমন কাজ করতে যাস না। খবরদার না। তাহলে ওরা মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

কেন? কেন মাথা ঘোরাবে দাদাদের?

ডোম দাদারা তোদেরকে দেবীর মতো সম্মান করে। তোদেরকে মাঠাকরুন বলে। মা-ঠাকরুন কি সন্তানের পায়ে হাত দেয়?

মেয়েরা চুপ করে থাকে। হঠাৎ বাইরে গোলাগুলির শব্দ হলে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। মরদেহ সামনে নিয়ে বসে থাকা মেয়েরা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। রাবেয়া নিজেও জানে না, কেন গোলাগুলি হচ্ছে? মুক্তিযোদ্ধারা কি পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে? এমন সুদিন কি হয়েছে?

অল্পক্ষণে গোলাগুলি থেমেও যায়। আরও কিছুক্ষণ পর ডোম নিয়ে সেনারা আসে। মেয়েরা ঘরের কোণে জড়ো হয়ে গুটিসুটি হয়ে থাকে। লাশের পায়ে দড়ি বাঁধা হয়। টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মেয়েরা স্তব্ধ হয়ে থাকে। ডোম দাদাদের বলা হয় না যে, ওকে একটু মাটির নিচে জায়গা দিয়ো। ওরা যদি ডোমদের মা-ঠাকরুন হয়, তাহলে সব কি সন্তানদের বলতে পারে না? পারে, হুকুম দিতেও পারে। নিজেদের বুকের যন্ত্রণা কাটাতে গিয়ে ওদের চোখ জলে ভরে থাকে।

বেলা বাড়লে রাবেয়ার মনে হয়, মেয়েটি চিঠি লেখেনি। ওর ঠিকানাও নেই। তাহলে ও কি হারানো মানুষের তালিকায় থাকবে? নাকি ওর জন্য আর কিছু ভাবতে হবে? ও গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ভাবে, আর কত দিন ও এমন গালে হাত দিয়ে বসে ভাববে যে, কবে এই মেয়েদের আসা-যাওয়ার হিসাব শেষ হবে? কবে এদের মরদেহের হিসাব রাখা শেষ হবে? ঘরে গিয়ে রুশনির নাম আর মৃত্যুর তারিখ লিখবে নিজের ছোট খাতায়। রোহিত ডোমকে দিয়ে ছোট এই খাতাটা কিনে আনিয়েছিল এখানকার দশজনের মৃত্যুর পর। রুশনির নাম লিখলে তার সংখ্যা হবে তেতাল্লিশ।

জড়ো হয়ে থাকা মেয়েরা আলাদা হয়। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। রাবেয়ার মুখখামুখি হয়ে তিন-চারজন একসঙ্গে ডাকে, খালা।

ও কারও দিকে না তাকিয়ে বলে, বল। তোদের মনে যত কথা আছে তার সব বলে ফেল।

আমরাও মরণ চাই। বিষ দাও। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, আমরা বিষ খাব।

রাবেয়া চোখ গরম করে বলে, বিষ! তোদের জন্য তো আমি ছুরি এনে রেখেছি। প্রথমে ওদের পেটে ঢুকাবি। পরে নিজের পেটে। পারবি না?

পারব তো। তুমি তো ছুরি দাও না। এনে রেখেছ বলছ। কিন্তু আমাদেরকে দাও না।

পরদেশীকে দিয়ে ছুরি আনিয়েছি। ওটা ড্রেনের ভেতরে মাটিতে গেঁথে রেখেছি। তোরা একটি ছুরি দিয়ে একজনকে মারবি। ওরা ব্রাশফায়ার করে মারবে দুই শ জনকে। সুইপার-ডোমদেরও ছাড়বে না। বল, আমি কী করব?

আমাদেরকে ছুরি দাও। তোমাকে আমাদের একটাই কথা। ছুরি দাও। শুধু শুধু মরব কেন? মেরে মরব। জীবনের দাম অনেক। সেই জীবন বৃথা যাবে না।

ঘরের সব মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। ঘন হয়ে বসে। পরস্পর হাত ধরে। কেউ কেউ রাবেয়ার গা ঘেঁষে বসে। রাবেয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোরা এভাবে মরতে চাস?

চাই। এক শ বার চাই। হাজার বার চাই।

আমরা তো ইচ্ছা করে এখানে আসিনি। আমাদেরকে জোর করে আনা হয়েছে। জোর করে আনার প্রতিশোধ আমরা নেব।

আমাদের স্বাধীনতা চাওয়ার জন্য এটা আমাদের শাস্তি।

ওদের নির্যাতন সহ্য না করে আমরা স্বাধীনতার জন্য মরতে চাই।

মৃত্যুই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে মরব না কেন?

তখন ব্যারাকের সামনে সশব্দে গাড়ি থামে। সিঁড়িতে বুটের দুপদাপ শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে মেয়েদের আর্তচিৎকার। দশ-বারো জন মেয়েকে টেনেহিচড়ে হেডকোয়ার্টারের দোতলায় ওঠানো হচ্ছে। ওরা হাত-পা ছুড়ছে, চিৎকার করছে। রাবেয়া বারান্দায় এসে

দাঁড়ালে দেখতে পায়, ওদেরকে পশ্চিম দিকের একটি ঘরে ঢোকানো হচ্ছে। ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা দেওয়া হয় ঘরে।

তারপর ইশারায় রাবেয়াকে খেয়াল রাখার কথা বলে নেমে যায় ওরা। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, দূরে দাঁড়িয়ে আছে পরদেশী। অন্য একদিকে লালু ডোম। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা। তারা আবার অল্পক্ষণে সরে যায়। জানে, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পিটুনি খাবে। রাবেয়াও থামের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখে। মাথা ঠেকিয়ে রাখে থামের গায়ে। দুহাত পেছনে মুষ্ঠিবদ্ধ করে রাখে।

বিকেলে পরদেশী রাবেয়াকে বলে, আমি ঠিক করেছি, জেনিফারের চিঠিটা আমি হাটখোলার বাড়িতে পৌঁছে দেব। জেবুন্নেসার চিঠিটা যে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেই বাড়িতে।

ওখানে কেন দিবি?

ভেবে দেখলাম, ওদের খবরগুলো এক জায়গায় একটা বাড়িতে জমা থাকুক।

ঠিক বলেছিস। তাহলে কালকে যা।

কাল কেন? আজই যাব।

কতজন এই পুলিশ লাইনে মারা গেছে, কতজনকে ধরে আনা হয়েছে, তার একটা খাতা আমার কাছে আছে না? আমি সেই খাতাও ওদের কাছে দিতে চাই। একদিন এসব কথা বলতে হবে না, পরদেশী?

দেশ স্বাধীন হলে তো বলতেই হবে। আমরা তো এই যুদ্ধের সাক্ষী। জেনিফারের চিঠিটা কই?

এইখানে। রাবেয়া হাত দিয়ে কোমরে গুঁজে রাখা চিঠির জায়গা দেখায়।

নিমেষে চমকে ওঠে দুজনেই। নতুন ধরে আনা মেয়েদের আর্তচিৎকার ছড়াতে থাকে চারদিকে। তখনো রোদ ফুরোয়নি। দিন শেষ হয়নি। আঁধার ঘনায়নি। তার পরও কেন মানুষের জীবনে অন্ধকার? কারণ, চারদিকে যুদ্ধ।

পরদিন হাটখোলার বাড়িটির সামনে

পরদিন হাটখোলার বাড়িটির সামনে পরদেশী এসে দাঁড়ালে আকমল হোসেনই ওকে প্রথমে দেখতে পান। প্রথমে চমকে ওঠেন তিনি। ভাবেন, নিশ্চয় কোনো খবর নিয়ে এসেছে পরদেশী। নাকি যুদ্ধে যাবে বলে ঠিক করেছে? তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। গেটটা অর্ধেক ফাঁক করে আলতাফ বেরিয়ে গেছে। ও বাজারে গেছে। ওর দেরি হচ্ছে কেন চিন্তা করে তিনি এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন মাত্র। ইদানীং আলতাফকে তার ভয় হয়। মনে হয়, যেকোনো সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যাবে। ওর মতিগতি তেমনই লাগে। আলতাফকে হারানোর কথা মনে হলেই তিনি অস্থির হয়ে যান। তাকে ছাড়া তাঁর পক্ষে একা এই অস্ত্রাগার পাহারা দেওয়া কঠিন। অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণও সহজ হবে না।

পরদেশী কাছে এসে বলে, সেলাম হুজুর। কেমন আছেন, হুজুর? আমি আপনার কাছে আবার এসেছি।

আকমল হোসেন গেট ফাঁক করে বলেন, ভেতরে চলে এসো, পরদেশী। তুমি কেমন আছ?

আমরা ভালোই আছি। যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করা সহজ কাজ না। খুবই কঠিন। এই আপনি যেমন যুদ্ধ করছেন তেমন। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। চুল সাদা হয়ে গেছে অনেক।

পরদেশী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে। আজ ও এখান থেকেই চলে যাবে।

পরদেশীকে দেখে এগিয়ে আসেন আয়শা খাতুন আর মেরিনা। পরদেশী বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলে, একটা চিঠি এনেছি। দাও। আকমল হোসেন হাত বাড়িয়ে চিঠি নেন। কার চিঠি?

যে মা-ঠাকরুন চিঠিটি লিখেছেন, তিনি আপনাদের ঠিকানা দেননি। আমি আর রাবেয়া সুইপার ঠিক করেছি, এমন যত চিঠি পাব, সব আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। পুলিশ লাইনে যারা মারা গেছেন, তাদের তালিকাও দিয়েছে রাবেয়া সুইপার।

পরদেশী ছোট্ট খাতাটিও এগিয়ে দেয়। তারপর বলে, আমি আসছি, হুজুর। আমি দাঁড়াতে পারব না।

না, তা হবে না। তুমি বসো, পরদেশী। চা খাবে।

না মাইজি, আজ থাক। একজন মা-ঠাকরুন মরে গেলে আমার মন খুব খারাপ হয়। কয়েকজন নতুন মা-ঠাকরুনকে আনা হয়েছে। আমার মন খুব খারাপ। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

পরদেশী দুহাতে চোখ মোছে। তার কাঁচা-পাকা চুল কপালের ওপর এসে পড়ে। মেরিনা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বলে, পরদেশী দাদা, আপনি একটু বসেন। এক গ্লাস জল খান।

হ্যাঁ, জল খাব, দিদিমণি। বুকে বড় জ্বালা। জ্বালা সইতে পারি না।

পরদেশী সিঁড়ির কাছে রাখা মোড়ার ওপর বসে। দুহাত কোলের ওপর জড়ো করে রাখে। মেরিনা নিজেই এক গ্লাস পানি আর দুটো সন্দেশ নিয়ে আসে ওর জন্য। পরদেশী হাত বাড়িয়ে পিরিচটা নেয়। আগ্রহ করে খায়। মেরিনা বুঝতে পারে, খেতে ওর ভালো লেগেছে। ওর হাত থেকে পিরিচটা নিয়ে পানির গ্লাসটা ওকে দেয়। ও গ্লাস শেষ করে বলে, আরও এক গ্লাস।

আয়শা খাতুন পেছন থেকে বলেন, তুই দাঁড়া, মেরিনা। আমি জগ ভরে পানি আনছি। ওর যে কয় গ্লাস ইচ্ছা, সে কয় গ্লাস খাবে। বুঝতে পারছি, অনেকটা পথ ও বোধ হয় হেঁটে এসেছে।

হ্যাঁ মাইজি, ঠিক। বাসে উঠতেও ভয় পেয়েছি। ভেবেছি, যদি ভিড়ের মধ্যে চিঠিটা হারিয়ে যায়। কেউ যদি বলে, তোর বুকের মধ্যে কী লুকিয়ে রেখেছিস। বের কর। তাহলে আমি মা-ঠাকরুনদের কাছে কী জবাব দেব?

আয়শা খাতুন একমুহূর্ত পরদেশীকে দেখেন। তাঁকে পানি আনতে যেতে হয় না। মন্টুর মা ততক্ষণে এক গ্লাস পানি এনে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি গ্লাসটা নিয়ে পরদেশীকে দেন। পরদেশী মাথা নুইয়ে গ্লাস নেয়। মাথা নিচু করে গ্লাসের পানি শেষ করে।

যাই, মাইজি।

আপনি কি যুদ্ধে যাবেন, পরদেশী দাদা?

না। পরদেশী মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মেরিনার প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারপর পা বাড়াতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, পুলিশ লাইনের ব্যারাকের ঘরে ঘরে আটকে রাখা মেয়েদের সুইপার আর ডোমরাই তো দেখছে। ওদের তো দেখার আর কেউ নেই। আমরা না থাকলে যেটুকু ছায়া আছে, তা-ও থাকবে না।

ও চোখ মোছে। ওর কাঁচা-পাকা চুলের ওপর এসে বসে পোকা। আয়শার মনে হয়, ওর কথা শুনে পোকাটি এসে ওর সহমর্মী হয়েছে। যখন কারও জন্য কেউ থাকে না, তখন তার সঙ্গে মানুষ আর পোকা এক জায়গায় জড়ো হয়। এটাই বোধ হয় যুদ্ধের নিয়তি।

পরদেশী চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বলে, যাই দিদিমণি।

সেলাম, মাইজি।

তুমি বেঁচে থাকো, পরদেশী, এই আশীর্বাদ করি।

এতক্ষণ আকমল হোসেন কোনো কথা বলেননি। পরদেশীকে দেখেছেন, সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন, সামনে কী কাজ করবেন, তা ভেবেছেন। ঘুরেফিরে পরদেশী তার সবটুকু বোধ নিয়ে তাঁর সামনে একজন বড় মানুষের অবয়বে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। যাবার সময় আকমল হোসেন ওর ঘাড়ে হাত রাখেন।

সাবধানে থেকো। বিপদ যেন তোমাকে ছুঁতে না পারে। রাবেয়াকে বলল, এখন থেকে ওকে আমরা জয় বাংলা ডাকব।

আমি আবার আসব, হুজুর। আপনাদের এখানে এলে অনেক শান্তি পাই। আজ ভেবেছিলাম, এই বাড়িতে দাঁড়াতেই পারব না। দেখলাম, কেমন করে যেন আমার থাকা কেমন হয়ে গেল। যাই, হুজুর।

আমি জানি, তুমি বারবার আসবে। তুমি আমাদের কাছে শহীদের তালিকা নিয়ে আসবে।

ও প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ায়। তারপর নত হয়ে বলে, সেলাম, হুজুর।

আকমল হোসেন ওকে গেট খুলে দেন। ও যতক্ষণ ফুটপাত ধরে হেঁটে যায় তাকিয়ে থাকেন তিনি। দেখেন, ওর পায়ের গতিতে তীব্রতা আছে। ও একমুহূর্তে দৌড়ে আসতে পারে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। সারা দেশে যুদ্ধ।

গেট বন্ধ করে প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে বুঝতে পারেন বাড়িটা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনিও ঘরে যেতে পারছেন না। দাঁড়িয়ে থাকেন। বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন আয়শা খাতুন। সিঁড়ির রেলিংয়ের মাথায় বসে আছে মেরিনা। মন্টুর মা নিচে নেমে এসেছে। আলতাফের ঘরের কাছাকাছি আতাগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আলতাফ বাড়ির বাইরে। এক্ষুনি চলে আসবে।

কারও মুখে কথা নেই। কথা আসে না। পরদেশী এখনো এ বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে যেন, আর তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখছে এ বাড়ির গেরিলাযোদ্ধাদের মতো আরেকজন যোদ্ধাকে। তার উচ্চারণ স্পষ্ট। তার কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন একরৈখিক। বুঝে গেছে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের কত মাত্রা তৈরি হয়। কীভাবে সেখানে নিজেকে সংযুক্ত করতে হয়। কোনটা করলে যুদ্ধের সময়কে মূল্যায়ন করা হবে। সময়কে ঠিকমতো ধরা হবে এবং সময়ের অগ্রগতিতে নিজের হাত মেলানো হবে।

স্তব্ধতা ভাঙে মেরিনা।

ও সিঁড়ির শেষ ধাপের মাথায় বসে ছিল। উঠে আকমল হোসেনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

আব্বা। আব্বা–

মেয়ের ডাকে চমকে তাকান তিনি। তাকিয়েই থাকেন। ভাবেন, বন্দী করে রাখা কোনো মেয়ে তাকে খুঁজে ফিরছে। শয়তানগুলো যখন তাকে তুলে নিয়ে যায়, তখন তো বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়নি। ও এখন বাবাকে ডাকছে। বাবার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তো যাওয়া যায় না।

কিছু বলবি, মা? মন খারাপ লাগছে?

ঘরে চলেন। বাইরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

সন্ধ্যা হোক। বাইরের আলোটা খুব ভালো লাগছে রে।

আলো? আললা কোথায়, আব্বা? সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আলোই তো দেখছি আমি। পরদেশী যে আলো রেখে গেল আমাদের জন্য, সে আলোর কথা বলছি।

আয়শা খাতুন নিচে নেমে আসেন। গেট খুলে আলতাফ ঢোকে। মন্টুর মা দুপা এগিয়ে এলে ঘরের মানুষদের একটি দল হয়ে যায়। আকমল হোসেন আবার বলেন, পরদেশী এখনো আমাদেরকে ছেড়ে যায়নি, মা। আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকেই ওকে দেখতে পাচ্ছি।

আয়শা খাতুনের মনে হয়, আকমল হোসেন এখনো ঘোরের মধ্যে আছেন। তিনি দ্রুত কণ্ঠে বলেন, শোনো, পরদেশী ঠিকই চলে গেছে। এখন আমাদের অনেক কাজ।

কাজ? হ্যাঁ, অনেক কাজ। প্রথম কাজ শহীদদের জন্য মিলাদ করতে হবে। ফকির খাওয়াতে হবে। কাল একটি কুলখানির আয়োজন হবে এই বাড়িতে। আমাকে নিয়ে তোমার ভয় নেই, আশা। আমি ঠিকই আছি। চলো, ঘরে চলো।

তিনি আয়শা ও মেরিনার হাত ধরে সিঁড়িতে পা রেখে পেছনে তাকান। দেখতে পান আলতাফের হাতের দুটো বাজারের ব্যাগের একটি মন্টুর মা নিয়েছে। ওরা ঠিক তার পেছনেই আছে।

আয়শা খাতুন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। তোমরা ড্রয়িংরুমে বসো।

আকমল হোসেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলতাফকে বলেন, পুরো বাড়ির বাতিগুলো জ্বালিয়ে দে তো রে। ঘরের কোথাও কোনো অন্ধকার যেন না থাকে।

মেরিনা হেসে বলে, তাহলে মোমবাতি জ্বালাতে হবে, আব্বা। ঘরের কোনা-ঘুপচিতে মোমবাতি দিতে হবে।

হ্যাঁ, দিতে হবে। হাজার হাজার মোমবাতি–

বলতে বলতে আকমল হোসেন ড্রয়িংরুমে ঢোকেন। ফোন বাজে। তিনি দ্রুত হেঁটে গিয়ে ফোন ধরেন। মারুফের ফোন।

আব্বা, আমি কিছুক্ষণ আগে ঢাকায় এসেছি। সামনে একটি অপারেশন আছে। ধানমন্ডির ২৮ নম্বরে আছি। আগামীকাল বাড়িতে আসব। আম্মাকে সালাম দেবেন।

মেরিনা কাছে এসে দাঁড়ায়।

ভাইয়ার ফোন?

হ্যাঁ রে। ও ঢাকায় এসেছে। সামনে ওর অপারেশন আছে।

এবারও কি বাড়িতে আসবে না?

কাল আসবে বলেছে। বলেছে তো, শেষ পর্যন্ত আসতে পারবে কি না কে জানে!

ভাইয়াকে মাত্র দেড় মাস দেখিনি। অথচ মনে হয়, ভাইয়া গত দশ বছর ধরে বাড়িতে নেই।

তোর মা কী করছে? এখন তো বেশি রান্নার দরকার নেই। টেবিলে একটা কিছু দিলেই হয়। ডাল-ভাতেও আমার আপত্তি নেই।

দেখি, মা কী করছেন। রান্নাঘর নিয়ে মায়ের নানা চিন্তা থাকে।

মেরিনা চলে গেলে আকমল হোসেন সোফায় বসেন। আবার পরদেশী তাঁর মাথায় ঢোকে। পুলিশ লাইনের সুইপারদের একজন সরাসরি বলেনি, কিন্তু জানিয়ে গেল, শহীদদের তালিকা করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানকারী মেয়েরা—ওদের ইতিহাস লিখতে হবে। ওদের নামের তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। পরদেশী ইতিহাসের উপাদান নিয়ে এসেছে তার কাছে। স্বাধীনতার পর লিখতে হবে এই সব মেয়ের আত্মত্যাগের কথা। আকমল হোসেনের বুক চেপে আসে। তিনি সেন্টার টেবিলের ওপর যত্ন করে কাগজগুলো রাখেন। এই ঘরে সবাই এলে মেরিনাকে বলবেন জেনিফারের চিঠিটা পড়তে।

একটু পর আয়শা খাতুন সবাইকে নিয়ে প্রজ্বলিত মোম হাতে ঘরে আসেন। পুরো বাড়ির বিভিন্ন জায়গা খুঁজে পঁচিশটি মোম পাওয়া গেছে। আলতাফ দোকান থেকে নতুন মোম আনতে চেয়েছিল। আয়শা রাজি হননি। বলেছেন, আজকে ঘরের সবটুকু থেকে। এরপর ওদের স্মরণে আবার এই বাড়িতে মোম জ্বলবে। সবাই এসো আমার সঙ্গে। আজ ঘরের মোমবাতি দিয়ে স্মরণসভা।

আকমল হোসেন ওদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। আয়শা খাতুন এমনই। রান্নার জন্য নয়, মোম জ্বালানোর জন্য রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। কতকাল ধরে দুজনে সংসার করছেন। এভাবে আয়শা খাতুন প্রায়শ নতুন করে তোলেন সময়ের পরিধি। যে পরিধি স্মৃতির কোঠায় সঞ্চিত হয়।

তিনি মেরিনার হাত থেকে তিন-চারটে মোম নিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখেন। সবাই তার চারপাশে গোল হয়ে বসে। মাঝখানে পরদেশীর দিয়ে যাওয়া চিঠি ও রাবেয়ার দেওয়া ছোট খাতা মোমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জেনিফারের চিঠিটা মেরিনাকে পড়তে বলেন আকমল হোসেন। ও থেমে থেমে চিঠিটা পড়ে। পড়া শেষ হলে আকমল হোসেন বলেন, আবার পড়।

মেরিনার কন্ঠস্বর থমথম করে। কখনো ওর গলা আটকে যায়। আয়শা খাতুন গুনগুন ধ্বনিতে ভরাতে থাকেন ঘর–

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান

আকমল হোসেন চমকে আয়শার দিকে তাকান। বলতে চান, তুমি কি মৃত্যুর পথকে শুভ কর্মপথ বলছ? কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না। সুর ও বাণী এক হয়ে তীব্র হয়ে ওঠে–

চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ সে অভিষেক ললাট পরে।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ

ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা–
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।"
চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি–
কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ–
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান॥

মেরিনার চিঠি আর শেষ করা হয় না। ও কান পেতে গানের বাণী শোনে। আয়শা খাতুন শেষের দুটো লাইন বারবার গাইতে থাকেন–

দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান॥

একসময় গুনগুন ধ্বনি থামে। আয়শা সোফায় চোখ বুজে মাথা হেলিয়ে রাখেন। মেরিনা কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আম্মা, চিঠির শেষ আপনি এভাবে বড় করে দিলেন যে, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। আমার কাছে জেনিফারদের মৃত্যু নাই।

মেরিনা কেঁদেকেটে নিজের ঘরে চলে যায়। ও চলে গেলেও আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুনের মনে হয়, ঘর খালি হয়নি। মেরিনা জেনিফারদের মৃত্যু নেই বলার পরপরই ঘরে একজন ঢুকছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের যেদিকে তাকায় তাদের মনে হয় সব জায়গায় কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো শূন্যতা নেই।

আকমল হোসেন আয়শার হাত ধরে বলেন, এসো। নিজেদের ঘরে যাই।

চলো। আয়শা আকমল হোসেনের হাত ধরেন। ধরেই থাকেন। ছাড়েন না। যেন গভীর উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে চান আকমল হোসেনের শরীরের সর্বত্র। যৌবনের উষ্ণতা নয়। এক অন্য রকম উষ্ণতা এই পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনের, যে উষ্ণতার তল খুঁজে পাওয়া কঠিন। আকমল হোসেন সেই উষ্ণতায় অভিভূত হয়ে নিজের হাতটি তার ডান হাতের ওপর রাখেন, যে হাত আয়শা ধরে আছেন। গভীর কন্ঠস্বরে বলেন, আয়শা, আমাদের শেষ জীবনটুকু এভাবেই পার হবে। পরস্পরের এমন নিবিড় মগ্নতায়।

হ্যাঁ, তাই। এখনই তার যাত্রা শুরু।

আয়শা টেবিলের মাঝখান থেকে চিঠি আর ছোট খাতা উঠিয়ে নিয়ে বলেন, লেখার কাজ কি এখনই গোছাবে? এখনই গোছাতে শুরু করো। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমরা নিজেরাই বা কয়দিন বাঁচব।

ইতিহাস অনেক কঠিন, আয়শা। এখনই ধরব না। এখন আমি তোমাকে বুকে জড়িয়ে রেখে এই গানটি আবার শুনব। শেষ দুই লাইন তোমার সঙ্গে আমি গাইব।

আয়শা খাতুন একসঙ্গে হাত ধরে শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গাইতে শুরু করেন শেষ থেকে–

দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান॥

আকমল হোসেন সুরের কথা মনে রাখেন না। আয়শার সঙ্গে গাইতে থাকেন। তিনি জানেন, তিনি গায়ক নন। তিনি ওস্তাদের কাছে গান শেখেননি। কিন্তু তাঁর কাছে এক অলৌকিক আবেগ। এই একই আবেগ দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনেন। বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসা যুদ্ধের খবর সুরের মতো পূর্ণ করে তার ভেতরের সবটুকু। একসময় তিনি টের পান, আয়শা থেমে গেছেন। গাইছেন তিনি একা। তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে রাখা আয়শার মাথার ওপর নিজের থুতনি ঠেকিয়ে তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে শব্দরাজি–

নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান...কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান...
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান॥

আকমল হোসেনের গান থামলে আয়শা মৃদুস্বরে বলেন, আমাদেরই বুকের ভেতরের গান। আমাদের সময়। আমাদের জীবন। আমি চিৎকার করে বলতে চাই, এই গান রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। হাজার বছর ধরে এই গান আমাদের বুকের ভেতরেই ছিল। এখন সময় হয়েছে বুক উজাড় করে গাইবার।

আকমল হোসেন দুহাতে আয়শাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, এই গানে শহীদদের স্মরণ করলে। তোমাকে আমার বুকভরা ভালোবাসা। আমরা চিরকাল আমাদের শহীদদের স্মরণ করব।

আয়শা কথা বলতে পারেন না। চোখের জল মোছেন না। গাল বেয়ে গড়াতে দেন। সেই জল মুছে যায় আকমল হোসেনের গায়ের জামায়। তারপর সেটা ঢুকে যায় বুকের ভেতরে। দুজনেই অনুভব করে যে বড় কঠিন এই বেঁচে থাকা। আর কতটা পথ একসঙ্গে যাবেন, কেউ তা বলতে পারে না।

টানা বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে পানি জমে গেছে। ভোর থেকে একটানা ঝরছে। এমন বৃষ্টি কখন শুরু হয়েছে, তা টের পাননি আকমল হোসেন। আয়শা খাতুনও। বোঝা যায়, শেষ রাতের দিকে দুজনেরই গাঢ় ঘুম হয়েছিল।

এখন তাঁরা বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছেন। দুজনই প্রবল বৃষ্টি উপভোগ করেন। আকমল হোসেন বলেন, এ বছরের বৃষ্টি আমাদের পক্ষে। আজ যে বৃষ্টি দেখছি, এটা শুধু বৃষ্টি দেখার আনন্দ না, যুদ্ধে জেতার আনন্দও। পাকিস্তানি সৈনিকেরা পাহাড় আর শুকনো মাটির দেশের লোক। ওদের মরুভূমিও আছে। বৃষ্টি ওদের আতঙ্ক, আয়শা। আমাদের মতো বৃষ্টিপাগল লোক না ওরা।

ঠিক বলেছ। পাকিস্তানি সেনারা তো বৃষ্টির মেজাজ বোঝে না। বৃষ্টিকে আপন করতেও জানে না। বৃষ্টি ওদের জন্য বাধা। আমাদের জন্য সহায়ক। এই বৃষ্টির সহায়তায় আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

দুজন হঠাৎ করেই চুপ করে যায়। ঘুম ভাঙার পর থেকেই দুজন বারান্দায়। বাড়িটা এ মুহূর্তে সুনসান।

এ বাড়ির আরও চারজন বাসিন্দা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। গত রাতে মারুফ বাড়িতে এসেছে। ঢাকায় ঢুকেছে এক দিন আগে। বিভিন্ন হাইডে ছিল। এটি গেরিলাযুদ্ধের কৌশল। এভাবে যুদ্ধের সময়কে মানতে হয়। নিয়মমাফিক যেটুকু ঘটবে, সেটুকুকেই মানতে হবে। বাড়াবাড়ি চলবে না। কম করাও চলবে না।

আয়শা খাতুন উঠতে উঠতে বলেন, দেখি, ছেলেটা ঘুম থেকে উঠল কি। ও তো এক দিনের বেশি থাকবে না।

আকমল হোসেন আয়শা খাতুনকে বাধা দিয়ে বলেন, ওকে ঘুমাতে দাও। এই বৃষ্টিভেজা সকালে ঘুমের আলাদা মজা আছে।

ঘুমের মধ্যে কি মজা উপভোগ হয়?

হয়, আশা। ঘুম ভাঙলে ও গাঢ় ঘুমের আনন্দ টের পাবে। তা ছাড়া ওর বোধ হয় ঘুম দরকার ছিল। দেখলে না, কালকে বাড়িতে এসেই ঘুমোতে চাইল। আমাদের সঙ্গে খুব একটা কথা না বলে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। কোনো কারণে ও হয়তো টায়ার্ড ছিল।

আয়শা শ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, কত দিন পরে ফিরল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাও বলল না।

তুমি মন খারাপ করেছ?

একটু তো মন খারাপ হয়েছেই।

ছেলেমানুষি। ভুলে যাও কেন যে আমরা যুদ্ধের সময়ে আছি! তুমি মন খারাপ করতে পারো না, আশা। তুমি মন খারাপ করলে আমারও মন খারাপ হবে।

বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের বড় ঝাপটা আসে। দুজনের গায়েই বৃষ্টি লাগে। আয়শা খাতুন হাত উঠিয়ে মুখ মোছেন। আর আকমল হোসেন মাথা ঘুরিয়ে ঘাড়ের কাছে জামার কলারে মুখ ঘষে নেন।

গত রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফিরে মারুফ সোজাসুজি আকমল হোসেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আব্বা, কাল সকালে কথা বলব। মাকে বলল, আমি ঘুমাব, আম্মা। কেউ ডাকবে না আমাকে।

খাবি না? খিদে পায়নি? এক গ্লাস পানি তো খাবি?

না আম্মা, এখন কিছু খাব না। পানিও না। পেটে যা আছে, তাতে রাত চলে যাবে।

আয়শা খাতুন ছেলের কথা আর না ভাবার জন্য আকমল হোসেনকে বললেন, তুমি চা খাবে?

না। দরকার নেই। একবারে নাশতা খাব। তোমার সঙ্গে একটা বিষয় আমার আলাপ করা দরকার, আশা। কাল আমি বিষয়টি তোমাদের বলিনি। আমার খুব মন খারাপ ছিল।

কী ব্যাপার, বলো তো?

আয়শা খাতুন ভুরু কুঁচকে তাকান। পঁচিশের রাতের পর থেকে আকমল হোসেন নিজে নিজে মনে রেখেছেন এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। সব ঘটনাই তো দুজনের জানা আছে। এখন কী হলো? নতুন কিছু? তাই হবে হয়তো।

তিনি সামনে তাকিয়ে বললেন, পরদেশী যে মেয়েটির চিঠি দিয়ে গেছে, ওকে আমি দেখিনি। কিন্তু ওর ভাই শাকেরকে মারুফ চেনে! এমন একটি সূত্র আমার মনে হচ্ছে। চিঠির বর্ণনা থেকে এটা আমার মনে হয়েছে।

মারুফের বন্ধু? তুমি কি ওকে দেখেছ?

না, আমি ওকে দেখিনি। ও মারুফের ঠিক বন্ধু নয়, ওর পরিচিত। একসঙ্গে রাজপথে ছিল। মিছিলে ছিল। ২৭ তারিখে কারফিউ ভাঙলে আমি আর মারুফ ওই বাসায় গিয়েছিলাম। মারুফ বলেছিল, শাকেরের কাছে ওর কী একটা দরকার আছে। গিয়ে যা দেখেছিলাম, তা তোমাকে বলেছিলাম, আশা। তোমার বোধ হয় মনে আছে, আশা। জেনিফারের চিঠিটা পড়ে আমি বুঝতে পারছি, ও ওই পরিবারের মেয়ে হতে পারে। বর্ণনায় তেমন আভাস পাচ্ছি। মারুফকে জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে। মেয়েটিও মিছিলমিটিংয়ে যেত। নিশ্চয় মারুফের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই খবরটি কি মারুফকে দেওয়া ঠিক হবে?

না, এই মুহূর্তে একদমই না। সামনে ওরা অপারেশন করবে। ওদের এখন পিসফুল থাকা খুব দরকার।

আমিও ভাবছি যে জেবুন্নেসার চিঠিও ওকে এখন দেওয়ার দরকার নেই।

না, দরকার নেই। সময় বুঝে বিষয়টি ওকে জানাতে হবে।

দুজন হঠাৎ করে চুপ করে যান। মনে হয়, এখন আর তাঁদের জন্য কোনো কথা নেই। থেমে গেছে কোলাহল। জেনিফার নতুন করে উঠে এসেছে ওদের সামনে। বুকের ভেতর তোলপাড় হচ্ছে। জেনিফার আর ইহজগতের কথার মধ্যে নেই। ওকে অনুভব করার জন্য এখন নীরবতাই শ্রেষ্ঠ সময়।

বৃষ্টি ধরে এসেছে।

আলতাফ উঠেছে। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে জমে থাকা পানির মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছে। বাতাসে উড়ে আসা পাতা কুড়িয়ে জড়ো করছে। বৃষ্টি ও জমে থাকা পানির মধ্যে কাজ করছে এমন একটি লোককে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় আকমল হোসেনের। ভাবে, ও বুঝি জেনিফারের অন্য আদল। নিঃশব্দ কর্মরত মানুষেরা এখন জেনিফারের অনুভবে ভাসিয়ে দেবে প্রান্তর। শহীদের আত্মা মুক্তিযুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের কাছেই থাকবে। যেকোনো আদলে হোক না কেন, হবেই। একের মধ্যে বহুর প্রবেশ ঘটতে থাকবে অনবরত। একই রকম কাছাকাছি ভাবনা আয়শার ভেতরও ঘুরপাক খায়। মন্টুর মা উঠেছে। সামনে এসে একবার দেখা দিয়ে চলে গেছে। রান্নাঘরে রুটি বানানোর তোড়জোড় করছে। একসময় মেরিনা পেছনে দাঁড়িয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

আপনারা বুঝি অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি দেখছেন, আম্মা? আমাকে ডাকলেন না কেন? আমি এমন সুন্দর বৃষ্টি মিস করলাম।

আবার দেখতে পাবি। মনে হচ্ছে, এবারের বর্ষা আমাদের ঢেলে বৃষ্টি দেবে।

ঠিক আছে, বৃষ্টি পাইনি, কিন্তু বৃষ্টির জমানো পানি তো পেলাম। যাই, হেঁটে আসি।

মেরিনা স্যান্ডেল খুলে রেখে প্রাঙ্গণে নেমে যায়। দুই পায়ে পানি ছিটায়। ছোটাছুটি করে। কাপড় ভেজে, চোখমুখ চুল ভেজে কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করে না। ওকে এই অবস্থায় দেখে আকমল হোসেন এবং আয়শা খাতুন একসঙ্গে ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠেন। ভাবেন, মেরিনা নয়, ওখানে জেনিফার দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পরস্পর কাউকে কিছু বলে না। ভাবে, বুকের ভেতরের কথা ভেতরেই থাক। ওখান থেকে চেঁচিয়ে মেরিনা জিজ্ঞেস করে, আম্মা, ভাইয়া উঠেছে?

ওঠেনি। জেগে শুয়ে আছে কি না, তা তো জানি না।

কাল রাতে ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ভাবখানা এমন করেছে, যেন আমার সঙ্গে আড়ি আছে। এমন ব্যবহার করলে আমিও নিজের ঘরের দরজা আটকে বসে থাকব। কেউ কারও চেহারা দেখব না।

বারান্দা থেকে ওর এ কথায় মা-বাবা কেউই সাড়া দেয় না। মেরিনা আবার বলে, আমি বুঝলাম না যে ভাইয়ার কী হয়েছে। বাড়িতে এসেই নিজের ঘরে ঢুকতে চাইল কেন। জেবুন্নেসার কোনো খবর ওর কানে পৌঁছায়নি তো? কে জানে! মেরিনা হাত উল্টে আবার পানি ছিটাতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পানিতে খেলে বারান্দায় উঠে আকমল হোসেনকে জিজ্ঞেস করে, আব্বা, জেবুন্নেসার কথা কি ভাইয়াকে বলব?

না, মা। ওকে এখন মানসিকভাবে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না। আমিও তা-ই ভাবছি। ঠিক আছে, পরের বার এলে কথাটা বলা যায় কি না, তা-ও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

আমি দেখি তো ছেলেটি উঠল কি না। আয়শা খাতুন বারান্দা ছেড়ে করিডর পার হয়ে নিঃশব্দে মারুফের ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, মারুফ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মায়ের পায়ের শব্দ ওর ঘুম ভাঙাতে পারেনি। সে জন্য তিনি আর ওকে ডাকলেন না। বেরিয়ে এসে মেরিনাকে বললেন, ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি ডাকিনি।

আকমল হোসেন মেরিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, না ডেকে ভালোই করেছে রে তোর মা। তুই ভিজে আছিস। কাপড় বদলে ফেল। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুঁই-ছুঁই। মারুফ এখনো ডাইনিং টেবিলে আসেনি। হয়তো গোসল করছে কিংবা ঘুমিয়েই আছে। কে জানে!

আয়শা খাতুন নাশতার টেবিলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন! ফ্রিজ থেকে নানা খাবার বের করে টেবিলে দিয়েছেন। শুধু পরোটা বানিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ভাঁজতে নিষেধ করেছেন। এখন ছেলের জন্য অপেক্ষার পালা। ভালোই লাগছে অপেক্ষা করতে। যেমন

অপেক্ষা করেছিলেন ওর জন্মের। গর্ভের নয় মাস অপেক্ষার প্রহর গোনা। এখন একটি নতুন জন্মের অপেক্ষা তাঁর সামনে। স্বাধীন দেশ। সেই ছেলেটি সেই মেয়েটি একই জন্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। জীবন বাজি রেখে যুক্ত করা। আহ্, কী আনন্দ! আয়শা খাতুন শুনতে পান বুকের ভেতর গুনগুন ধ্বনি। তবে সেটা এই মুহূর্তে মুখে আসে না।

আকমল হোসেন নিজের ঘরের টেবিলে কাজ করছেন। পরদেশীর দিয়ে যাওয়া খাতা থেকে নিজের ডায়েরিতে মেয়েদের নামের তালিকা লিখে রাখছেন। বেশ সময় নিয়ে নামগুলো লেখেন তিনি। একটি নাম লিখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন নামটির দিকে। তারপর আরেকটি লেখেন। এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায় তার। নিজের সময়ের পেছন দিকে তাকান, পরমুহূর্তে সামনের দিকে। হিসাব মেলান। দেখতে পান সময়ের যোগফল মিলে যাচ্ছে। দুয়ে-দুয়ে চার হচ্ছে। একসময় শেষ হয় নাম লেখা। তিনি জেনিফারের চিঠিটা ডায়েরির এক পৃষ্ঠায় পিন দিয়ে গেঁথে রাখেন। কিন্তু চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ার সাহস হয় না তার। কেমন করে পড়বেন? তছনছ হয়ে যাওয়া ঘরে দুটো শিশুসহ দুজন মানুষের লাশ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে প্রথম একটি রক্তাক্ত দুর্গবাড়ি দেখার অভিজ্ঞতা। আকমল হোসেন চেয়ারে মাথা হেলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকেন।

তারপর নতুন একটা কাগজ টেনে উলন-বাড্ডা আর গুলবাগের ম্যাপ আঁকেন। যুদ্ধের পর থেকে এলাকার মানচিত্র আঁকা তার প্রিয় অভ্যাস হয়ে উঠেছে। ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম। এই শহরে বেড়ে ওঠা। শহরটা দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন। তিনি বলেন, এই শহরের হেন এলাকা নেই, যেখানে আমি যাইনি। শহরটা যতটুকু তার সবটুকুতে আমার পায়ের চিহ্ন আছে। ছোটবেলায় যেতেন বাবার সঙ্গে। বড় হয়ে খুঁজে দেখেছেন ছোট ছোট এলাকা। যেখানে অনেকেই যেত না। তিনি কখনো গেছেন বন্ধুদের নিয়ে, কখনো ঘুরেছেন একা একা। ফুল, পাখি, পোকামাকড়, গাছগাছালিও দেখেছেন অনেক। নাম জানতেন না। দেখাটাই আনন্দ ছিল। এখন দেখাটা প্রয়োজন। জীবনযুদ্ধের পথচলার জন্য চারপাশ দেখা। গতকাল ইঞ্জিনিয়ার নজরুল এসেছিল। ভগবতী চ্যাটার্জি লেনে থাকে। এবাড়ি-ওবাড়ি পায়ে হাঁটার দূরত্ব। নজরুল বলেছে, পরবর্তী অপারেশন পাওয়ার স্টেশন। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ চালাবে। একই

সঙ্গে। তিনি রাস্তা, গাছ, ব্রিজ ইত্যাদির মধ্যে পাওয়ার স্টেশন দুটোর অবস্থান তৈরি করেন। উলন-বাড্ডার কাছাকাছি রামপুরা টেলিভিশন সেন্টার। ওখানে বড় রকমের পুলিশি পাহারা আছে। এই জায়গাটা ছেলেদের জন্য খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে সে রকম বিপদ দেখলে ওরা বিল সাঁতরে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে পারবে। এটাই বড় ধরনের ভরসার জায়গা। অনায়াসে সরে যাওয়ার পথ। তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করেন। পুরো লোকেশন এঁকে আকমল হোসেন খুশি হয়ে যান। গেরিলারা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরে বিদেশি পত্রিকায় এ ঘটনার খবর ছাপা হয়েছিল। ওরা লিখেছিল, ইট শোজ দ্যাট দ্য গেরিলাস ক্যান মুভ অ্যাট ঢাকা সিটি অ্যাট দেয়ার উইল।

তিনি চেয়ারে মাথা হেলিয়ে আবার চোখ বোজেন। এই ভঙ্গিতে তিনি শুধু নিজেকে শান্তই করেন না, ভবিষ্যতের চিন্তাও করতে পারেন। মাথা হেলিয়ে দিলে মাথার মধ্যে নানা ভাবনা কাজ করে। দেখতে পান, সময় কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পঁচিশের রাতে গণহত্যা শুরুর পরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে লুকিয়ে থাকা সাংবাদিক সাইমন ড্রিং তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, ভোরের কিছু আগে গুলিবর্ষণ থেমে গেল এবং সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ভীতিজনক নিঃশব্দতা শহরের ওপর চেপে বসল। ফিরে আসা দু-তিনটি ট্যাঙ্কের শব্দ, মাঝেমধ্যে কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সম্পূর্ণ শহর মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত এবং মৃত।

আকমল হোসেন শব্দ করে হাসলেন। নিজেকেই বললেন, এখন এই শহর কোলাহলে মুখর। গেরিলাদের পদচারণে জীবন পূর্ণ। এই শহরের অনেক বাড়ি দুর্গের ভূমিকা পালন করছে। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছে মানুষ। মানুষের হাতে অস্ত্র উঠেছে, পাশাপাশি মানুষের সাহস আছে, শরীর আছে, ত্যাগের মনোবল আছে। এ শহরে এখন কোনো কিছুরই অভাব নেই। শহর তার নতুন জীবন নিয়ে পূর্ণ শক্তিতে জেগে উঠেছে। একদিন এই শহরের বুনো ঝোপে লজ্জাবতী লতা পায়ে লেগে ফুলগুলো বুজে গেলে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কৈশোরের সেই দিনে বুনো ঝোপের সামনে বসে থেকে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ফুলের জেগে ওঠা দেখার জন্য। দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে যে কেন তাঁর পা ওখানে গিয়ে লাগল। কিন্তু সেদিন ওখানে অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও ফুলের জেগে ওঠা দেখতে পাননি। মন খারাপ করে ফিরে এসেছিলেন। মাকে ঘটনাটা বলার পর মা বলেছিলেন, বোকা ছেলে, মন খারাপ করবি না। এভাবে

শিখতে হয়। শিখতে শিখতে বড় হতে হয়। যা, পুকুরে সাঁতার দিয়ে গোসল করে আয়। দেখবি সবকিছু ভালো লাগছে।

কৈশোরের পর পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। মায়ের কথা মনে হয়, দেখতে দেখতে শিখবি। হ্যাঁ, এখনো তার শেখার বয়স পার হয়নি। এখনো তিনি শিখছেন। এখন তাকে শেখাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। কেমন করে ছেলেরা মেয়েরা এক হয়ে লড়ছে।

তখন মারুফ ও মেরিনার কণ্ঠস্বর শুনতে পান তিনি। বুঝতে পারেন, মারুফের ঘুম ভেঙেছে। মেরিনা ঠিকই ভাইয়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভাবলেন, মেরিনা যতই রাগ ঝাড়ুক, ভাইবোনের এই মধুর সম্পর্ক থেকে কেউ কাউকে আড়ালে রাখতে পারবে না। তিনি আবার নিজের কাজে মনোযোগী হলেন।

তখন মারুফের ঘরে দরজায় দাঁড়িয়ে মেরিনা দেখতে পায়, মারুফ বিছানায় বসে আড়মোড়া ভাঙছে। ওকে দেখে বলে, আয়।

মেরিনা হইচই করে কথা বলে, বাড়িতে এসে সবাইকে কষ্ট দিয়েছ। নাক ডেকে ঘুমিয়েছ। আবার হাসছ? নাহ্, তোমার এই আচরণের সঙ্গে গেরিলাযোদ্ধার আচরণ মেলাতে পারছি না। তুমি আমার অলস ভাইয়া। কী, ঠিক বলেছি?

একদম ঠিক। এক শ ভাগ ঠিক। তোর সঙ্গে আমি কথার যুদ্ধ চালাতে চাই। আম্মা কী করছে রে?

ডাইনিং টেবিলে বসে তোমার নাশতা পাহারা দিচ্ছেন। আর একমাত্র ছেলেটিকে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভাবছেন। আকাশ-পাতাল ভাবনা যাকে বলে, তা-ই।

আহা রে, আমার সোনার মা—

মারুফ এক লাফে বাথরুমে যায়। দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, তুই আম্মার কাছে যা। আমি আসছি। আব্বাকেও ডাকিস।

দেরি করবি না কিন্তু। মুখ ধুবি আর বের হবি।

নাশতার টেবিলে বসে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসে মারুফ। একটু করে পরোটা আর ডিম মুখে পুরতে পুরতে বলে, কাল আমাদের উলন আর গুলবাগের পাওয়ার স্টেশন রেকি করার সময় প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। রোদে-গরমে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। কাল তো এমন বৃষ্টি ছিল না। শহরজুড়ে ভাপসা গরম ছিল। রোদের তাপও খুব বেশি ছিল।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে বলেন, তুই কাকে কৈফিয়ত দিচ্ছিস? আমরা কি তোকে জিজ্ঞেস করেছি? নাকি তোর কৈফিয়তের অপেক্ষায় আছি। তুই বাড়িতে এসেছিস, এতেই আমরা খুশি।

অপরাধ নিজের মনের মধ্যে, আব্বা। মারুফ মুখ নিচু করে বলে, কাল আসলে আমি ঠিক আচরণ করিনি। আমার আরেকটু ধৈর্য দেখানো দরকার ছিল। বিশেষ করে মেরিনার সঙ্গে তো বটেই।

তারপর ঘাড় নিচু করে গ্লাসের জুস শেষ করে। মৃদু স্বরে বলে, বাড়ির যত্নে আমার শুধু ঘুম পায়।

হাসির রোল ওঠে টেবিলে। আয়শা খাতুন হাসতে হাসতে বলেন, আমরা কি তোকে আদর দিয়ে বোকা বানিয়ে ফেলেছি? তুই আজ কেমন করে যেন কথা বলছিস, তা আমি বুঝতে পারছি না রে।

মেরিনা হাসতে হাসতে বলে, বোকা না, আম্মা, আদুরে বানিয়েছেন। বেশ কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে ও ঢংঢং করছে, যেন একটা বাচ্চা শালিক পাখি। ভাবখানা এমন, যেন কতকাল মায়ের আদর পায়নি।

মারুফ থমকে গিয়ে সবার মুখের দিকে তাকায়। সবার দৃষ্টি ওর মুখের ওপর। ও গম্ভীর স্বরে বলে, কাল যখন বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ালাম, আমার মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন কী ভেঙে পড়েছে। অথচ কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। ভয়ে-আতঙ্কে আমি চারদিকে তাকাই। অনুভব করি, সেই ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়েছি আমি। আমার ভীষণ খারাপ লাগতে শুরু করে। আমার শরীর ভেঙে আসে। অন্য সময় সারা দিন কত কাজ করেও আমার এমন খারাপ লাগেনি। আমি বলতে পারব না, আমার কী হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমার আশ্রয় দরকার। ঘুম আমার সেই আশ্রয় ছিল। কখন ঘুম ভাঙল, আমি টেরও পাইনি। কেবলই মনে হচ্ছিল, সকাল হয় না কেন। সময় এমন আটকে আছে কেন!

ও আবার মুখ নিচু করে বাটির ফিরনি খায়। একটানে খেয়ে সবটুকু ফিরনি শেষ করে।

আকমল হোসেন অন্যদের সঙ্গে চোখাচোখি করেন। মেরিনা বুঝতে পারে, ওর গলার কাছে কিছু একটা আটকে গেল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। আয়শা খাতুন নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, ঠিকমতো ঘুমোতে পেরেছিলি তো?

হ্যাঁ, আম্মা। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমে তলিয়ে গেলাম। আর কিছু বলতে পারব না। কোনো স্বপ্নও দেখিনি। ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কথা মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, মায়ের দোয়ায় আমি একটা বিপদ কাটিয়েছি। কী ধরনের বিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম, তা আমি জানি না। ঘুম ভাঙার পরে নিজে নিজেই খুব আশ্চর্য হয়েছি।

ঠিক আছে, এসব কথা থাক। ঢাকায় এসে কোথায় ছিলি, বল তো? দুর্গটা তো আমার চিনতে হবে। দরকারমতো যাওয়া-আসা করতে হবে। খোঁজখবর রাখতে হবে।

আমরা একটু পরে বের হয়ে এলাকাটা ঘুরে আসতে পারি, আব্বা?

না, আমি বের হয়ে উলন-গুলবাগ ওই দিকে যাব। আলতাফ যাবে আমার সঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ার নজরুল আসবে। তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি। এখন বল, তোর দুর্গের কথা। আমি নিজে নিজেই এলাকাটা ঘুরে আসব।

দুদিন আমি ছিলাম ধানমন্ডি ২৮ নম্বরে। ওটা বেশ বড় একটা বাড়ি। আপাতত খালি পড়ে আছে। দুজন দারোয়ান আছে বাড়ির পাহারায়।

আকমল হোসেন ভুরু কুঁচকে বলেন, মনে হচ্ছে, বাড়িটা আমি চিনি। তোরা যখন সাংকেতিক ভাষায় বলিস আটাশে, সেটা শুনে আমি গিয়েছিলাম রাস্তা দেখতে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, বাড়িটা খালি আছে। আটাশে ঢুকে হাতের ডানের ৩ নম্বর বাড়িটা তো?

হ্যাঁ, আব্বা। ওই বাড়িটাই। ওটা একটা ওষুধ কোম্পানির কাছে ভাড়া দেওয়া ছিল। কোম্পানির ফিল্ড ম্যানেজার আমাদের গেরিলা বন্ধু। ওই বড় বাড়িটাকে গেরিলাদের আশ্রয়স্থল বানানো হয়। অবশ্য বাড়িটার চেহারা আড়াল করার জন্য ওই ওষুধ কোম্পানির একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেশ করেছিস তোরা। আকমল হোসেন ঘন ঘন মাথা নাড়েন। আয়শা ভুরু কুঁচকে বলেন, ওই বাড়িতে খাওয়াদাওয়া নেই, বুঝতে পারছি। তুই যে খেলি না রাতে?

আমার খাওয়ার কথা মনে ছিল না, আম্মা। এই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমি সবকিছু ভুলে যাচ্ছিলাম।

আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আটাশের কথা বল।

আকমল হোসেন প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করেন। মারুফ বাবার দিকে একমুহূর্ত তাকায়। হঠাৎ মনে হয়, এই বাড়ির সঙ্গে আজ থেকে বোধ হয় একটি মিসিং লিংক তৈরি হয়েছে। ও যা ধরতে পারছে না, তার সূত্র এই পরিবারের সবার কাছে একটি গোপন কৌটায় আছে। কেউ তা প্রকাশ করছে না।

মেরিনা তাগাদা দিয়ে বলে, হাঁ করে আছ কেন? তোমাদের দুর্গের কথা বলো।

বাড়িটি বেশ বড়। সামনে একটা বাগান আছে। বাগানের গাছগুলো বেশ বড় বলে একতলা বাড়িটা খুব ছায়াচ্ছন্ন। বলা যায়, বাড়িটার একটা স্নিগ্ধ জলে ভাব আছে। গেরিলারা অনবরত এই বাড়িতে যাতায়াত করে বলে ওই গাছের আড়াল বেশ সুবিধাজনক। তা ছাড়া বাড়িটার আরেকটা দিক হলো, গাড়ি নিয়ে চট করে ঢোকা যায়, চট করে বের হওয়া যায়। সবচেয়ে বড় দিক হলো, বাড়িটার মেঝে মাটি থেকে এক ফুট উঁচুতে। সে জন্য অস্ত্র লুকিয়ে রাখা খুব সুবিধাজনক। যে কেউ অনায়াসে বুঝতে পারবে না যে এই মেঝের নিচে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে।

শাকেরের সঙ্গে তোর কি আগরতলা বা মেলাঘরে দেখা হয়েছে?

একদিন দেখা হয়েছিল, আব্বা। ও সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য ৩ নম্বর সেক্টরে যোগ দিয়েছিল। ও ত্রিপুরার উষাবাজার শরণার্থী ক্যাম্পে প্রথমে ছিল। পরে শিমলাতে যায়। শিমলা ৩ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এর পরে ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আপনার ওর কথা মনে হলো কেন, আব্বা?

খুব সাহসী ছেলে ছিল। কোনো কারণ নেই। এমনিই মনে হয়েছে।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মারুফের মনে হয়, আবার একটা মিসিং লিংক ও অনুভব করছে। এবার বাড়িতে আসার পর এমনই মনে হচ্ছে বারবার। আগে কখনো এমন হয়নি। তাহলে কি ওর অবর্তমানে এ বাড়িতে একটা কিছু ঘটেছে, যার সূত্র ওর সামনে কেউ বলতে চাইছে না। ও বিষয়টা নিয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়।

ও ড্রয়িংরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েও যায় না। টেবিলের কোনায় হাত রেখে বলে, আব্বা, শাকেরের বাড়িতে সেদিন আমরা ওর বাবা-মা ও ভাইদের লাশ দেখেছিলাম। জেনিফারের লাশ দেখিনি। তাহলে কি আর্মি জেনিফারকে নিয়ে গিয়েছিল?

এসব আমরা অনুমান করতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি না।

তা ঠিক। তবে জেনিফার হয়তো শাকেরের সঙ্গে অন্য কোথাও সরে যেতে পারে। সন্ধ্যারাতেই।

আকমল হোসেন কথা বলেন না। আয়শা আগেই রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। কী রান্না হবে, খোঁজখবর করছেন। মেরিনা কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে যায়। একটু পর মারুফ ওর ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সরাসরি মেরিনাকে জিজ্ঞেস করে, যখন আমি ছিলাম না, তখন কি বাড়িতে কিছু ঘটেছিল, মেরিনা?

কী ঘটতে পারে, সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো। অন্য কিছু না?

বাব্বা, দারোগাগিরি দেখাচ্ছিস নাকি? তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর বয়স বেড়েছে। গম্ভীর হয়ে গেছিস।

তখন আলতাফ এসে খবর দেয় যে ফয়সল আর মানিক এসেছে।

চলো, ভাইয়া। ওরা নিশ্চয় পত্রিকাটা এনেছে। পত্রিকা?

গেরিলা নামে ওরা একটা পত্রিকা সাইক্লোস্টাইল করে বের করছে। চলো দেখি।

দুজনে ড্রয়িংরুমে আসে। আকমল হোসেন ওদের সঙ্গে কথা বলছেন।

বাহ্, সুন্দর হয়েছে। কাজে লাগবে। জায়গামতো ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়।

মেরিনা আপার জন্য পঁচিশ কপি এনেছি।

মারুফ পত্রিকা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে দেখে বলে, এটার খুব দরকার ছিল। আমি কয়েকটা কপি নিয়ে যাব। আগরতলায় বিলি করব।

মেরিনা খুশি হয়ে বলে, পত্রিকা বিলির কাজটা পেয়ে আমার ভালো লাগছে। পঁচিশ কপি বিলি করতে আমার তিন দিন লাগবে।

কাগজ বিলি করার সময় রেশমাকে তোর সঙ্গে নিস। ও বেশ চটপটে মেয়ে। কাজও করতে চায়।

তা নিতে পারি। ও বলেছে, যেকোনো কাজ পেলে করবে। ওকে যেন আমি সঙ্গে রাখি। আমি আজই ওদের বাড়িতে যাব।

আয়শা খাতুন ছেলেদের জন্য চা-পুডিং পাঠান। বাড়িতে কোনো যোদ্ধা ছেলে এলেই তার যত্ন থেকে কেউ বাদ পড়ে না। বলেন, ওদের কিছু না খাওয়ালে আমি শান্তি পাই না। ওরা মাথার ওপর মৃত্যু নিয়ে ঘোরে।

আকমল হোসেন ওদের চা-খাওয়ার কথা বলেন। ওদের বসিয়ে রেখে নিজে বের হন। যাবেন রামপুরা, গুলবাগ, উলন এলাকায়। যুদ্ধের আগে তিনি রামপুরা-উলন এলাকায় যেতেন। ব্রিজের কাছে গাড়ি রেখে নৌকা নিয়ে ঘুরতে যেতেন বিলে। বিলের লতাগুল্ম, সাদা-গোলাপি রঙের শাপলা, স্বচ্ছ পানিতে মাছেদের ঘোরাফেরা, নির্মল বাতাস, দূরের গাছপালা-ঘরবাড়ি ইত্যাদির স্মৃতি এখন মৃত্যু এবং বারুদের মাখামাখিতে পূর্ণ। আজ তিনি যাচ্ছেন ভিন্ন অবলোকনে। দেখবেন যুদ্ধ কতটা পূর্ণ হবে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে। একজন ইঞ্জিনিয়ার এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছেন। যোদ্ধাদের মনে হয়েছে, কাজটি করা দরকার। যদি একটি পাওয়ার স্টেশন উড়ে যায়, শহরের মানুষ ঘুরে তাকাবে। বলবে, আমাদের ধমনিতে পরাধীনতার গ্লানি নেই। আমরা নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করছি।

এই ঘোষণার কথা স্বীকার করছে যুদ্ধের বিরোধিতা যারা করছে তারা। তবে সরাসরি নয়, খানিকটা ঘুরিয়ে। তাতে অবশ্য সত্য আড়াল থাকে না। পূর্ব পাকিস্তানের

দুষ্কৃতিকারীদের শায়েস্তা করার জন্য জামায়াত নেতা গোলাম আযম ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেছেন। বলেছেন, দুষ্কৃতিকারীরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তারা যে ধরনের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, তা এ মুহূর্তে দমন করা দরকার। সে জন্য আলাদা বাহিনী গড়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে অটল। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় এমনই খবর ছাপা হয়। আকমল হোসেন খুঁটিয়ে পড়েন সেই খবর। শত্রুপক্ষের প্রতিটি বিষয় নখদর্পণে রাখা জরুরি। প্রয়োজনে নোট করেন, পাছে যদি ভুলে যান কিছু। বয়স তো হয়েছে!

বয়স! শব্দটা উচ্চারণ করে হাসলেন নিজের মনে।

আকমল হোসেন গাড়ি স্টার্ট দিয়েছেন। তাঁর গাড়ি এখন কাকরাইলে। তিনি সিদ্ধেশ্বরী হয়ে মালিবাগের মোড়ে বের হবেন। প্রথমে গুলবাগের দিকে যাবেন। উলন-বাড্ডা।

আবারও ভাবলেন, বয়স! বয়স থাকলে তিনি তো ওদের মতো অপারেশনে যেতেন। অন্তত সিটি টেররাইজিং অপারেশন করতে পারতেন। বয়স এখন বাধা। বয়স কখনো এমনই আচরণ করে। তার বুকের ভেতর এখন বয়স বেড়ে যাওয়ার অনুতাপ! নিজের জন্য তাঁর ভীষণ মায়া হয়।

তিনি ভেবে দেখলেন, গত মাসে রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। গভর্নর টিক্কা খান এই অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১। এই অর্ডিন্যান্সের বলে ১৯৫৮ সালের আনসার অ্যাক্ট বাতিল ঘোষিত হয়।

যেদিন এই অর্ডিন্যান্স জারি হয়, সেদিন তিনি আয়শাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন খবরটি।

আয়শা বলেছিলেন, বাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালিদের মুখোমুখি করানো হলো।

তিনি খবরের শেষটুকু না পড়েই বলেছিলেন, গোলাম আযমের মতো লোকেরা আছে না! তারা নিজেরাই দাঁড়িয়েছে। তাদের কেউ দাঁড় করায়নি, আশা। এখন অনেকেই পরিস্থিতির শিকার হবে।

আয়শা মাথা নাড়েন। বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য।

দেখো, এই অ্যাক্টে আনসার বাহিনীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে অর্পিত হবে।

আমরা তো শুনেছি, দেশের আনসার বাহিনীর অনেক সদস্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে সীমান্ত পার হয়েছে। আমাদের গেরিলাদের সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে।

সবই ঠিক আছে, এটুকু আমাদের পক্ষে গেছে, কিন্তু যারা যেতে পারেনি, তাদের কী হলো? এই দেখো, লিখেছে আনসার অ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আয়শা খাতুন চুপ করে থাকেন। ভাবেন, শত্রুপক্ষ এভাবেই নিজেদের অলিগলি তৈরি করে। সেই সব পথ ধরে এগোতে চায়। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে এগোতে পারে না। এটা ইতিহাসের সত্য। এই সব রাজাকারের দেশের মাটিতে বিচার হবে। হতেই হবে।

দুহাত মুষ্টিবদ্ধ হয় আয়শা খাতুনের।

আকমল হোসেন আবার বলেন, এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয়, প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের সব মানুষকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করা হবে। তাদের ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র দেওয়া হবে। তারা নির্ধারিত ক্ষমতাবলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে।

সবই বুঝলাম। ক্ষমতার অপব্যবহারেরও হুকুম দেওয়া থাকবে। অপব্যবহারের জন্যই তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া।

সেদিন আকমল হোসেন কাগজ হাতে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। ভাবছিলেন, যুদ্ধ এখন নানামুখী হবে। রাজাকাররা ছদ্মবেশে প্রতিবেশী হয়ে থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারেও রাজাকাররা ঢুকবে কি না, কে জানে! সুযোগের সন্ধানে ঘুরবে লোভী মানুষেরা। তারা স্বাধীনতা বোঝে না। বোঝে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ। এই সব মানুষকে চোখে চোখে রাখা যুদ্ধ সময়ের আরেকটি কাজ।

আকমল হোসেনের গাড়ি এখন মালিবাগ হয়ে গুলবাগের রাস্তায় ঢুকেছে। পেছন থেকে আলতাফ ডাকে, স্যার।

কিছু বলবে? ডাকছ কেন?

আমাকে দুই দিনের ছুটি দেবেন। গ্রামে যাব। জরুরি দরকার আছে, স্যার। আমাদের বাড়িতে সর্বনাশ হয়েছে।

কীভাবে জানলে? কে খবর দিল? হঠাৎ গ্রামে যাওয়ার তাড়া হলো কেন?

কালকে বাজারে গায়ের একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও বলেছে, আমার ছোট ভাই মোসলেম রাজাকার বাহিনীতে ঢুকেছে। আব্বা-আম্মার কথা শুনছে না। উল্টা আমার আব্বাকে শাসায়।

তুমি গিয়ে কী করবে? যে ছেলে বাবাকে মানতে চায় না, সে কি ভাইকে মানবে?

আমি প্রথমে ওকে বোঝাব। তারপর মাইর দেব। এর পরও কথা না শুনলে আব্বাকে বলব, ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতে।

ঠিক বলেছ। লড়াইটা শুরু হয়ে যাওয়াই ভালো। আমাদের জন্য নতুন উৎপাত শুরু হলো। অপেক্ষা করলে সময় নষ্ট হবে।

কবে যাব, স্যার?

তুমি যেদিন যেতে চাও, সেদিন।

ভাইয়াদের অপারেশন হয়ে যাক, তার পরে। অপারেশনের দিন তো আমাকে অস্ত্র বের করতে হবে।

তা তো হবেই। তুমি আমার সহযোদ্ধা। আমার বয়স হয়েছে না। তোমার মতো কঠিন কাজ তো করতে পারি না।

আপনি যা করছেন, তা এ দেশের শত লোকও পারে না।

তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো, আলতাফ।

গাড়ি পাওয়ার স্টেশনের খানিকটুকু দূরে থামান আকমল হোসেন। তারপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ডাব কেনেন। দুজনে ডাব খান। পাওয়ার স্টেশনের সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করেন। পাশের বাড়ি দেখেন। অকারণে মানুষ গোনেন, রাস্তায় হেঁটে যাওয়া এবং আশপাশের মানুষ। এলাকা মোটামুটি নিরিবিলি। সন্ধ্যার পর আরও ফাঁকা হয়ে যাবে। কাজ শেষে ওদের বেরিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

আকমল হোসেন বেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়িতে ওঠেন। আলতাফও খুশি। বলে, স্যার, গেরিলা ভাইদের খুব ঝামেলা হবে, না?

চুপ থাক। আর কথা না। কোন কথা কার কানে যাবে কে জানে!

তিনি গাড়ি স্টার্ট দেন। রামপুরার রাস্তায় উঠে গাড়ি উলন-বাড্ডার দিকে ছুটতে থাকে। পেরিয়ে যায় রেললাইন। বস্তি। আশপাশের বাড়িঘর। কাঁচা বাজার। সামনে টেলিভিশন সেন্টার। টেলিভিশনের টাওয়ার। আকাশসমান উঁচু হয়ে আছে। আলতাফ টাওয়ারের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে। পার হয়ে যায় গাড়ি। ব্রিজের কাছে এসে থামে। দুজনে বিলের ধারে দাঁড়ান। দূরত্ব হিসাব করেন। যদি এই পথে যেতে হয় ওদের? কতগুলো দোকান আছে, কয়টা বাড়ি আছে, তা হিসাব করেন। কোন বাড়ির

সামনেটা রাস্তার দিকে, কোনটা উল্টো দিকে, তা-ও দেখেন। দোকানিদের চেহারা দেখেন। বিভিন্ন দোকানে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা কেনেন। সবকিছুই ওদের জানিয়ে দেবেন। তারপর আবার গাড়িতে ওঠেন। উলন পাওয়ার স্টেশন পার হয়ে গাড়ি থামান। পুলিশ ও দারোয়ান গেটের পাহারায় আছে। তিনি বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি না করে ফিরে আসতে থাকেন বাড়ির দিকে। বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে ওরা তাকে সন্দেহ করতে পারে। গাড়িতে স্টার্ট দেন। পরক্ষণে ভাবলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকার পাশের মাঠে রাজাকারদের ট্রেনিং হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। গাড়ি চালালেন সেদিকে। একটি চক্কর দিয়ে বাড়িমুখো হলেন। তিনি জানেন, এই ট্রেনিং দেড় থেকে দুই সপ্তাহ হয়। মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মাঠেও ট্রেনিং হচ্ছে।

আলতাফ জোরে জোরেই বলে, একটা অস্ত্র পেলে ওদের ফিনিশ করে দিতাম। বাঙালি কুত্তার বাচ্চা। নিজের দেশের বিরুদ্ধে যেতে লজ্জা করে না। আলতাফের ক্ষোভ প্রকাশে আকমল হোসেন মৃদু হাসেন। এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে কি না, তা-ও ভাবেন। আশপাশের লোকেরা এই বাড়িকে কতটা নজরদারিতে রেখেছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিবেশীরা এখন পর্যন্ত অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায়নি। এসব ছেলে কারা আসা-যাওয়া করে, এ প্রশ্ন কাউকে করেনি। আলতাফকেও না। গাড়ি গেটের সামনে এসে দাঁড়ালে আলতাফ দরজা খুলে নামে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় ভাবেন, মারুফের কাছে বাড়িটি অন্য রকম হয়ে গেছে। এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে পরদেশী তাকে কোথায় খুঁজে পাবে। ও তো শহীদদের তালিকা দিতে আসবে, এমনই তো কথা বলে গেছে ও। তাহলে?

তিনি গ্যারেজে গাড়ি রেখে ঘরে ঢুকলেন। মেরিনা এগিয়ে এল।

আব্বা, আপনি ভীষণ ঘেমে গেছেন। শরবত দেব? নাকি ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস পানি দেব?

কিসের শরবত, মা?

বেলের, আব্বা।

দাও, মা। বেশি ইচ্ছে করলে দুগ্লাসও খেতে পারি।

তিনি ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। মারুফের সঙ্গে আরও কয়েকজন ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য আছে। ছেলেরা দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। নজরুল বলে, কেমন দেখলেন, আঙ্কেল?

অপারেশন সাকসেসফুল হবে। এলাকা এখনো নিরিবিলি। যে কজন পুলিশ আছে, ওরা তোমাদের সঙ্গে পারবে না। উলন এলাকা আমার কাছে খুবই নিরাপদ মনে হয়েছে। বাড্ডার ঝুঁকি একটু বেশি। পাশেই রামপুরা টেলিভিশন সেন্টারে কড়া পাহারা আছে তো, এ জন্য। তবে তোমরা পারবে। এ আমার গভীর বিশ্বাস। বিল সাঁতরে সরে যেতে পারবে।

আশার কথা। আমাদের ভরসার জায়গা আপনি যেভাবে বললেন তাদের মনের জোর দ্বিগুণ হয়ে গেল।

আশাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরা আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ছ ছেলেরা।

মেরিনা শরবত দিলে তিনি এক চুমুকে শেষ করেন। বললেন, আরেক গ্লাস দাও, মা।

বাইরে কি খুব রোদ? গরম কি বেশি, আঙ্কেল?

বেশি তেতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে রাজাকারদের ট্রেনিং দেখে। অস্ত্র দিয়ে ওদের দাম্ভিক বানানো হচ্ছে। ওদের সামনে কোনো আদর্শ নেই বলে ওরা অস্ত্রের যত্রতত্র ব্যবহার করবে।

এই শয়তানদের আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের লড়াই ওদের বসদের সঙ্গে।

দেখা যাক। মনে রেখো, এই শয়তানগুলো স্বাধীন দেশে থাকবে। ওদের বসরা যখন দেশ ছেড়ে পালাবে, তখন এদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

ছেলেরা এই কথা শুনে চুপ করে থাকে। একজন বলে, তাহলে এদের বোঝা কি আমাদের টানতে হবে? ওরা কি দেশটার বিরুদ্ধে আরও ষড়যন্ত্র করবে? নাকি লেজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকে থাকবে?

দ্রুত এদের বিচার না হলে কী হয়, বলা যায় না।

আকমল হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে আরও বলেন, তবে আমি বিশ্বাস করি, স্বাধীন দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে দেশ কলঙ্কমুক্ত হয় না।

ঠিক আঙ্কেল। স্বাধীন দেশে এই বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।

আজ আমরা উঠি। কাল বিকেলে এখান থেকে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা।

ওরা চলে গেলে আকমল হোসেন বাথরুমে ঢোকেন। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়, বিলের পানির নিচে তিনি ডুবে আছেন। মাথার ওপর সাদা শাপলা। হাজার হাজার সাদা শাপলায় ভরে আছে বিল। ওপর থেকে পানি দেখা যায় না। তিনি যখন মাথা তুলবেন, তাঁর মাথার ওপরও সাদা শাপলা পতাকার মতো উড়বে।

পরদিন উলনের দল বেরিয়ে যায়

পরদিন উলনের দল বেরিয়ে যায় গাজীর নেতৃত্বে। ওরা যখন বেরিয়ে যায় তখন শুনতে পায়, আয়শা খাতুন ডাইনিং স্পেসে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছেন, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে। মুক্ত করো হে ভয়...।

ছেলেরা সেই ধ্বনি বুকে নিয়ে বের হয়। কেউ পেছন ফেরে না। ওরা কোথাও থেকে গাড়ি জোগাড় করেছে। আকমল হোসেনের তা আর জিজ্ঞেস করা হয় না। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মেরিনা নিজের ঘরে। আলতাফ গেট খুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ করে দেয়।

আজ ওরা ট্রান্সফরমার ওড়াবে। সঙ্গে নিয়েছে কুড়ি পাউন্ড পিকে ও পনেরো ফুট প্রাইমা কর্ড, প্রায় তিন মিনিট-মেয়াদি সেফটি ফিউজওয়্যার আর ডেটোনেটর।

গাজী যেতে যেতে বলে, আমাদের পরিকল্পনার কথা সবার তো মনে আছে?

অন্যরা সাড়া দেয়, আছে।

গাজী তার পরও পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলে, আমরা ঠিক করেছি, ১০ পাউন্ড করে পিকের দুটি চার্জ প্রাইমা কর্ড দিয়ে লাগিয়ে ট্রান্সফরমারের দুই পাশে ফিট করা হবে। ঠিক?

হ্যাঁ, ঠিক। সবকিছু আমাদের মনে আছে। তার পরও তোমার কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগছে। কারণ, কথাগুলো খালাম্মার গুনগুন স্বরের গানের মতো। ওই গানের বাকিটুকু আমাদের কানে আসবে অপারেশন শেষ করে ফেরার পথে।

কথাগুলো হাফিজ একটানে বলে। সবাই কান পেতে শোনে। সবারই শুনতে ভালো লাগছিল।

ও থামলে গাজী নিজের নাম উচ্চারণ করে বলে, অপারেশনের অগ্রগামী দলে থাকবে গাজী আর মারুফ। ওদের কাছে থাকবে স্টেনগান।

ঠিক। আমরা মনে রেখেছি!

হাফিজ ট্রান্সফরমারের গায়ে চার্জ বসাবে।

জিন্নাহ একটি রিভলবার নিয়ে গেটের পাহারায় থাকবে।

মতিন টেলিফোন লাইন কেটে দেবে।

গাজী থামলে মারুফ জোরের সঙ্গেই বলে, স্টেনগানের সঙ্গে আমরা গ্রেনেড ৩৬ নিয়েছি।

গাড়ির ভেতরে শব্দ গমগম করে, অপারেশনের সময় রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নয়টা।

সময়টা আমাদের জীবনমরণ।

সময়টা আমাদের স্বাধীনতার জন্য।

তখন সবাই একসঙ্গে উচ্চারণ করে, জয় বাংলা। জোরে চেঁচাতে পারে। গাড়ির ভেতরে মৃদু শব্দে ধ্বনিত হয় জয় বাংলা।

একই রকমের কথা বলে গুলবাগ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যোদ্ধারা। ওরা ক্র্যাক প্লাটুনের আটজন। ছোটখাটো একটা দল। পুলু বলে, আমরা নিয়েছিলাম ৪০ পাউন্ড পিকে।

কুড়ি পাউন্ড পিকে দিয়ে চার্জ বানানোনা হয়েছে ট্রান্সফরমারের গায়ে লাগানোর জন্য।

তোমরা সবাই আমাকে দায়িত্ব দিয়েছ ট্রান্সফরমারের গায়ে চার্জ বাধার জন্য। আমার কাছে ২৪ ফুট প্রাইমা কর্ড আছে। এই বিস্ফোরক কর্ড এক্স দিয়ে আমি চার্জ বাঁধব, প্রয়োজনে...

পুলু কথা বাড়ায় না। ভাবে, অন্যরা বলুক প্রয়োজনে কী করতে হবে। ওর থেমে যাওয়ার পর একমুহূর্ত সময় মাত্র। সবাই একসঙ্গে বলে, প্রয়োজনে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত।

সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অপেক্ষার সময় নেই।

আমাদের সময় রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নয়টা। একমুহূর্ত এদিকওদিকে হওয়া চলবে না।

আমরা সময়ের সন্তান। সময়কে জয় করে বীরের মতো ঘরে ফিরব। আমরা প্রস্তুত।

ওরা আটজন এগিয়ে যায় গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনের দিকে। ততক্ষণে ক্র্যাক প্লাটুনের ছয়জন সদস্য উলন পাওয়ার স্টেশনের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

হ্যান্ডস আপ।

ওদের হুকুমে কেঁপে ওঠে পুলিশ ও দারোয়ান। তিনজন ওদের রিভলবারের মুখে দাঁড় করিয়ে রাখে। অন্যরা ট্রান্সফরমারের গায়ে চার্জ বসায়।

সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে ওদের সামনে। সময় এখন ওদের সহযোগী সঙ্গী। বন্ধু। ওদের মতো সাহসী যোদ্ধা। ওদের জীবনে এমন সময় তো আগে আসেনি। ওরা সবাই সময়ের সন্তান। সময়ের সেই সন্তানেরা গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনে চার্জ বাধে ২৪ ফুট প্রাইমা কর্ড দিয়ে। কর্ডের মাঝখানে বসানো হয় ডেটোনেটর ২৭। দেওয়া হয় এক মিনিট ফিউজওয়্যার। চার্জ লাগানোর পর পুলু খেয়াল করে, যেভাবে চার্জ লাগানো হয়েছে, তাতে ট্রান্সফরমার ধ্বংস হবে, কিন্তু বেস-বার ওড়ানো যাবে না।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বাশার ফিসফিসিয়ে বলে, যা ভেবেছিস, সেটাই ঠিক। একমুহূর্ত দেরি না। পুলু দ্রুত নতুন পজিশনে চার্জ লাগায়। মুহূর্ত সময় মাত্র। ওদের সামনে সময় দাঁড়ায় না। সময় উড়ে যায়। নতুন পজিশনে চার্জ লাগানো শেষ। ৮টা ৪৪ মিনিটে পুলু ইগনাইট করে। বেরিয়ে আসে সবাই। দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। ৮টা ৪৭ মিনিটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্রান্সফরমারের মাথা উড়ে গিয়ে পড়ে পাশের বাড়ির টিনের চালের ওপর। অন্ধকারে ডুবে যায় এলাকা।

এই বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পর বিস্ফোরিত হয় উলন পাওয়ার স্টেশন।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা। অন্ধকার নেমে আসে। শব্দ বুকে নিয়ে ওরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যেতে থাকে। গুলবাগ এলাকা থেকে সরে পড়তে অসুবিধা হয় না। আটজনের দল এক এক করে আলাদা হয়ে যায়। উলন থেকে সরে যাওয়ার সময় ক্র্যাক প্লাটুনের ছয়জন দেখতে পায়, টেলিভিশন সেন্টারে পাহারারত আর্মি সেপাইরা রাস্তার ওপর পজিশন নিয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ওরা বিলের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। বর্ষার আকাশ হলেও ঘন কালো মেঘ নেই আকাশে। চিতসাঁতার দিয়ে যেতে যেতে একজন বলে, ভালোই তো লাগছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পরে এমন বিলের জলে সাঁতার কাটতে। আগুন-বারুদমৃত্যু-রক্ত-পানি এবং আমাদের জীবন এখন একই সমান্তরালে। এ বড় গভীর আনন্দ।

সে জন্য আকমল আঙ্কেল বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

সে জন্য তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় তোমাদের শরীর তোমাদের না।

এই খেসারত সবচেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে আমাদের বোনদের। ওদের প্রতিরোধও কঠিন। আমরা ওদের স্যালুট করি।

হাফিজের কন্ঠস্বর জলে ভেজা স্বরের মতো গাঢ় বিষণ্নতায় দমে থাকে। কেউ আর কথা বলে না। দূর থেকে শোনা যায় পুলিশের বাঁশির শব্দ। হইচই। মানুষের কন্ঠস্বর

উচ্চকিত। এলাকার রাজাকাররা হয়তো জড়ো হয়েছে। ওরা তোলপাড় করবে চারদিক। ওরা অস্ত্র ও ক্ষমতা পেয়েছে। দুর্ভাগ্য এই দেশের। দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার। এ দেশের দামাল ছেলেদের পাশাপাশি ওদের মনে হয় ভুইফোড় কেউ। নইলে জলদস্যুদের অবৈধ সন্তান, যারা এ দেশে শুধুই লুটপাট করতে এসেছে। এ দেশের মাটি, বৃষ্টি, গাছপালাকে নিজেদের মনে করে না। এমন কুসন্তানদের নিয়ে কী করবে স্বাধীন দেশ! ওরা মন খারাপ করে বিলের ধারে পৌঁছে যায়। ওদের মনে হয়, ওরা শুনতে পাচ্ছে আয়শা খাতুনের গুনগুন ধ্বনি।

আকমল হোসেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন, ওরা এখন আর অপারেশনে নেই। সময়ের হিসাব তা-ই বলে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওদের অপারেশনের সময় শেষ হয়েছে। ওরা এতক্ষণে নিজ নিজ হাইডে পৌঁছে গেছে। গুলবাগের ছেলেরা তো পৌঁছে গিয়েছে। আর উলনের ছেলেদের বিল সাঁতরাতে হলে ওদের সময় লাগবে। তবে নিশ্চিত যে ওরা নিরাপদে আছে। ওদের মাথার ওপরে সাদা শাপলা লেগে আছে। আকমল হোসেন মনে মনে স্বস্তি বোধ করেন।

আয়শা এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বলেন, খাও। তোমার পিপাসা পেয়েছে।

দাও। আকমল হোসেন এক চুমুকে গ্লাস শেষ করেন। হাত দিয়ে মুখ মুছে বলেন, বুঝতে পারছি, খুব পিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু টের পাইনি যে পিপাসা পেয়েছে।

তোমার উৎকণ্ঠার কারণে পিপাসার কথা মনে করতে পারোনি। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি যে তোমার পানি খেতে হবে।

তাই তো মনে হচ্ছে। তুমি এভাবে বুঝতে পারো বলেই তো আমার এমন সহজ বেঁচে থাকা। এ জন্য তোমার আগে আমি মরতে চাই, আশা।

দেখো, বাজে কথা বলবে না।

আকমল হোসেন সরল হাসি হাসেন। আয়শার বিবেচনার কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি জেগে থাকে তার হাসিতে। তিনি বিষয়টি উপভোগ করেন। আয়শা ভালোবাসার হাসিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ফোন বেজে ওঠে।

তিনি দ্রুত পায়ে ফোন ধরতে যান। ফোনের অপর পাশে মারুফ।

আব্বা, আমরা হাইডে পৌঁছে গেছি। অপারেশন সাকসেসফুল।

লাইন ছেড়ে দেয়। তিনি কথা বলার সুযোগ পান না। রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আয়শা কাছে এসে দাঁড়ান।

কী হয়েছে? রিসিভারটা রাখো। এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। ওর সঙ্গে আরও একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম।

ও হয়তো ক্লান্ত। কে জানে, বিল সাঁতরে ওদের যেতে হয়েছে কি না! এখন কি আমাদের মন খারাপ করার সময়? ওরা সাকসেসফুল হয়েছে এই আনন্দ এখন আমাদের সবচেয়ে বড়। বাকি, ওরা ওদের মতো থাকুক।

ঠিকই বলেছ। বারবার আমিই ভুল করছি।

এটা কোনো ভুল নয়। আসলে তোমার উদ্বেগ কাটেনি।

ফোন আবার বেজে ওঠে। অপর প্রান্তে পুলু।

আঙ্কেল, সবকিছু ঠিকঠাকমতো শেষ হয়েছে। আমরা হাইডে পৌঁছে গেছি।

ফোন কেটে যায়। এবারও কথা বলার সুযোগ পেলেন না। কিন্তু মন খারাপ করলেন না। ভাবলেন, সময়কে বোঝার দায় এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

নিজের ঘরের টেবিলে এসে নানা কাগজপত্র খুলে বসলেন। ডায়েরির পৃষ্ঠায় লেখা নানা তথ্যের ওপর নজর পড়ে। চীন নগ্নভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো বাণীতে পাকিস্তানের পাশে থাকার কথা বলেছেন। পাকিস্তান সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন। আকমল হোসেন নানা কিছু মাঝেমধ্যে নোট করেন। লন্ডন টাইমস পত্রিকার প্রতিনিধি মাইকেল হনসবে তার রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যাবিষয়ক খবরকে ভারতের কাল্পনিক প্রচারণা বলে লিখেছেন। মরক্কোর সংবাদপত্র পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, তাঁর সরকার বাংলাদেশকে কখনোই স্বীকৃতি দেবে না। ইরান ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও একই সুরে কথা বলছেন। তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে মুসলিম বিশ্বকে এক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

এসব নোট করে আকমল হোসেন লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে নিচে লিখলেন, বাস্টার্ড। মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে সাপোর্ট দিতে শেখেনি।

আবার ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টান।

শান্তি কমিটির খবরের ওপর ঝুঁকে পড়েন। বেশ কিছুদিন আগে শহরের বিভিন্ন ইউনিট ও মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠনের কথা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেসব কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে লিয়াজো অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা কাজ শুরু করেছে।

গতকালই আকমল হোসেন মারুফকে বলেছিলেন, স্বাধীনতার পক্ষের বাঙালিদের চিহ্নিত করে ক্যান্টনমেন্টে আর্মির কাছে তাদের নামের তালিকা পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে

লিয়াজোঁ অফিসগুলোর মূল কাজ। লিয়াজো অফিসগুলোকে রাজাকার-দালালেরা নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবে। বিষয়টি আমাদের খুব ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে।

এ নিয়ে আমাদের ভাবনার বড় জায়গা রয়েছে, আব্বা। ওরা এখন যা খুশি তা-ই করবে।

হ্যাঁ, তা করবে। যারা নিরীহ বাঙালি, তাদের ওপরও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাবে।

আকমল হোসেন ডায়েরি বন্ধ করেন।

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উল্টান।

দৃষ্টি আটকে যায় একটি খবরে-কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী গভর্নর হাউসে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সেনাবাহিনীর পাশে থেকে কাজ করবেন বলে তাকে আশ্বাস দেন।

এমন আরও খুঁটিনাটি তিনি নোট করেন। কিন্তু ঘুরেফিরে শান্তি কমিটির কাজের বিস্তার তাকে ভাবিয়ে তোলে। এসব দালাল দেশজুড়ে ছড়াতে থাকবে। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা বাড়বে।

প্রচণ্ড অবসন্ন বোধ করেন তিনি। নিজেদের মানুষগুলো নিজেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যুদ্ধের আরেকটি ফ্রন্ট ওপেন হয়েছে। দেখা যাক কত দূর যেতে পারে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী দালালেরা।

আয়শা কাছে এসে দাঁড়ান। ঘাড়ের ওপর হাত রাখেন। বাম হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করেন।

খাবে চলো। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তেমন কিছু রান্না হয়নি।

আজ রাতে খেতে চাচ্ছি না। কিছু ভালো লাগছে না। খিদে নেই বলে মনে হচ্ছে।

খাওয়া নিয়ে তালগোল পাকানো চলবে না। ওঠো। দুমুঠো খেয়ে শুয়ে পড়ো। এটাও তুমি জানো যে আমি তোমাকে না খেয়ে শুতে দেব না। এসো।

আয়শা খাতুন হাত ধরে টানেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলেন, নিজে নিজে এসো। তোমার আগে আমি চলে গেলে কে তোমাকে এভাবে খেতে ডাকবে!

আহ, আশা, এভাবে বলবে না।

আয়শা খাতুন সামনে এগিয়ে যান। পেছন ফিরে আর তাকান না। যেন আকমল হোসেনের দীর্ঘশ্বাস এবং বেদনাভরা কন্ঠস্বর তিনি শুনতে পাননি।

খেতে বসলে আলতাফ-প্রসঙ্গ ওঠে।

আয়শা বলেন, আলতাফ কাল বাড়ি যেতে চাচ্ছে। তোমার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে। আমি ওকে যেতে দিতে চাই। ওরা বাবা গভীর পারিবারিক সমস্যায় আছে।

ওকে ছেড়ে দিতে আমার মন চায় না। কখন কী খবর হবে কে জানে! তুমি একা একা কতটা সামলাতে পারবে, কে জানে! ও যখন যাওয়ার কথা বলল তখন আমার বুক ধক করে উঠল। বুঝলাম, আমাদের কাছে ও কত বড় একটা ভরসার মানুষ।

ওর ভাই রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, আশা। ও ঢাকায় বসে ভাইকে কতটা শাসন করতে পারবে? ওকে আমাদের যেতে দেওয়া উচিত। ঘুরে আসুক বাড়ি থেকে। বাবা-মাকেও দেখে আসুক।

আয়শা চুপ করে থাকেন। মেরিনা বলে, আলতাফ ভাই যে কয়দিন থাকবে, সে কয়দিন আমরা না হয় আরেকজনকে বাড়িতে রাখতে পারি, আব্বা।

আয়শা নিজেই বাধা দিয়ে বলেন, না, এ বাড়িতে চট করে কাউকে আনা যাবে না। কারণ, এটা কোনো সাধারণ বাড়ি নয়। এটা একটা দুর্গবাড়ি।

আকমল হোসেন এক লোকমা ভাত মুখে পুরে বলেন, ঠিক। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। শান্তি কমিটি পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্য বড় একটা জাল ছড়িয়েছে। ওরা প্রতিটি জেলা-মহকুমা-গ্রাম পর্যন্ত কমিটি গঠন করে নির্যাতনমূলক কাজের প্রচার চালাচ্ছে। কয়দিন আগে সেন্ট্রাল শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়েরউদ্দিন প্রেস রিলিজ দিয়েছেন। তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গিদের উসকানি দিচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা করতে পারবে না, এরা তার দ্বিগুণ করবে। এরা মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকবে। সেনাবাহিনীকে পথ দেখাবে।

মেরিনা মাথা চেপে বলে, উহ্, মাগো।

আয়শা মাথা নেড়ে বলেন, তোমার কথার সূত্র ধরে বলতে হয় যে সেনাবাহিনীকে সরাসরি চেনা যাবে। এদের চেনা যাবে না। এরা হলো গুপ্ত ঘাতক।

একদম ঠিক। এদের সব ধরনের লেবাস থাকবে।

অকস্মাৎ সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনজনে নিঃশব্দে ভাত খায়। যেভাবে খেলে মানুষের মনের তৃপ্তি হয়, এ খাওয়া সে খাওয়া নয়। এটি রুটিন খাওয়া। কোনো রকমে খাদ্যকে পেটের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া মাত্র। যে খাদ্য বেঁচে থাকার একটি শর্ত। এই শর্ত না মানলে একটু আগে চলে যাওয়ার কথা যে আয়শা বলেছে, তা-ই ঘটবে।

তিনজনের কেউই রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারল না।

মেরিনা অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রাখল। বই পড়ার চেষ্টা করল। পুরো খাতা আঁকিবুকি-হিজিবিজিতে ভরিয়ে ফেলল। পায়চারি করল। পানি খেল। অস্বস্তি ওকে জাপটে ধরে রাখল।

ও দুদিন ধরে বিভিন্ন বাড়িতে গেরিলা পত্রিকা পৌঁছে দিয়েছে। যুদ্ধের নানা খবর শুনেছে। প্রবাসী সরকারের খবর, চরমপত্র ইত্যাদি সবকিছু আলোচনায় আসে। চরমপত্র প্রচারের প্রশংসা করে সবাই। অবরুদ্ধ শহরে চরমপত্র শোনার অপেক্ষায় থাকে সবাই। কখনো আলোচনা জমে যায়। তখন আর দ্রুত উঠে পড়তে পারে না ও। যুদ্ধের হিসাব-নিকাশে ডুবে যায় পরিবারের সবাই। কোথাও দুপুরের ভাত খেতে হয়। যুদ্ধের পরিবেশ সবখানে আছে। কাছের কাউকে পেলে অন্যরা মন খুলে কথা বলে। বাড়িতে যা আছে, তা উজাড় করে। শুধু নুসরাতের বাসায় গিয়ে মন খারাপ করে ফিরল ও। গুম হয়ে থাকল। বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলল না। বাবার কথায় মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, যুদ্ধের ফ্রন্ট বাড়ছে। এসব ছদ্মবেশী কাছের মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনের দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা মাঝেমধ্যে দেখাশোনার জায়গা নষ্ট হলো। নিজের মর্যাদাকে উপেক্ষা করে ওরা নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কখনো বুঝে, কখনো না বুঝে। কখনো লোভে, কখনো ব্যক্তির স্বার্থপরতায়। নইলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পরিবারের ছেলে কী করে নিজে নিজে গিয়ে রাজাকারবাহিনীতে নাম লেখায়?

নুসরাতের কলেজপড়ুয়া ভাই নওশীন রাজাকার হয়েছে। ট্রেনিংও নিয়েছে। ওদের বাড়িতে এখন চরম অশান্তি চলছে। বাবা ওকে বলেছেন, বাড়ি ছাড়ো। আমি একমুহূর্তের জন্য তোমার মুখ দেখতে চাই না।

নওশীন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলেছে, পাকিস্তানি সেনারা নুসরাতকে তুলে নিতে এলে তখন আমাকেই খুঁজবে তোমরা। এখন যেতে বলছ, যাচ্ছি। আর আসব না।

বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন, আসিস না। তুই আমার একা সন্তান না।

এখন বাড়িতে সবাই চুপ। কষ্ট ওর মায়ের মনে বেশি। ঠিকমতো কাঁদতে পারছে না। নুসরাত বলে, মায়ের কষ্ট দুই ধরনের। ছেলেটা ঢাকা শহরে থেকেও বাড়িতে নেই।

আবার স্বাধীনতাযুদ্ধে উল্টো পথে চলে গেল ছেলেটা। মা কারও সঙ্গেই মুখ খুলে কথা বলছে না। একদম নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছেন।

তুই কী মনে করছিস?

নষ্টকে সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। গেছে, ভালো হয়েছে। আমিও ওর মুখ দেখতে চাই না। এমন একটি পরিবারে থেকে ও কী করে একা একা রাজাকার হলো? ও তো যুদ্ধ করার জন্য চলে যেতে পারত।

মেরিনা ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, আস্তে বল। খালাম্মা শুনবে।

আম্মা আমার মনোভাব জানে। আমি রেখেঢেকে কথা বলি না। নওশীন আরও বেশি জানে। সে জন্য আমাকে পাকিস্তানি আর্মির ভয় দেখায়।

আমার সঙ্গে যাবি?

কোথায়?

আমাদের বাড়িতে। দুদিন থেকে আসবি।

না। আমার কিছু ভালো লাগে না। নওশীনের আচরণে আমার পৃথিবী ভেঙে পড়েছে। আমি ঠিক করেছি, সোয়েটার বুনব। কামাল ভাই ফোন করে সোয়েটার বানাতে বলেছেন। সামনের শীতে মুক্তিযোদ্ধাদের এক শ টা সোয়েটার দেওয়ার ভাবনা মাথায় নিয়েছি।

আমিও বানাব। মাকে বললে আমাকে উল কিনে দেবেন। মারুফ ভাইয়া সোয়েটার নিয়ে যাবে ক্যাম্পে।

হ্যাঁ, বানাবি। আমরা দুজনে মিলে অনেক বানাব। এটাও একটা বড় কাজ।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নুসরাতের দৃষ্টি। ও মেরিনাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমাদের যুদ্ধে জিততে হবে, মেরিনা। আমরা পরাজিত হব না।

মেরিনা রিকশায় উঠলে বলেছিল, নওশীনের কথা বাড়িতে কাউকে বলিস না। ও আমাদের বাড়ির একটা কুলাঙ্গার। সেদিন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করি।

মেরিনা ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, শান্ত হ। আমাদের আবার দেখা হবে।

এখন মনে হচ্ছে একজনকে শান্ত হতে বলা সহজ। কিন্তু কাজটি কি অত সহজ! ওর নিজেরই তো ঘুম আসছে না। ওকে কথা দিয়েছে বলে বাবামাকেও বলতে পারছে না।

শেষরাতে ঘুম এলে গভীর স্বপ্নে তলিয়ে যায় মেরিনা। স্বপ্ন দেখল, ও আর নুসরাত যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চারদিকে প্রবল গোলাগুলি। ওদের ওপরে বৃষ্টির মতো গুলি পড়ছে। ওরা হেঁটেই যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা যে দ্বীপে পৌঁছায়, সেখানে অজস্র শহীদের সমাধি। কোথাও এক ইঞ্চি জমি খালি নেই।

ও নুসরাতের হাত চেপে ধরে বলে, আমরা কীভাবে এই দ্বীপে হাঁটব। পা রাখার জায়গা নেই।

পেছন থেকে কে যেন এসে হাত ধরে।

ওর হাত ধরে বলে, এসো আমার সঙ্গে।

তুমি কে? তোমাকে কোথায় যেন আমি দেখেছি।

আমার নাম জেবুন্নেসা।

ঘুম ভেঙে যায়। আশ্চর্য হয় মেরিনা। বিড়বিড় করে বলে, জেবুন্নেসা। তোমার শহীদ হওয়ার খবরটি আমি মারুফকে দিতে পারিনি। তোমার চিঠিও না। আমি যদি শহীদ হতাম এবং তোমার হাতে এমন একটি কঠিন দায়িত্ব থাকত, তাহলে তুমি কী করতে, জেবুন্নেসা? আমার আরেকটি গভীর স্বপ্নে তুমি আমাকে এই পরামর্শটি দিয়ে কিন্তু। মনে থাকবে তো, জেবুন্নেসা!

মেরিনা দুই হাতে চোখের পানি মোছে। দেখতে পায়, পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে ভোরের আলো আসছে ঘরে। বোঝা যায়, দিনের প্রথম আলো নয়। রোদ উঠেছে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে শহর। মেরিনা আড়িমুড়ি ভাঙে।

পরদিন আলতাফ চলে যায় গ্রামের বাড়িতে। সবাইকে আশ্বস্ত করে বলে, দুই দিন আসা-যাওয়া, দুই দিন বাড়িতে থাকা। চার দিনের বেশি থাকব না, স্যার। পথে যদি কোনো ঝামেলা না হয়, বাড়িতে যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তাহলে দেরি হওয়ার কোনো কারণই হবে না। সবার জন্য তালের রসের গুড় নিয়ে আসব। আপনারা বোধ হয় তালের রসের গুড় খাননি।

হেসে ফেলেন আয়শা।

ঠিক বলেছ, আমরা তালের রসের গুড় খাইনি। তবে ভেবে অবাক হচ্ছি, এত কিছুর মধ্যে তোমার একটা কিছু আনার তাগিদ থেকেই গেছে। নাকি আলতাফ?

ও মাথা চুলকে হাসে। বলে, একটা কিছু আনতে তো হবেই। খালি হাতে আসলে আমার মা বেশি রাগ করবে। আমি তো জানি, মা পারলে পিঠে-পুলি বানিয়ে দেবে। বাড়ির অবস্থা কেমন আছে কে জানে।

আকমল হোসেন হাসতে হাসতে বলেন, যুদ্ধ কি ওর আতিথেয়তার জায়গাও বন্ধ করে দেবে, আয়শা! বাঙালির প্রাণের টানই এমন। এটা আমাদের কালচারের অংশ। আমরা এর বাইরে যেতেই পারব না।

বিকেলে আলতাফ চলে যায়।

আলতাফ চলে যাওয়ার পরপরই ক্র্যাক প্লাটুনের ছয়জন সদস্য আসে। আকমল হোসেনের সঙ্গে কথা বলবে ওরা।

নেহাল বলে, ফার্মগেট একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ওখান থেকে বিভিন্ন অপারেশন চালাতে হবে। এলাকাটি জঙ্গলে প্রায় ভরা। ওখানে আমাদের একটি ঘাঁটি দরকার।

আমাদের কোনো বন্ধুর বাড়ি যদি না থাকে, তাহলে একটি বাড়ি ভাড়া করা যায়। সে জন্য আমাদের খোঁজ নিতে হবে।

আমরা খোঁজ নিয়েছি, আঙ্কেল। আপনাকে নিয়ে যাব। ওই গাছগাছালির মধ্যে গেলে আপনার ভালো লাগবে। যে বাড়িটা পছন্দ করেছি, সেটিও চমৎকার। একতলা বাড়ি। দেয়াল পাকা, ওপরে টিন। মেঝে খুঁড়ে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা যাবে।

তাহলে চলল, কাল সকালে গিয়ে দেখে আসি। যার বাড়ি তার সঙ্গে কথা বলব। ভাড়ার টাকা আমি দেব।

যে বাড়িটি আমরা ঠিক করেছি, তার অবস্থানও খুব ভালো, আঙ্কেল। ফার্মগেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে আর্মি নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে, সেখানে আমাদের অপারেশন হতেই হবে। নইলে নিজেরাই নিজেদের কাছে জবাব দিতে পারব না।

আকমল হোসেন হাঁ করে নেহালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছেলেটি কত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলছে। পরক্ষণে নিজেকে নিজেই উত্তর দেন, ওরা তো এই সময়ের শ্রেষ্ঠ

সন্তান। ওরা তো এমনই হবে। ওদের নিয়ে এভাবে ভাবাই উচিত নয়। ভাবলে, নিজের কাছে নিজেকে ছোট হতে হবে।

নেহাল আবার বলে, তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা মিলন ভাইয়ের বাড়ি আছে ফার্মগেট এলাকায়। চারদিকের ঘন গাছপালার কারণে বাড়িটা বেশ নিরাপদ। তিনি বলেছেন, দরকার হলে তিনি তার নিজের বাড়িটা দেবেন।

বাহ, বেশ তো। তবে বেশ সাবধানে কাজ করতে হবে। রাজাকারদালালেরা শহরে বাড়ছে। কোনো কিছু ঠিক করার আগে ভালো করে দেখেশুনে নেবে। তোমরা কোন বাড়িতে আগে অবস্থান নেবে, ঠিক করেছ?

যে বাড়িটি ভাড়া করতে চাই, সেটি আগে নিই। মিলন ভাইয়ের বাড়িটি আরও দু-এক মাস পরে নেব।

গুড। তোমরা যা ভালো মনে করবে, সেটাই আমি তোমাদের সিদ্ধান্ত হিসেবে নেব। দ্বিতীয় চিন্তা করার সুযোগ রাখব না। কাল সকালে আমি তোমাদের সঙ্গে ফার্মগেটে যাব।

ছেলেরা খুশি হয়ে মাথা নাড়ে। ওরা জানে, এই পথে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আর্মির গাড়ি চলাচল করে। এই পথের উত্তর দিকে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট। ফার্মগেট জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা হলে কী হবে, গুরুত্ব অনেক। কারণ, এখানকার মিলিটারি চেকপোস্ট অনেক বড়। নানা দিক থেকে জায়গাটির গুরুত্ব বুঝে এর পাহারা জোরদার করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট, অপারেশন হেডকোয়ার্টার, এমপি হোস্টেল, সর্বোপরি দ্বিতীয় রাজধানীর সংযোগস্থল মিলিয়ে জায়গাটির যে গুরুত্ব, সেখানে আঘাত করতে পারলে যুদ্ধকৌশলের বড় সাফল্য আসবে। ট্রাফিক আইল্যান্ডের মধ্যে তাঁবু খাঁটিয়ে মিলিটারি, পুলিশ আর তাদের সহযোগীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রিন রোডের মুখের বাঁ দিকে তৈরি হচ্ছে একটি সিনেমা হল। এই অর্ধেক নির্মিত দালানের মাথায় লাইট মেশিনগান হাতে পাহারা দেয় সেনাসদস্যরা। ট্রাফিক আইল্যান্ডের ফুটপাতে ও চেকপোস্টের প্রহরীরা রাইফেল ও লাইট মেশিনগান হাতে রাত-দিন পাহারা দেয়।

পরদিন চান কুটির ভাড়া করতে এসে পুরো এলাকা দেখে নেন আকমল হোসেন। দেখেশুনে খুশি হন। হাইডের জন্য বাড়িটি চমৎকার। একদম সেনাদের নাকের ডগায়, কিন্তু আপাত সরলভাবে নিরাপদ। প্রাঙ্গণজুড়ে আছে বেশ বড় বড় গাছ। এর মধ্যে ডালপালা মেলে দেওয়া পেয়ারাগাছ আছে সবচেয়ে বেশি।

বাড়িতে ছিল একটি পরিবার। পরিবারের ছয়জন সদস্য যুদ্ধের সঙ্গে জড়ানোর জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আকমল হোসেনের হাত জড়িয়ে ধরে আবদুল জব্বার বললেন, যুদ্ধের সঙ্গে যদি নিজেদের যুক্ত করতে না পারি, তাহলে সারা জীবন অপরাধী হয়ে থাকব। স্বাধীনতা কি সহজ কথা!

আকমল হোসেন তাকে জড়িয়ে ধরেন। তারা বাড়ির চারদিকে হাঁটেন। দেখতে পান, বৃষ্টিতে ঝরা পাতা মাটির সঙ্গে মিশে আছে। তাদের পায়ের চাপে দেবে যায়। শুকনো পাতার খসখস শব্দ হয় না। আচমকা আতঙ্কিত হতে হয় না। নিরাপদ থাকার জন্য সুন্দর বাড়ি বলে মনে হয় তার। আকমল হোসেন বলেন, এসব গাছের গোড়া খুঁড়ে অস্ত্র রাখা যাবে। ছেলেরা সহজেই কাজটি করতে পারবে।

নেহাল বলে, শুধু গাছের গোড়ায় না, গাছের মাথায়ও অস্ত্র বেঁধে রাখব। এই ঘন ডালপালা আমাদের সহায়ক শক্তি। নিচে দাঁড়িয়ে চট করে বোঝা কঠিন যে ওখানে অস্ত্র আছে।

আকমল হোসেন হেসে বলেন, এই যুদ্ধে বৃষ্টি আমাদের সহায়তা দিচ্ছে। এখন দেখি গাছও দিচ্ছে। রাস্তার অপর পারে ধানখেত আছে। বর্ষায় এলাকাটা পানিতে ডুবে থাকে। আমাদের যোদ্ধাদের পক্ষেও এসব থাকবে। প্রকৃতি আমাদের সহায়ক যোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনারা এসবের ভালো দিক বুঝবে না। ওরা ঘাবড়াবে। বর্ষা দেখে, ঘন গাছের মাথা দেখে, ধানখেত দেখে ওরা ভয়ে কুঁকড়ে থাকবে।

সবাই মিলে চারদিকে তাকায়। সবাই মিলে অপারেশনের পরিকল্পনায় অংশীদার হয়। শুধু তারা একটি কথাই ভাবতে পারে না যে এই বাড়ির প্রাঙ্গণে শহীদদের কবর হবে।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আকমল হোসেনের মনে হলো, স্যান্ডেলে কোনো লতা জড়িয়ে গেছে। কোথাও কেউ তাকে বলছে, দাঁড়াও। আমাকে রেখে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? তিনি দাঁড়ালেন। স্যান্ডেল খুললেন। দেখলেন, শুকনো ঘাসের কুচি জমে আছে পায়ের তলায়। স্যান্ডেল ঝেড়ে আবার পা ঢোকালেন। তার পরও স্বস্তি নেই। পায়ের নিচে চুলকাচ্ছে। তিনি স্যান্ডেল খুলে ঘাসে পা মুছলেন। বুঝলেন, ঘাসের গায়ে ভীষণ মমতা। তার পা-জোড়া আদরে ভরে দিয়েছে। তিনি মনে মনে বললেন, বেশ তো করলে। এমন মায়া কেন তোমাদের? আমি তো আবার আসব তোমাদের কাছে। তখন পা-ভরে ভালোবাসা দিয়ো, ঘাসেরা। যাচ্ছি। তোমাদের বিদায় বলব না। তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর আমার ছেলেগুলোকে দেখেশুনে রাখবে। আহ, এসব ভাবতে কী যে ভালো লাগে!

এমন জঙ্গলাকীর্ণ একটি বাড়ির ছায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করে। বুকের ভেতর কোনো অনুভব খচ করে উঠলেও তিনি স্বস্তি বোধ করেন। কোথাও কোনো বড় আয়োজন তার জন্য বুঝি অপেক্ষা করছে। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, যাই, বাবারা।

আবার আসবেন, চাচা।

হ্যাঁ, আসব। আমাকে তো বারবার আসতেই হবে। এই দুর্গবাড়ি ইতিহাসের বাড়ি হবে না!

গেরিলারা হা হা করে হাসতে পারে না। কেউ ভি দেখায়। কেউ ওপরে লাফ দিয়ে দুম করে নিচে পা ফেলে। কেউ এক পাক ঘোরে। তিনি ওদের আনন্দ দেখে নিজেও খুশি হয়ে ভি দেখান।

গাড়ি ছুটে যায় ফার্মগেট কারওয়ান বাজারের রাস্তায়। অনেক দিন পর তাঁর ভেতরে অফুরান শক্তির জোয়ার অনুভব করেন। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে আকাশ দেখেন। পাশ দিয়ে চলে যায় আর্মির কনভয়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সন্ধ্যা নামেনি

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সন্ধ্যা নামেনি। চারদিকের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। খুব সুনসান লাগছে এলাকা। মনে হচ্ছে, সেপাইরা সবাই মিলে বড় কোনো অপারেশনে গেছে। চারদিক সুনসান হয়ে আছে। আর্মির জিপ ব্যারাকের সামনে এসে দাঁড়ালে মাহমুদা শরীরের ভেতরে শৈত্যপ্রবাহ অনুভব করে। ও বুঝতে পারে, যারা ওকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের সম্মানের দিকে তাকিয়ে ওরা এই পর্যন্ত ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা খারাপ ব্যবহার করবে না। সবাই তো চক্ষুলজ্জার ধার ধারবে না। তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ছিন্নভিন্ন করবে ওকে।

গাড়ির দরজা খুলে যায়। একঝলক ঠান্ডা বাতাস স্পর্শ করে মাহমুদাকে।

বাঙালি ড্রাইভার নরম স্বরেই বলে, আপা, নামেন। তার পরে ফিসফিসিয়ে বলে, এইটা একটা দোজখখানা। আপনাকে কেন এখানে আনল? আপনার স্বামী-শ্বশুর আপনার এত বড় সর্বনাশ করতে পারল? কেমন মানুষ তারা?

মাহমুদা কথা বলে না। একটু সময় নিয়ে গাড়ি থেকে নামলে পেছন থেকে একজন রাইফেলের নল ঠেকিয়ে বলে, চলিয়ে।

ও মুখ ঘুরিয়ে বলে, কিধার?

ওপর মে।

সেপাই সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়। খাড়া সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়।

মাহমুদা একটি একটি করে সিঁড়িতে পা রাখে। এক ধাপ এক ধাপ করে ওঠে। ও জানে, ও কোথায় যাচ্ছে। ও জানে ওর পরিণতি কী। তার পরও নিজেকে শক্ত রাখে। নিজেকেই বলে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার সঙ্গে তার শরীর জড়িত। তার শরীরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার শ্বশুর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য নারীর শরীর দরকার হয় বলে মনে করেছে তার শ্বশুরবাড়ির দুজন

পুরুষ। পিতার হুকুম পালন করেছে তার স্বামী, শফিকুল ইসলাম। বলেছে, যাও, ওদের খাদ্য হও। দেশের স্বাধীনতার কথা বলো। যাও, স্বাধীনতা কেমন তা বুঝে আসসা! দেখো, স্বাধীনতার স্বাদ কত মধুর! আমরা তোমার স্বাধীনতার স্বপ্নের শোধ ওঠাব।

কী ভয়াবহ ক্রুর ছিল শফিকুলের কন্ঠস্বর। ওর শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য ওকে বিয়ে করেছিল লোকটি। মানসিক-মানবিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি লোকটির সঙ্গে। মাহমুদা থু করে স্বামীর মুখের ওপর থুতু দিলে শফিকুল ওর গলা চেপে ধরেছিল। ওর গোঁ গোঁ ধ্বনি তীব্র হয়ে উঠলে হাত ছেড়ে দেয়। অনেকক্ষণ পড়ে ছিল বিছানার ওপর। উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ভারী গয়না পরতে হয়েছিল শাশুড়ির নির্দেশে। সবকিছুর বোঝা বইবার সামর্থ্য হারিয়ে কতক্ষণ পড়ে ছিল, তা বুঝতে পারেনি মাহমুদা। এখনো ঘোরের মতো লাগছে সবকিছু। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একজন। সামরিক পোশাকে নয়। ক্যাজুয়াল ড্রেস। পায়জামা-কুর্তা পরে আছে। পুরু ঘন মোছের আড়ালে ক্রুর হাসি ঝলকায়। ও কাছাকাছি যেতেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আইয়ে।

মাহমুদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটি যে শব্দ উচ্চারণ করেছে, তা ভৌতিক ধ্বনির মতো ওর চারপাশ অন্ধকার করে দেয়। ওর মনে হয়, ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

আইয়ে।

অফিসার হাত বাড়িয়েই রাখে। মাহমুদা হাত বাড়ায় না। শক্ত হয়ে যায়। এই জীবনে কেয়ামতের এমন প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে, ও তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তা-ও আবার তার মাধ্যমে, যে তার বাবাকে বলেছিল, আপনার মেয়েটিকে আমাদের পরিবারে নিতে চাই। ও আমার পুত্রবধূ হবে। বছর দেড়েক আগে ও এই পরিবারের পুত্রবধূ হয়েছিল। বিত্তশালী পরিবার। মগবাজারে অনেক বড় একটি বাড়ির মালিক। কোনো কিছুর অভাব নেই। ও ঘর পেয়েছিল, কিন্তু স্বামী পায়নি। মাতাল, জুয়াড়ি একটি লোক। আগে একটি বিয়ে করেছিল। বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই তথ্য তাদের গোপন করা হয়েছিল, নাকি ওর বাবা বিষয়টি জানত, সেটা ও অভিমানে জিজ্ঞেস করেনি। মাঝেমধ্যে অভিমান তীব্র হলে ভেবেছে, ঘরে সত্য বলে বাবা ওর দায় এড়িয়েছে এমন

একটি জুয়াড়ি লোকের কাছে বিয়ে দিয়ে। পরবর্তী সময়ে মেয়ের তেমন খোঁজখবর করেনি। এমনকি কতটুকু ভালো আছে, এটাও জিজ্ঞেস করেনি। মাহমুদা একা একা দহন করেছে নিজেকে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি হুংকার দিয়ে ওঠে। হুংকারের বীভৎস শব্দে আচমকা চমকে ওঠে ও। এমন সম্মুখ বজ্রপাত ওর জীবনে আর কখনো ঘটেনি। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে লোকটি ওকে হেঁচকা টান দেয়। তারপর বারান্দার ওপর উঠিয়ে নিয়ে যায়। মাহমুদা ধাক্কা সামলানোর আকস্মিকতায় লোকটির হাত চেপে ধরে। পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে নিজেকে।

লোকটি ওকে একরকম টানতে টানতে ঘরে নিয়ে ঢোকায়। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মাহমুদা চোখ বুজে নিজেকে সামলায়। দাঁত কিড়মিড় করে। একটি লাথি মারার প্রবল বাসনায় নিজেকে তৈরি করতে চায়। কিন্তু পারে না। লোকটি ওকে বিছানায় ফেলে দিলে ও চেঁচিয়ে বলে, শুয়োরের বাচ্চাদের পাকিস্তানের অখণ্ডতা। শুয়োরের...বাচ্চাদের...পাকিস্তানের...অখণ্ডতা...এর শোধ...আমি...নেবই-নেবই-নেবই।

লোকটি শক্ত থাবায় ওর মুখ চেপে ধরে।

ভোরের দিকে ওর মনে হয় বিছানা থেকে ওঠার কোনো সাধ্য নেই। আলোর তীব্রতা দেখে বুঝতে পারে, বেলা বেড়েছে। ও হাত বাড়িয়ে শাড়ি নেওয়ার চেষ্টা করে। নাগাল পায় না। তারপর গড়িয়ে খানিকটুকু এগিয়ে শাড়িটা টেনে নিতে পারলে সেটা গায়ের ওপর ছড়িয়ে দেয়। মনে করতে পারছে না যে কয়জন ঢুকেছিল ঘরে। পাঁচজন পর্যন্ত মনে আছে। তারপর জ্ঞান হারিয়েছিল। এখন মাথা ঝিমঝিম করছে। তার পরও স্মৃতিতে প্রথম ভেসে ওঠে শ্বশুরের চেহারা। দাড়ি-টুপিতে একজন পরহেজগার মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করেন। বন্ধুবান্ধব অনেক। ব্যবসার হিসাব-নিকাশ নাই। বাতাসে টাকা ওড়ে। প্রথম দেখায় তাঁকে একজন পরহেজগার মানুষ বলে মনে হবে, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষটি নিজের ছেলের বউকে ব্যবহার করতে পিছপা হলেন না।

মাহমুদা চেতনে-অবচেতনে বিড়বিড় করে, আপনি রফিকুল ইসলাম। শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য। অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য জীবনপাত করে ফেলছেন অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। নিজের ছেলের বউকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ওরা যখন আমাকে গাড়িতে ওঠায়, তখন আপনি ওদের বলেছেন, তোমরা খুশি থাকো। তোমাদের যা দরকার, তা আমরা সাপ্লাই দেব। তোমরা পাকিস্তানকে হেফাজত করো।

আমার অপরাধ ছিল, আমি আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকার জন্য বলেছিলাম।

আমার অপরাধ আমি গেরিলাযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার কথা বলেছি।

মার অপরাধ আমি দেশের স্বাধীনতা চাই।

আমার অপরাধ আমি আমার ঘরে বাংলাদেশের পতাকা রেখেছি।

আমার অপরাধ আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম।

আমার অপরাধ আমি আপনাদের না বলে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম।

মাহমুদা নিজের অপরাধের খতিয়ান করে বড় শ্বাস টানে। তখন শুনতে পায় দরজার তালা খোলার শব্দ। আবার চোখ বোজে মাহমুদা। যে আসে আসুক। আর কোনো পরোয়া নাই। আমার অপরাধ একটি ভুল ঘরের তালা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি তালা খুলে বের হতে পারিনি। এই কঠিন কাজটি করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল।

এখন কেউ তালা খুলে ঘরে ঢুকছে। ও পায়ের শব্দ পায়। চোখ খোলে। কেউ একজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় ওকে দেখেছে-প্রবল কৌতূহলে কিংবা বিতৃষ্ণায়। মুহূর্ত সময় মাত্র। ভেসে আসে কন্ঠস্বর, আপা।

নারীকণ্ঠে চমকে ওঠে মাহমুদা। এই দোজখে কোথায় থেকে উড়ে এসেছে হুরপরি!

কে? কে আপনি?

আমি রাবেয়া। পুলিশ লাইনের সুইপার। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে দেখাশোনা করার জন্য।

দেখাশোনা! বিড়বিড় করে মাহমুদা। ও আর ওকে কী দেখাশোনা করবে। দেখাশোনা খুব সহজ কথা নয়। এখন থেকে একটি কঠিন কাজের মধ্যে ওর প্রবেশ ঘটল। জয় বাংলা। জয় বাংলা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

রাবেয়া মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাপড়গুলো কুড়িয়ে ভাঁজ করে। মাহমুদার পায়ে হাত রেখে বলে, আপা, উঠবেন?

ও উঠে বসে। দুই হাতে চুল সামলায়। লম্বা চুলের গোছা ছড়িয়ে ছিল পিঠের ওপর। রাবেয়া হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ভাবে, এত সুন্দর! ওর দৃষ্টি সরে না মাহমুদার মুখের ওপর থেকে। আবারও বলে, এত সুন্দর! পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে কুড়িয়ে তোলা কাপড়গুলো এগিয়ে দিয়ে বলে, পরেন।

আমি তো পরতে পারব না। তুমি আমাকে সাহায্য করো, রাবেয়া।

ক্লান্ত-বিষণ্ন কন্ঠস্বরে কোনো জোর নেই। মাহমুদার দৃষ্টি দেখে ঘাবড়ে যায় রাবেয়া। ভাবে, মানুষটি কী মরে যাবে! না, মরতে দেওয়া হবে না। দরকার হলে পায়ে ধরে ডাক্তারকে ডেকে আনবে। ও যখন দেখতে পায় মাহমুদা ঝিম মেরে আছে, তখন ও নিজের চোখের জল মোছে।

আপনাকে কোথায় থেকে ধরল ওরা?

ধরেনি।

মানে? তাহলে–

ওরা আমাকে জোর করে আনেনি। ওদের গাড়িতে আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কে? কে এমন কাজ করল?

আমার শ্বশুর আর স্বামী।

শ্বশুর? স্বামী?

রাবেয়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মেঝেতে বসে পড়ে। মাহমুদার মাথা ঝুঁকে আসে হাঁটুর ওপর। শরীরের ব্যথা যে কোথা থেকে আসছে, নিজেই বুঝতে পারে না। কখনো মনে হয় এখান থেকে, কখনো ওখান থেকে। কখনো মনে হয় সবখান থেকে। সেদিন আর্মির কয়েকজন অফিসারকে দাওয়াত খাইয়েছিল তার শ্বশুর। খাবার সার্ভ করার দায়িত্ব ছিল মাহমুদার। যতক্ষণ ওরা খেয়েছে, ততক্ষণ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল ওকে। শুনেছে ওদের ফিসফিস কথা, বহুত খুব সুরত। বহুত আচ্ছি।

হা-ভাতের মতো খেয়েছিল বিরিয়ানি, মাংসের রেজালা, মুরগির রোস্ট, পুডিং, ফিরনি, আম, লিচু...। তারপর ওরা যাবার সময় ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বলেছিল, তুমিও ওদের খাদ্য। তোমাকেও ওরা হা-ভাতের মতো খাবে।

আপা।

তুমি কে?

আমি সুইপার রাবেয়া।

বিরক্ত করছ কেন আমাকে? দেখছ না আমি নড়তে পারছি না।

ওরা আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে পরিষ্কার করতে। আজ রাতে আবার আসবে আপনার কাছে। আর আমি যদি পরিষ্কার না করি, তাহলে আমাকে চাবুক মারা হবে।

চাবুক?

ওরা চাবুক হাতে ঘোরে। ওই সব ঘরের মেয়েরা ওদের খামচে-কামড়ে দিলে ওদের চাবুক মারা হয়। লোহার শিকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

তুমি আমাকে এসব কী বলছ, রাবেয়া? তোমার কথা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।

এখানে তো এসবই হচ্ছে। আমি মিথ্যা কথা বলছি না।

মেয়েরা কি জয় বাংলা স্লোগান দেয়?

কাউকে কাউকে দিতে শুনেছি। তবে বেশির ভাগ দিতে পারে না। ওদেরকে সারাক্ষণ কাঁদতেই দেখি।

আমি এখানে বসে জয় বাংলা স্লোগান দিতে চাই, রাবেয়া।

আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছি, আপনি যত খুশি স্লোগান দেন।

জয় বলে চিৎকার করতে গিয়ে মাহমুদা দেখল, শরীরের কোথাও কোনো শক্তি নেই। ধ্বনি দুটো বুকের ভেতরে গোঙানির মতো ঘুরপাক খায়। ও দম ফেলে ভাবে, থাক, জয় বাংলা ওর বুকের ভেতরে থাক।

আপা।

বলো, রাবেয়া।

দরজা খুলি?

খোলো। ওটা বন্ধ করারই বা দরকার কী? যার যার খুশি আসতে দাও।

সেটা তো হবে না, আপা। আপনি তো মাত্র কয়জনের।

ও, তা-ই, তাহলে তুমি তোমার মতো কাজ করো।

রাবেয়া দরজা খোলে। হাট করে খুলে দেয় দুই পাল্লা। এক ঝলক দমকা বাতাস ঢোকে ঘরের ভেতরে।

মাহমুদার জন্য নাশতা পাঠানো হয়েছে। ট্রেতে করে আনা হয়েছে খাবার। রাবেয়া প্রথমে একটু ধাক্কা খায়। ক্যানটিনের ছেলেটি বলে, ওপরের হুকুম। ও চোখের ইশারায় ট্রে দেখায়। ছেলেটি কিছু বলে না। রাবেয়া বুঝে যায় যে কোনো বড় ঘরের কেউ হবে। সে জন্য এই যত্ন। তা ছাড়া এই চালান ওপরের বসের জন্য, যত্ন তো একটু করতেই হবে।

রাবেয়া ট্রে নিয়ে দরজা বন্ধ করে। টেবিলের ওপর ট্রে রেখে নাশতার প্লেট নামায়। লুচি, ভাজি, ডিম, কলা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ছোট ফ্লাস্কে চা।

আপা, খান। ওঠেন। এমন নাশতা এখানকার কাউকে দেওয়া হয়নি।

আমার শ্বশুর যে একজন নামী মানুষ। সে জন্য দিয়েছে। এটা আমার শ্বশুরকে দেওয়া হয়েছে। আমাকে না।

আপনার শ্বশুর অনেক বড়লোক?

হ্যাঁ, বড়লোকও। চারদিকে তার টাকাপয়সার ছড়াছড়ি।

এত নামী মানুষের এমন ভীমরতি কেন, আপা?

আরও দাম ওঠানোর জন্য। আরও টাকার জন্য।

আপনাকে ঘরে নেবে?

ঘরে রাখলে কি আর বের করে দেয়।

আপনার বাবা কেমন মানুষ গো?

তুমি আমাকে একটু বাথরুমে নিয়ে যাও, রাবেয়া। আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে।

আপনি তো কিছু খাননি।

রাতে আমি বিরিয়ানি-রোস্ট খেয়েছি না। শ্বশুরবাড়ির শেষ খাবার আমি পেট পুরে খেয়েছি, রাবেয়া।

মাহমুদা রাবেয়াকে ধরে পা টানতে টানতে বাথরুমে যায়। ওয়াক করার পরও বমি আসে না। আসে কান্না। মাহমুদা বুকভাঙা কান্নায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

বাথরুমের দরজায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে রাবেয়া। বুঝতে পারে, নড়ার শক্তি ও হারিয়েছে। কিছুক্ষণ পর কান্নার রেশ কমে এলে রাবেয়া পাশে গিয়ে বসে।

আপা, মুখ-হাত ধোন। গোসল করবেন?

কিছুই করব না, রাবেয়া।

আপনাকে পরিষ্কার করে রাখতে না পারলে ওরা আমাকে চাবুক দিয়ে পেটাবে।

পেটাক। মনে রাখবে, চাবুকের প্রতিটি বাড়ি স্বাধীনতার জন্য। আমি প্রতিশোধ নেব, রাবেয়া।

কীভাবে?

শান্তি কমিটির ওই দালালের বাড়িতে গিয়ে বোমা মেরে ওড়াব রফিকুল আর শফিকুল ইসলামকে।

আপনিও তো মারা যাবেন।

যাব। স্বাধীনতার জন্য শরীর দিয়েছি। এর পরে জীবন দেব। এরা যদি আমাকে এখান থেকে বের হতে না দেয়, তাহলে তুমি আমাকে পালাতে সাহায্য করবে, রাবেয়া। পারবে না?

মনে হয় পারব। আমার একটি শাড়ি পরিয়ে আপনাকে সুইপারের বেশে পার করে দেব।

কিন্তু ওরা তো সারাক্ষণ তালা লাগিয়ে রাখছে।

পালাতে হবে দিনের বেলা। যখন খাবার দিতে আসে, তখন ক্যানটিন বয়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করব।

মাহমুদা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে। মনে হয়, যৌবনের সব শক্তি শরীরে ফিরে এসেছে। ওরা কিছুই নষ্ট করতে পারেনি। এখন প্রতিরোধের সময়। গ্রেনেড চাই, বোমা চাই। ও শরীর ভেজায়। শরীরের শক্তিকে আবাহন জানায়। এবং গুনগুন করে—মোরা ঝঞ্চার মতো উদ্দাম...।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গুনগুন ধ্বনি শুনে স্বস্তি বোধ করে রাবেয়া। ওর মনে হয়, ওর আর দুঃখ নেই। ব্যারাকের অন্য জায়গার মেয়েরা যেমন ওর শক্তি বাড়িয়েছে,

বড়লোকের বাড়ির বউ ওকে সেই শক্তি দিচ্ছে। দরজার তালা খোলার শব্দ শুনে ও দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ক্যানটিন বয় ট্রে ফেরত নিতে এসেছে।

ট্রে-থালাবাটি ফেরত দাও, খালা।

খায়নি তো কিছু।

কেন? খিদে নেই?

এত নির্যাতনের পরে কি খাওয়া মুখে ওঠে?

হিহি করে হাসে ক্যানটিন বয়।

না খেলে বলো পাবে কোথায় থেকে? রাতে আবার শুতে হবে না।

আবার হিহি করে হাসে ও।

খেতে বলো, খালা। নইলে তুমি খাবার মুখে তুলে দাও। না খেলে তোমার আমার দুজনের কারও রেহাই থাকবে না।

তুই যা এখন। এখানে দাঁড়িয়ে হিহি করে হাসতে হবে না। শয়তান একটা।

তুমি কেমন করে বুঝবে যে এটা দুঃখের হাসি! অনেক দুঃখেও মানুষের হাসি আসে। আমি এখন আর আসব না। একবারে দুপুরের ভাত নিয়ে আসব। যাই।

বারান্দার শেষ মাথায় গিয়ে আবার ফিরে আসে। দেখতে পায়, রাবেয়া তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ও এক দৌড় দিয়ে কাছে আসে। বলে, এ মাসের বেতন পেলে এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবি?

যেদিকে দুই চোখ যায়। গেরামেও যেতে পারি। এখানে আর থাকা সম্ভব না।

রাজাকার হবি না তো?

থু, আমি বেইমান না। আমার বাপ-দাদার ঠিকানা আছে। আমার নদীর নাম আগুনমুখা।

ও আর দাঁড়ায় না। দ্রুত ফিরতে থাকে। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, রাবেয়া তখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ওর খেয়াল হয়। চাবি ওর হাতের মুঠোয়। দরজায় তালা দেওয়া হয়নি। দরজার কড়ার সঙ্গে খোলা তালা ঝুলছে। ওকে আবার আসতে দেখে রাবেয়া ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে। শুনতে পায় ছেলেটি তালা লাগাচ্ছে। ডিউটি করছে ও।

পাঁচ দিন পার হয়েছে।

প্রতিটি রাত নরক-যন্ত্রণায় পার হচ্ছে। শরীর আর নড়তে চায় না। তবে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছে মাহমুদা। মনে পড়ে শ্বশুরের সঙ্গে শেষ কথা, তিনি ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত সভায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। সভার আলোচনার বিষয় ছিল—পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা। চায়ের টেবিলে তিনি জোর গলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন। বলেন, দুষ্কৃতিকারী ও বিভেদ সৃষ্টিকারীদের উৎখাত করার জন্য সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। ওরা প্রথম রাতে বিড়াল মেরে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

মাহমুদা আঁতকে উঠে বলেছিল, বিড়াল? আব্বা, সেনাবাহিনী তো গণহত্যা ঘটিয়েছে।

কী বললে? তিনি ক্রুদ্ধ চোখে মাহমুদার দিকে তাকিয়েছিলেন।

আব্বা, আব্বা, আপনি তো বাঙালি। আপনি পাঞ্জাবি না।

আমি পাকিস্তানি। আমি মুসলমান। আমি মালাউন না। সেদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা শুনলে না। তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান।

আপনি যাদের দুষ্কৃতিকারী বলেন, তারা মুক্তিযোদ্ধা, আব্বা। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে।

খামোশ! স্বাধীনতা!

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ওকে শাস্তি না দিলে তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব। আমার সম্পত্তির কোনো কিছু তোর কপালে নাই।

শফিকুল ওকে এক হেঁচকায় চেয়ার থেকে টেনে তুলে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। ও কোনো বাধা দেয়নি। যেন শফিকুল জোরজবরদস্তির সুযোগ না পায়, সেটা খেয়াল রেখেছিল। দরজা বন্ধ করলে আঙুল উঁচিয়ে বলেছিল, গায়ে হাত তুলবে না। গায়ে হাত তুললে আমিও তোমাকে ছাড়ব না।

তোমাকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব। ভেবেছ কী? বেশি বাড় বেড়েছে তোমার।

তোমাকে কি আমি ছেড়ে দেব? আমি যা বলি, সরাসরি স্পষ্ট কথা বলি। আড়ালে-আবডালে কথা বলা আমার পছন্দ না।

কী করবে, শুনি? কী সাধ্য আছে তোমার? বাপ তো একটা কেরানি। ফুটো পয়সা দিয়েও বিকাবে না।

খবরদার, আমার বাবাকে নিয়ে কথা বলবে না। নিজে তো একটা মাতাল-জুয়াড়ি। আগে একটা বিয়ে করেছিলে। সেই বউয়ের কাছ থেকে লাথি খেয়েছিলে। আমার বাবার কাছে সেই বিয়ের কথা স্বীকার করারও সাহস ছিল না।

চুপ কর, হারামজাদি, টাকা দিয়ে মাগি কিনেছি। তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? আর একটা কথা বললে–

তুই কথা বলবি না, ইবলিস।

ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শফিকুল। ও কখনো ঠেকিয়েছে। মার খেয়েছে, মার দিয়েছে। মাঝে সময় গেছে দুই দিন। শফিকুল বাড়ি ফেরেনি। কোথায় ছিল, কেউ তা জানতে চায়নি। সবাই জানে ও এমনই। কোনো কলগার্ল পছন্দ হলে তাকে নিয়ে হোটেলে থাকে।

তৃতীয় দিনে পাঁচজন কর্নেল-মেজরের জন্য ডিনারের আয়োজন হয়। শাশুড়ি চুপচাপ ধরনের মানুষ। ওর ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। ওর ওপর কর্তৃত্বও ফলায় না। বিয়ের পরদিনই বলেছিল, এই বাড়িতে তুমি মেয়ের মতো থাকবে। ছেলেটা বড্ড মেজাজি, বুঝেসুঝে চলবে। কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে বলবে।

ও তো কোনো কিছু অকারণে চাওয়ার মেয়ে নয়। শাশুড়ি প্রয়োজনীয় জিনিস নিজের থেকেই অনবরত দিয়েছে। ও বাইরে কোথায় যাবে, সে ব্যাপারেও নাক গলায়নি। এমনকি জানতেও চায়নি। মাহমুদার মনে হয়েছে, এত উদাসীন মানুষ ওর বাইশ বছরের জীবনে দেখা হয়নি।

ডিনারের দিন ও সেনা অফিসারদের সামনে যাবে না বললে শফিকুল বলেছিল, বাড়াবাড়ি করবে না। সামনে না গেলে ওই চারজন অফিসারের সঙ্গে

এই ঘরে ঢুকিয়ে দেব। বুঝবে ঠেলা।

কী বললে? মাহমুদা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি যা বলি, তা করি। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরজ।

যদি দেশ স্বাধীন হয়?

চুপ, হারামজাদি। স্বাধীনতার কথা মুখে আনবি না। এই বাড়ির ভাত খেয়ে স্বাধীনতার কথা...

আমি এখনই চলে যাব। ঠিকই বলেছ। যার ভাগ্যে জুয়াড়ি স্বামী জোটে, তার আবার স্বাধীনতা কী!

এরপর শুরু হয় দুজনের মারামারি। মাহমুদা নিজের সব শক্তি প্রয়োগ করে মারতে ছাড়ে না শফিকুলকে। নখের খামচিতে দাগ পড়ে গালে। একসময় দুজনে আপন ইচ্ছায় থামে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফেঁসে।

সন্ধ্যার আগে শাশুড়ি ওকে ডেকে পাঠান তার ঘরে। মাহমুদা কাছে গেলে বলে, তুমি রেডি হও, বউমা। আমি চাই না এই বাড়িতে আর্মি অফিসাররা তোমার ঘরে ঢুকুক। আমার ছেলে এমন কাণ্ড করতে পারে।

তারপর নিজেই ওকে কাপড় বের করে দেন। গয়না দেন। কসমেটিকসও। মাহমুদা সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে আসে! মেহমান আসার আগে পর্যন্ত অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সাজে। মনে মনে ভাবে, আজই এ বাড়িতে শেষ দিন। কাল সকালে বাসে উঠে রাজশাহী যাবে। ছোট খালার কাছে। তারপর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। লোক পেলে ইন্ডিয়ায় শরণার্থী হবে।

মেহমান বাড়িতে আসার আগে শফিকুল ওর দিকে তাকিয়ে শিস দেয়।

ভেরি গুড, দারুণ সেজেছ। লাইক এ হোর।

হোর? মাহমুদার শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে।

শফিকুল বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, তাই তো বলেছি। হোর মানে বোঝো না? বেশ্যা। বেশ্যা। ও তখন দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, বাস্টার্ড।

শফিকুল কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এই মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখা ওর স্বার্থ। মেজর-কর্নেল আসার আগে মাহমুদার সাজগোজ নষ্ট করতে চায় না। পরিস্থিতি নষ্ট করা চলবে না।

মাহমুদা মাথা চেপে ধরে বসে থাকে। ও তো জানে, লোকটা জাতে মাতাল তালে ঠিক। পরিবার নিয়ে আর ভাবতে চায় না। বাড়ির লোকজন বলাবলি করত, শান্তি কমিটির লোকেরা মেয়েদের আর্মি ক্যাম্পে পাঠায়।

নিজের জীবন দিয়ে এমন নির্মম অভিজ্ঞতা হবে—এটা ওর স্বপ্নেরও অতীত।

রাবেয়া এসে ডাকে, আপা।

বলো, রাবেয়া।

আপনাকে বোধ হয় অন্য কোথাও নিয়ে যাবে।

কোথায়?

সেটা আমি জানি না। ক্যানটিনের লোকটা বলেছে, কাল থেকে এ ঘরে আর খাবার আসবে না।

আমি তো উঠে দাঁড়াতেও পারছি না। আমি অন্য জায়গায় যাব কী করে।

আপনার শরীর খেঁতিয়ে গেছে। ওরা আর আপনার কাছে আসবে না। আজই বোধ হয় শেষ রাত।

মাহমুদা কথা বলে না। ওর মাথা কাজ করছে না। ওর নিমীলিত চোখের পাতায় সন্ধ্যা ঘনায়। ও বুঝতে পারছে, ওর চেতনা লোপ পাচ্ছে। ও ডুবে যেতে থাকে। ওর আর কিছুই মনে থাকে না।

যখন ওর জ্ঞান ফেরে, ও দেখতে পায় রাস্তার ধারে পড়ে আছে। কত রাত ও জানে না। নাকি সকাল হব-হব করছে? ও চোখ ববাজে। ঘাসের ওপর পড়ে থাকার কারণে কেমন অস্বস্তি লাগছে। ঘাস-গুল্মের খোঁচা লাগছে। জ্ঞান না ফিরলেই হয়তো ভালো ছিল। ও উঠে বসার চেষ্টা করেও পারে না। রাস্তায় গাড়ি নেই। মানুষ নেই। মাহমুদার মনে হয়, ও এখন সচেতনভাবে নিজের অবস্থা বুঝতে পারছে। শুধু বুঝতে পারছে না কোথায় ওরা ওকে ফেলে রেখে গেছে। ওদের চাহিদা পূরণের সাধ্য ওর ছিল না। তাই ফেলে দেওয়া। শহরের একজন নামী লোকের পুত্রবধূ বলে এটুকু খাতির ওকে করেছে।

শুধু কি নামী লোক? সে তো ওদের পা-চাটা কুকুর। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

চোখ খুলে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে। আলো ফুটছে একটু একটু করে। এখন ও কোথায় যাবে? ওঠার চেষ্টা করে। পারে না। মাথা কাত হয়ে যায়। মাথা সোজা রাখা কঠিন। ও আবার চোখ বোজে।

ভোররাতেই লঞ্চ এসে পৌঁছেছে সদরঘাটে। নিজের ছোট ব্যাগটি নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে আর কোথাও দাঁড়ায় না আলতাফ। লঞ্চে সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে সেই আগুনমুখা নদীর পারের গ্রাম থেকে। এত সকালে রিকশা বের হয়নি রাস্তায়। ও হেঁটেই বাড়ি যাবে বলে ঠিক করে।

কতক্ষণ হেঁটেছে জানে না। ফুরফুরে বাতাসে হাঁটতে ওর ভালোই লাগছে। নিজের ভেতরে সতেজ ভাব অনুভব করছে। দূর থেকেই একজন নারীকে দেখতে পায় ও। রাস্তার ধারে পড়ে আছে। একবার হাত নাড়িয়েছে। আলতাফ দৌড়ে কাছে যায়।

আপা, আপা, কী হয়েছে আপনার?

পাকিস্তানি সেনারা আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে।

হায় আল্লাহ, এখন আমি কী করব! হায় আল্লাহ, আপনাকে তো হাসপাতালে নিতে হবে। রিকশাও তো নেই।

মাহমুদা চোখ বুজে ওর কথা শোনে। বুঝতে পারে, লোকটি দালাল নয়। রাজাকারও না। বুকের গভীর থেকে ওর স্বস্তির নিঃশ্বাস আসে। মৃত্যুর আগে একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কাউকে দেখা হলো। এত দিন যে বাড়িতে ছিল, সেখানে এসব কথা শোনা যেত না। সেটি ছিল পাকিস্তানের পক্ষের পরিবেশ। যখন-তখন কারণে-অকারণে মুক্তিযোদ্ধাদের গাল দিয়েছে তারা। ওদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে, এমন আলোচনাই হতো সারাক্ষণ। আজকের সকাল আমার জন্য পুণ্যের সকাল আর মৃত্যুর জন্য শান্তির মৃত্যু। আমি খুশি। আল্লাহ মেহেরবান।

আলতাফ ওর পাশে বসে বলে, আপা, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি স্যারের কাছে যাচ্ছি। স্যার আপনাকে ঠিকই হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনি যতক্ষণ পারেন এখানেই থাকেন।

মাহমুদা ঘাড় কাত করে দেখতে পায়, আলতাফ দৌড়াচ্ছে। ওর পায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ও রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে। গভীর প্রশান্তি মাহমুদাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ও উঠে বসার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

বাড়ির গেটে পৌঁছে যায় আলতাফ।

কলিংবেল চাপতেই গেট খোলেন আকমল হোসেন। তিনি ভোররাত থেকেই নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আর বিছানায় যেতে পারেননি।

আকমল হোসেনকে বারান্দায় দেখে আলতাফ উৎকণ্ঠিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, স্যার, স্যার!

আস্তে আলতাফ। বুঝেছি, কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু চেঁচিয়ো না। আশপাশের বাসার লোকেরা জেগে যাবে।

গেটের ভেতরে ঢুকে হাঁফ ছাড়ে ও। ততক্ষণে আয়শাও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আলতাফ হাতের ব্যাগ বারান্দায় রাখতে রাখতে বলে, স্যার, রাস্তার ধারে একজন আপা পড়ে আছে। পাকিস্তানি আর্মি তাকে শেষ করেছে। উঠে দাঁড়াতেও পারে না। একটা কিছু করা দরকার, স্যার। হাসপাতালে নিতে হবে।

আয়শা খাতুন বলেন, গাড়ি বের করো। আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসব।

হ্যাঁ, আমারও তা-ই মত। গ্যারেজ খোলো, আমি চাবি নিয়ে আসছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আশা।

হ্যাঁ, আমি তো যাবই। মেরিনা ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক।

কতটুকু সময় মাত্র। তিনজন মানুষ গাড়িতে ওঠে। মন্টুর মা গেট বন্ধ করে।

কতটুকু সময় মাত্র। গাড়ি এসে দাঁড়ায় মাহমুদার পাশে। সবাই মিলে ওকে ধরে গাড়িতে ওঠায়। পেছনের সিটে আয়শা খাতুন ওকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে রাখেন। মাহমুদার মাথা নিজের ঘাড়ের ওপর রাখেন।

মাহমুদা মৃদুস্বরে বলে, আমি কোথায় যাচ্ছি?

আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। আপনি শান্ত থাকেন।

শান্ত থাকা কী? মাহমুদা অস্ফুট স্বরে কথা বললে আয়শা তাকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেন।

অল্পক্ষণ সময় মাত্র।

সূর্য এখনো ঠিকমতো ওঠেনি। দিনের প্রথম আলো ছড়িয়েছে মাত্র। তারা পৌঁছে যায় বাড়িতে।

গেষ্ট-রুমের বিছানায় শুইয়ে দিলে মেরিনা এসে দরজায় দাঁড়ায়।

কী হয়েছে, মা? তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? আমাকে ডাকোনি কেন?

এখন প্রশ্ন না। ওকে দেখো। মন্টুর মাকে ডেকে ওকে বাথরুমে নাও। আমার আলমারি থেকে শাড়ি-কাপড় বের করে আনো। আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি।

কতটুকু সময় মাত্র।

আয়শা খাতুন ফোন করেন ড. রওশন আরাকে।

এক্ষুনি আসতে হবে। রেডি হন। আমি আসছি।

আকমল হোসেন তো তৈরিই ছিলেন।

ঢাকার রাস্তায় গাড়ি ছুটে যায়।

দিন বাড়ছে। রাস্তায় রিকশা-গাড়ি নেমেছে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তার পরও গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না আকমল হোসেনের। অল্পক্ষণে পৌঁছে যান ডাক্তারের বাসায়। তিনি তৈরি ছিলেন। ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। আয়শা খাতুনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেন। আয়শা খাতুন ঘাড় কাত করে বলেন, একটা কিছু ঘটেছে। এখন না। পরে বলব। বাড়িতে চলেন আগে।

কতটুকু সময় মাত্র।

গাড়ি পৌঁছে যায় হাটখোলার বাড়িতে। মেরিনা আর মন্টুর মা মাহমুদাকে পরিচর্যা করেছে। গোসল করিয়েছে। আয়শা খাতুনের আলমারি থেকে সুতির শাড়ি-পেটিকোট-ব্লাউজ এনে পরিয়েছে। মাথা আঁচড়ে দিয়েছে। মুখে হাতে লোশন লাগিয়েছে। আর দুজনেই বারবার ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে। মনে মনে বলেছে, এত সুন্দর! তারপর পানি খাইয়েছে। জুসও। এখন একটু স্বস্তিতে আছে ও।

ডাক্তার দেখলেন। প্রয়োজনীয় ওষুধ আনতে গেলেন আকমল হোসেন। সবকিছু মিলিয়ে যা ঘটল, তা দেখে মাহমুদা ভাবল, তার যুদ্ধের একটা পর্ব দেখা হলো। এই মানুষদের দেখা না হলে ওকে প্রবল দুঃখ নিয়ে মরে যেতে হতো। এখন ওর কোনো দুঃখ নেই। মৃত্যুবরণ খুব সহজ কাজ বলে মনে হয় ওর।

কতটুকু সময় মাত্র।

ওর জন্য ওষুধ এসে যায়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওকে ওষুধ দেওয়া হয়। ওকে ওষুধও খাওয়ানো হয়। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। ওর বিছানার চারপাশে বসে থাকে সবাই। ওর কোনো কিছু না আবার ঘটে যায়, এমন আশঙ্কায় সবাই উদ্বিগ্ন।

ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার আগে ও খুব দ্রুত ওকে নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলে। শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য রফিকুল ইসলামকে চিনতে পারেন আকমল হোসেন। মগবাজারে তার বাড়ি, কোথায় তা-ও জানেন। বিভিন্ন সভায় তাঁকে দেখেছেন।

ও ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলে, আপনি আমাকে বোমা দেবেন। আমি ওই বাড়িতে বোমা ফাটাতে চাই। আমার শেষ যুদ্ধে আমি জিততে চাই।

সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাহমুদা বালিশে ঘাড় কাত করে। আয়শা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন, হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার আছে?

আমার মনে হয় দরকার নেই। ওষুধ ঠিকমতো খেলে ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া ও যেভাবে কথা বলেছে তাতে মনে হয়েছে, ওর মানসিক জোর আছে। ট্রমা আক্রান্ত না হয়, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মেরিনা যেন ওর বন্ধু হয়ে যায়।

আকমল হোসেন বলেন, ওকে হাসপাতালে নিতে হচ্ছে না, এটাই আমাদের ভরসা। হাসপাতাল আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। ওকে আমরা কেন রাস্তা থেকে উঠিয়ে ঘরে এনেছি—এটি একটি প্রধান ইস্যু হবে। হাসপাতালের লোকজনের কৌতূহলের কারণ হবে ও। ডাক্তারদের মধ্যে কেউ রাজাকার থাকলে ওরাই খবর ফাঁস করে দেবে।

সবাই মাথা নেড়ে বলে, ঠিক।

আমি রোজ ওকে দেখতে আসব। কোনো কিছু জরুরি হলে জানাবেন।

রওশন আরাকে বিদায় দিয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আয়শা মেরিনাকে বলেন, কতটুকু সময়, কত কিছু ঘটে গেল!

মেরিনা দুহাত মুঠি করে ধরে বলে, মাহমুদা খুব শক্ত মেয়ে। একটুও ঘাবড়ায়নি। ও বলেছে, ওর শরীর স্বাধীনতার। ও বোমা দিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উড়িয়ে স্বাধীনতার শহীদ হবে।

আল্লাহ ওকে হায়াত দিক।

ও হায়াত চায় না, আম্মা। ও ঠিকই করে ফেলেছে যে ও স্বাধীনতার শহীদ হবে।

আয়শা মাথা নাড়েন। বুঝতে পারছি, ও আমাদের একজন গেরিলাযোদ্ধা। চল, বারান্দায় বসে তোর আব্বার জন্য অপেক্ষা করি। ফিরে এলে আমরা একসঙ্গে নাশতা খাব।

মাহমুদার জন্য স্যুপ বানাতে বলেছি।

ভালো করেছিস। আলতাফকে পাঠিয়ে ওর জন্য আলাদা বাজার করতে হবে। তুই একটা তালিকা করিস।

কিছুক্ষণ পর ফোন আসে মারুফের।

আমি রূপগঞ্জ চলে যাচ্ছি, মেরিনা।

কবে ফিরবি, ভাইয়া?

কয়েক দিনের মধ্যে। তখন এসে বাড়িতে থাকব। আমাদেরকে ফার্মগেটে একটা অপারেশন করতে হবে।

আমাদের বাড়িতে একজন অতিথি আছে, ভাইয়া। আজ সকালেই তাকে আনা হয়েছে।

আনা হয়েছে মানে কী রে? কোথায় থেকে আনা হয়েছে। কে সে?

একজন গেরিলাযোদ্ধা।

গেরিলাযোদ্ধা? আমার পরিচিত কেউ? আমি কি চিনি?

না। তুমি তাকে চেনা তো দূরের কথা, কোনো দিন দেখোইনি।

সে কি আলতাফ ভাইয়ের কেউ?

না।

তার নাম কী? তার নাম কী? ঠিক করে কথা বলছিস না কেন? আমার খুব রাগ হচ্ছে, মেরিনা। তার নাম বল।

মাহমুদ।

তুই কি আমার সঙ্গে ফান করছিস? এটা কি আমাদের ইয়ার্কি করার সময়।

ফান নয়, রিয়ালিটি, ভাইয়া।

ঠিক আছে, আমি এসে দেখব। আম্মা-আব্বা কেমন আছে?

দুজনেই ভালো।

আব্বাকে দে।

আব্বা ডাক্তার খালাম্মাকে পৌঁছে দিতে গেছেন।

ডাক্তার? আম্মার কিছু হয়নি তো?

রাখছি, ভাইয়া। আমরা সবাই ভালো আছি।

আকমল হোসেন ফিরে আসেন। গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে এসে বারান্দায় বসেন। আয়শা বলেন, কয়েক ঘণ্টা সময় মাত্র। কিন্তু কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আমার ডায়েরির পাতা আজ ভরে যাবে। আমরা ইতিহাসের একটি বড় সাক্ষী হলাম।

শুধু কি সাক্ষী?

আমরা তো অংশও নিলাম। মাহমুদাকে বাড়িতে আনাও আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

আকমল হোসেন পা থেকে স্যান্ডেল খুলতে খুলতে বলেন, সামনে একটা অপারেশন আছে। ছেলেরা প্রস্তুত হচ্ছে।

কোথায় হবে?

ফার্মগেট এলাকায়।

আকমল হোসেন উঠতে উঠতে বলেন, ভীষণ খিদে পেয়েছে, আশা।

গোসল করে টেবিলে এসো। নাশতা টেবিলে দিয়ে দিচ্ছি। দেরি কোরো না।

আসছি। তাড়াতাড়ি আসব। গায়ে শুধু পানি ঢালব আর মুছব।

দুজনে হাসতে হাসতে দুদিকে চলে যায়।

মাহমুদাকে বিশ্রামের বেশি সুযোগ দেয় সবাই। ও বেশ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। হাঁটতে পারছে। ডাইনিং টেবিলে গিয়ে খেতে পারছে। বাকি সময় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। বেশি কথা বলে না।

মেরিনাকে বলে, মগবাজারের বাড়িতে ঢোকা আমার জন্য সহজ। ওরা তো আমাকে দেখে চমকে উঠবে। ভাবতেই পারবে না যে আমি আবার ওই বাড়িতে যেতে পারব। আমি শাশুড়িকে সব কথা বলব। অসুস্থ হয়ে গেলে ওরা আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, বলব। আশপাশের লোকজন আমাকে মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, বলব। এর পরে কাপড়চোপড় নিতে এসেছি বলতে পারব। আমার দু-তিনটি বোমা ও গ্রেনেড দরকার, মেরিনা। কোথায় থেকে জোগাড় করা যাবে?

ধরো, বোমা পাওয়া গেল। কিন্তু ওই বাড়িতে গিয়ে বোমা ফাটালে তুমি কি...

তুমি আমার কথা ভাবছ কেন?

আমি তো নিজের মৃত্যু হাতে নিয়েই ওই বাড়িতে ঢুকব। যারা যুদ্ধ করছে, তারা কি মৃত্যুকে সামনে রেখে যুদ্ধ করছে না?

মেরিনা চুপ করে থাকে। মাহমুদার দিকে তাকিয়ে ওর চোখের পলক পড়ে না। একসময় চোখ নামিয়ে বলে, আমরা ঠিক করেছি, আগস্ট মাসে পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে আমরা শহরজুড়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেব। আমাদের অনেক পতাকা বানাতে হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, মাহমুদা?

না। পতাকা বানানোর সময় আমি পাব না। আমি দু-এক দিনের মধ্যে মগবাজারের বাড়িতে ঢুকতে চাই। আঙ্কেল যদি আমাকে গ্রেনেড আর হাতবোমা জোগাড় করে দেন।

জোগাড় করতে হবে না। এ বাড়িতেই তোমার চাহিদার জিনিস আছে, মাহমুদা।

এই বাড়িতে?

হ্যাঁ, এটা একটা দুর্গবাড়ি। আগামীকাল ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা আসবে বাড়িতে। এখান থেকে অস্ত্র নিয়ে ওরা অপারেশনে যাবে।

মাহমুদা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, কখন আসবে? আমার সঙ্গে দেখা হবে?

হ্যাঁ, দেখা তো হবেই। ওরাও তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী হবে।

পরক্ষণে ও চুপ করে যায়। ঝিম মেরে বসে থাকে।

কী হয়েছে, মাহমুদা?

মায়ের কথা মনে হচ্ছে।

মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমি তোমার সঙ্গে যাব।

না, আমি মায়ের দুঃখ বাড়াতে চাই না। ওই পরিবারে আমি আর ঢুকতে চাই না। বাবা যখন আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আব্বা, ওদের সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নিয়েছেন তো? আব্বা বলেছিলেন, ওরা নামী লোক,। মগবাজারে বড় বাড়ি আছে, অনেক সম্পদের মালিক। তুই সুখে থাকবি।

আমি বাবাকে বলেছিলাম, আব্বা, টাকাপয়সা থাকলে সুখ হয়? বাবা আমাকে বললেন, মাগো, তর্ক দিয়েও সুখ হয় না। আমি বললাম, আব্বা, আপনি তো ছেলেটির কথা কিছুই জানেন না। বাবা বললেন, দরকার নেই, মা। তোমাকে তোমার সুখ...। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আল্লাহ আপনাকে সুখে রেখেছে, আব্বা। সে জন্য আপনি সুখের উল্টা পিঠটা কেমন, তা বুঝতে পারেন না।

তারপর একদিন বাবাকে বলেছিলাম, যে জুয়াড়ি এবং মাতাল তার সঙ্গে তো সুখ হয় না, আব্বা। বাবা বলেছিলেন, মানিয়ে নাও। বাচ্চাকাচ্চা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ঠিক করার চেষ্টা করিনি, মেরিনা। ভেবেছিলাম দিন গড়াবে না। এখানকার পাট আমার চুকাতে হবে। আমার মাস্টার্স পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। এর মধ্যে যুদ্ধ। আমি বুঝলাম যে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছি। আমার মা-ও আমার পথের বাধা ছিলেন। তিনি কিছুতেই চাননি যে ওই বাড়ি থেকে আমি চলে আসি। তাহলে তার মেয়ের কলঙ্ক হবে। মেয়ের কলঙ্কের বোঝা তিনি সইতে পারবেন না। মায়ের সুখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে দমন করেছি। হায় আল্লাহ, সেটা যে এভাবে গড়াবে, তা কি আমি জানতাম!

মাহমুদা দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে। মেরিনা ওকে এক গ্লাস পানি দিলে ও একচুমুকে পানি খায়। মেরিনা গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলে, কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকো।

ও বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বালিশে মুখ গোঁজে। বালিশ থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে। কিসের গন্ধ ও বুঝতে পারে না। ফুলের, নাকি কোনো সুগন্ধির? মাহমুদা ভুলে যেতে থাকে পুরো অতীত। ওর সামনে এখন শুধুই ভবিষ্যৎ। আর তা আশ্চর্য সুগন্ধিময়। ওর চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌরভ ছড়াতে থাকে।

কয়েক দিন পর মারুফ বাড়ি ফিরে আসে।

মেরিনার কাছ থেকে প্রথমে পুরো ব্যাপারটা শোনে। বলে, ওহ্, এই ঘটনা! এখন এ বাড়িটা শুধু দুর্গবাড়ি নয়, এ বাড়ি এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

সে জন্য মাঝেমধ্যে আমি শঙ্কিত থাকি, ভাইয়া। মনে হয়, কখন এই বাড়িটা আবার রাজাকারদের নজরে পড়ে। ওরা আর্মি দিয়ে এই বাড়ির ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

থাক, এসব এখন ভাবিস না। তুই মাহমুদা আপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

আয়শা খাতুন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের কাছে আসেন।

কী খাবি, বাবা? আলাদা কিছু রাঁধব?

পুঁইশাক আর চিংড়ি মাছ, মা।

বাতাসি মাছের চচ্চড়ি? তুই খেতে ভালোবাসিস।

মাছ কি ফ্রিজে আছে?

আছে তো। কবেই কিনে রেখেছি।

দারুণ হবে। মুগের ডাল, মা।

মেন্যুটা ভালোই দিয়েছিস। মাহমুদাও এমনই খেতে চায়। মাংসমুরগি—এসব ও খেতেই চায় না।

মেরিনা আর মাহমুদা একসঙ্গে ঘরে ঢোকে।

মারুফ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি আপনাকে চিনি। দেখিনি, এইটুকুই যা।

মাহমুদা মৃদু হেসে বলে, এই বাড়ির সবাই এমন। আপনি আলাদা হবেন কেন?

মারুফ ওর কথায় থমকে যায়। হঠাৎ করে কী বলবে বুঝতে পারে না। মেরিনা এক বাটি চালতা-মাখা সবার সামনে ধরে।

খেয়ে দেখো একটু। নুন-মরিচ দিয়ে মাখিয়েছি।

কেউই খেতে রাজি হয় না। মেরিনা কোনার চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে চালতা-মাখানো খায়। আয়শা খাতুন রান্নাঘরে চলে গেছেন। আকমল হোসেন নিজের ঘরে পড়ার টেবিলে। মারুফ আগামীকালের অপারেশনের কথা মাহমুদাকে বলে যাচ্ছে। কীভাবে কী ঘটবে, তার পুরো বর্ণনা দিচ্ছে। মাহমুদা এখন এক মনোযোগী শ্রোতা। এক দিনের কম সময় ওর সামনে। মারুফের কন্ঠস্বর শুনতে শুনতে ও রোমাঞ্চিত হয়।

ফার্মগেট অপারেশন আমাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, গ্রিন রোডে ঢোকার মুখে হাতের বায়ে যে সিনেমা হলটি হচ্ছে, ওখানে পাহারা দেয় একজন সেনা। ওখানে লাইট মেশিনগান বসানো আছে। ট্রাফিক আইল্যান্ডের ওপর এবং ফুটপাতেও পাহারা বসানো আছে। ওখানে তাঁবু খাঁটিয়ে মিলিটারি পুলিশ ও ওদের সহযোগী রাজাকার থাকে।

এত পাহারার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ব।

আমাদের সঙ্গে থাকবে চায়নিজ এএমজি আর স্টেনগান! আরও থাকবে ফসফরাস বোমা ও গ্রেনেড-৩৬। আমাদের অপারেশনের সময় ঠিক হয়েছে রাত ৮টা থেকে ৮টা ৫ মিনিট।

মাত্র পাঁচ মিনিট?

মাহমুদার মনোযোগী দৃষ্টিতে বিস্ময়। মাত্র পাঁচ মিনিটে অপারেশন হবে।

মারুফ বলতে থাকে, আমরা এখন একটি ফক্স ওয়াগন গাড়িতে করে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছি। আমার আব্বা আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র গুছিয়ে দিয়েছেন। আমরা প্রথম রেকি করেছি দুপুরের দিকে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফাইনাল রেকির কাজ শেষ করা হয়। ওই সময় আমরা খেয়াল করেছি, চেকপোস্টে মিলিটারি পুলিশ ও রাজাকার পাহারা দিচ্ছে। মিলিটারি কেউ নেই। ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে জিপ ও কনভয় আসা-যাওয়া করছে।

আমাদের সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।

আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটাব।

আমরা ছয়জন গেরিলাযোদ্ধা।

আমরা ফার্মগেটে পৌঁছে গেছি। আমাদের লক্ষ্য আইল্যান্ড ও ফুটপাত।

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওপেনিং কমান্ড হয়, ফায়ার।

পুরো এক মিনিট ব্রাশফায়ার চলে।

ঠিক এক মিনিট পর কমান্ড হয়, রিট্রিট।

মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে উঠে পড়ে সবাই। তার আগে ছুড়ে দেওয়া হয় ফসফরাস বোমা ও গ্রেনেড-৩৬।

আমরা দেখলাম, বোমা ও গ্রেনেড ফাটল না। ভুলে ওই দুটোতে ডেটনেটর ফিউজ লাগানো ছিল না।

আমরা দেখেছি, ব্রাশফায়ারে নিহত হয়েছে পাঁচজন মিলিটারি পুলিশ ও ছয়জন রাজাকার।

আমরা নিরাপদে চলে আসতে পেরেছিলাম।

আমরা পাঁচ মিনিট সময় রেখেছিলাম আমাদের পরিকল্পনায়। কিন্তু আমাদের পাঁচ মিনিট সময় লাগেনি।

মাত্র তিন মিনিট সময়ে আমরা শেষ করেছি অপারেশন।

এবং আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল।

আমাদের গাড়ি ছুটছে। আমরা হাইডে চলে যাচ্ছি।

ফোনের এপাশ থেকে মাহমুদা বলে, আপনাদের কনগ্রাচুলেশনস। আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলেন।

মাহমুদা রিসিভার আকমল হোসেনকে দেয়। মারুফের সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল, অপারেশন থেকে ফিরে ও বাড়িতে একটি ফোন দেবে। মাহমুদা সবাইকে বলেছিল, ফোনটা ও ধরবে। ঘড়ি দেখে আকমল হোসেন সবাইকে নিয়ে ফোনের কাছে এসে বসেছিলেন। ফোন বেজে উঠলে তিনি মাহমুদাকে

বলেছিলেন, ফোনটা ধরো, মা। মারুফই হবে।

নিজে কথা বলে ফোনটা আকমল হোসেনকে দেয় মাহমুদা। তিনি হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে মারুফের কণ্ঠ, আব্বা, সবকিছু ঠিকঠাকমতো হয়েছে। আমরা হাইডে চলে এসেছি।

কনগ্রাচুলেশনস, বাবা। সাবধানে থেকো।

ফোন রেখে দেয় মারুফ। আকমল হোসেন রিসিভার রাখার সময় চেঁচিয়ে ওঠে মেরিনা।

হিপ হিপ হুররে। মনে হচ্ছে, বাড়িতে একটা ফসফরাস বোমা ফাটাই।

হাসিতে ভেঙে পড়ে সবাই।

এই বাড়িতে আসার পর মাহমুদা এই প্রথম প্রাণখোলা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়।

হাসতে হাসতে বলে, মনে হচ্ছে আকাশে হাজার হাজার বেলুন ওড়াই। সঙ্গে হাজার হাজার পায়রাও থাকবে।

আয়শা খাতুন বলেন, তোমাকে আজ মিষ্টি খাওয়াব, মা। তুমি একদিনও মিষ্টি খাওনি।

হ্যাঁ, খাব। চমচম খাব। আজকে যা দেবেন, তা-ই খাব।

আয়শা চমচম আনার জন্য আলতাফকে দোকানে পাঠান। ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম বের করেন। দু-তিন রকম পিঠা বানানো হয়েছিল মারুফের জন্য, সেগুলোও বের করেন। বেশ কিছুক্ষণের জন্য আড্ডা জমে ওঠে। আবার বিষণ্ন হয় মাহমুদা। বুঝতে পারে, আনন্দের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা খুবই কঠিন। সেদিনের ঘটনার পর থেকে জীবনের চিত্রপট পাল্টে গেছে। ও চেষ্টা করেও অনেক কিছু খুঁজে পায় না।

রাতে খাবার টেবিলে বসে ও সবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কাল সকালে সূর্য ওঠার আগে মগবাজারের বাড়িতে যেতে চাই, আঙ্কেল।

এত ভোরে?

ভোরেই যেতে চাই। নইলে বাবা-ছেলে কাজে বেরিয়ে যেতে পারে।

কেউ আর কথা বাড়ায় না। তিনজনই জানে, ও কারও কথা শুনবে না। ও দুদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

আঙ্কেল, আপনি কখন আমাকে ফসফরাস বোমা আর গ্রেনেড দেবেন?

কাল সকালে। তুমি বের হওয়ার আগে।

ও মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা।

মেরিনা-মাহমুদা খাবার টেবিল থেকে উঠে যায়। দুজন বারান্দায় গিয়ে বসে। আকমল হোসেন আর আয়শা উঠতে পারেন না। এঁটো হাত ধুতেও ওঠেন না। দুজনে থালার ওপর আঙুল নাড়ান। দুজনেই এক চুমুক পানি খান। দুজনেই খুব বিষয় বোধ করেন। আগামীকাল কী ঘটবে, তা তাঁরা জানেন না। শুধু জানেন, এ মেয়েটিকে তারা হারাবেন। ও কঠোর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে যুক্ত করেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর আয়শা বলেন, তুমি চা খাবে?

হ্যাঁ, চা চাই। কিন্তু তুমি উঠবে না। মন্টুর মাকে বলো।

মন্টুর মা কাছেই ছিল। বলে, চুলায় গরম পানি আছে। আমি এখনই চা আনছি।

তখন গুনগুন ধ্বনি তোলেন আয়শা, এই শ্রাবণের বুকের ভেতর আগুন আছে—সেই আগুনের কালো রূপ যে আমার চোখের পরে নাচে...

মাহমুদা চমকে উঠে মেরিনার হাত চেপে ধরে।

মেরিনা মৃদুস্বরে বলে, আমার মা। এ জন্য মুক্তিযোদ্ধারা আমার মাকে জয় বাংলা মামণি ডাকে।

আমিও তা-ই ডাকব। গান শেষ হলেই আমি জয় বাংলা মামণির পায়ে চুমু দেব। বলব, আজ আমার জীবন ধন্য হলো।

ধ্বনি ছড়াতে থাকে—ও তার শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে—তার কালো আভার কাঁপন দেখো তালবনের ওই গাছে গাছে...।

টেবিলে চা আসে। আকমল হোসেন চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে থাকেন। দুকান ভরে বাজতে থাকে গানের বাণী। গেটের কাছে বসে থাকা আলতাফ কান খাড়া করে। খুশিতে হাত নাড়তে নাড়তে বলে, জয় বাংলা মাগো। রান্নাঘরে বসে মন্টুর মা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারে না। মুঠিভরা ভাত নিয়ে হাত থালার ওপর স্থির হয়ে থাকে। ভাবে, আজ রাতে ভাত না খেলেও ওর খিদে পাবে না।

গানের সুরে মগ্ন হয়ে গেছে মাহমুদা। ওর মনে হয়, এই মুহূর্তে গানের গুনগুন ধ্বনি ছাড়া বিশ্বসংসারের আর কোনো কিছুই ওর সামনে নেই। আগামীকাল ও একটি মৃত্যুর ঝুঁকি নেবে, সে কথাও ওর মনে আসে না। সুরের ব্যাপ্তি ওর সবটুকু দখল করে রাখে।

আয়শার কন্ঠস্বর কখনো চড়া হয়-বাদল-হাওয়া পাগল হলো সেই আগুনের হুংকারে—দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় মাঠ হতে কোন মাঠের পারে—ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ববন রাঙিয়ে উঠে—সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে...

একসময় গুনগুন ধ্বনি থেমে যায়।

একসময় ঘুমানোর সময় হয়।

রাত বাড়ে। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের জ্বলজ্বলে আভা পৃথিবীর ওপর নেমে আসে। মাহমুদা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলে, আশ্চর্য এক সুন্দর রাত পেয়ে আমার জীবন ধন্য হলো। মেরিনা, আরেক জীবনে তুমি আমার বন্ধু হবে।

চলল, তোমাকে তোমার ঘরে দিয়ে আসি। মাহমুদা কথা বাড়ায় না। উৎফুল্ল থাকার চেষ্টা করে। বলে, তুমি আমাকে অ্যালার্ম ঘড়ি দিয়েছ, সে জন্য থ্যাংকু, মেরিনা।

আমার ঘরেও একটি অ্যালার্ম ঘড়ি আছে। মা-বাবাও ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছেন, মাহমুদা। তুমি ঘুমাও।

গুড নাইট, মেরিনা।

মাহমুদা দরজায় সিটকিনি লাগায় না। দরজা মুখে মুখে লাগিয়ে রাখে। মশারির নিচে ঢুকতে ঢুকতে বলে, আম্মা, বিদায়। আব্বা, বিদায়। সনজিদা, ফাহমিদা, আশফাঁক, বিদায়। আমার সব আত্মীয়স্বজন, বিদায়। আজ রাতই আমার শেষ ঘুমের রাত। বিদায়, মুক্তিযোদ্ধারা।

মাহমুদা বালিশে মাথা রাখলে ওর ঘুম আসে। ও দ্রুত গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে আকমল হোসেন নিজের কাগজপত্রের পাতা উল্টান। দেখতে চান কোথায় কী ঘটছে। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় লেখা হয়েছে, কয়েকটি সামরিক আদেশ জারি করা হয়েছে। এই আদেশে রাজাকারদের যেকোনো লোককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

তিনি একমুহূর্ত ভাবলেন। আয়শার দিকে তাকালেন। দেখলেন, আয়শা মনোযোগ দিয়ে সোয়েটার বুনছেন। ভাবলেন, ও ওর মতো থাকুক। ওর সঙ্গে এত রাতে এসব শেয়ার করার দরকার নেই। সকালে মেরিনাকে বলবেন যে সামরিক আইনকে আরও নিপীড়নমূলক করা হয়েছে। রাজাকারদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবে।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে শান্তি কমিটির নেতা মাওলানা নুরুজ্জামানের বিবৃতি পান। তিনি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। রাজাকারদের কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, একমাত্র তাদের তৎপরতার কারণেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আকমল হোসেন পরিস্থিতি আঁচ করেন। ধরে নেন যে হাতে অস্ত্র পাওয়া রাজাকাররা অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার হলে ঢুকিয়েছে। মেরিনাকে এই কথা বললে ও বলবে, আব্বা, আপনি যে কেন পত্রিকার এসব খবর পড়েন।

পাতা উল্টাতে গিয়ে চোখে পড়ে শান্তি কমিটির নেতাদের সভা। তারা দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েছে তারা।

তিনি পত্রিকা বন্ধ করে রাখেন। আয়শার দিকে তাকালে দেখতে পান, আয়শা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘুমাবে না?

তুমি?

মনে হচ্ছে, আজ রাতে ঘুমাতে পারব না।

আমারও তো সে রকম লাগছে।

তার পরও আমরা তো শুয়ে থাকতে পারি।

আকমল হোসেন উঠতে উঠতে বলেন, সেটা হতে পারে। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পানি খান। আয়শা খাতুন উল-কাঁটা গুটিয়ে রাখেন।

কতগুলো সোয়েটার হলো?

অনেক বাড়িতেই বানানো হচ্ছে। শ দুয়েক হয়েছে।

অনেক হয়েছে। শীত আসতে আসতে আরও হবে।

শ পাঁচেক তো হবেই।

আয়শা খাতুনও উঠে পানি খান।

আকমল হোসেন বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে বলেন, আজকের রাতটা অন্য রকম।

হ্যাঁ। ঘড়িটা মাথার কাছে আনব?

না। টেবিলে আছে টেবিলেই থাকুক। অ্যালার্ম বাজলে ঠিকই শুনতে পাব।

দুজনে ঘুমাতে গেলেন। কিন্তু কেউই ঘুমাতে পারলেন না। বুঝলেন, রাতটা অনেক দীর্ঘ।

একসঙ্গে ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে তিনটি ঘরে।

আকমল হোসেন ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। মাথা ঝিমঝিম করে। আয়শা খাতুন শুয়ে থাকেন। গুটিসুটি হয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরেন।

মেরিনা হাত বাড়িয়ে ঘড়ি নেয়। অ্যালার্ম পুরো বাজতে না দিয়ে সেটা বন্ধ করে। ঘড়িটা বালিশের নিচে ঢুকিয়ে রাখে। বিছানায় উঠে বসে থাকে। ওর মনে হয়, ওর সামনে সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিছানাই এখন ওর পৃথিবী। ও মাথা ঝাঁকায়।

মাহমুদা কানভরে অ্যালার্মের শব্দ শোনে। এই ভোরে শব্দের রেশ—ওর ভালোই লাগে। ও বিছানা ছাড়ে। বিছানা গোছায়। বাথরুমে ঢোকে। মুখহাত পোয়। পানির স্পর্শের স্নিগ্ধতায় নিজেকে সজীব মনে করে। আলমারিতে গুছিয়ে রাখা নিজের শাড়িটা বের করে সেটা পরে। চুল আঁচড়ায়। একমুহূর্ত বিছানার ওপর বসে থাকে। যেদিন ওকে আর্মি অফিসারদের গাড়িতে জোর করে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন ওর কোনো অস্ত্র ছিল না। আজ ওর কাছে অস্ত্র থাকবে। ফসফরাস বোমা আর গ্রেনেড। ওই বাড়ির বাথরুমে ঢুকে ও সেগুলোর পিন খুলবে। তারপর প্রতি ঘরে...। রফিকুল ইসলাম সকালে ড্রয়িংরুমে বসে কাগজ পড়েন। ওখানে একটি। শফিকুল ইসলামের ঘরের দরজা খোলা না পেলে ও নিজেই ধাক্কা দিয়ে ডাকবে। ওর কন্ঠস্বর শুনে চমকে উঠবে শফিকুল ইসলাম। দরজা খুলে বলবে, তুমি! ও বলবে, অফিসাররা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কয়েকটি কাপড় নিতে এসেছি। ওদের সঙ্গে থাকতে হলে তো সেজেগুজে থাকতে হয়। ওরা আবার আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে। দশ মিনিট সময় দিয়েছে।

পরক্ষণে নিজেকে ধমকায়। এসব ভাবার সময় এটা নয়। ওই বাড়িতে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। ও বারান্দায় আসে।

আকমল হোসেন বারান্দায় বসে ওর জন্য ব্যাগ গোছাচ্ছেন—ফসফরাস বোমা আর গ্রেনেড। ওসবের ওপর আয়শা খাতুনের কাপড় দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে খবরের কাগজ। মাহমুদার কাছে এলে বলেন, তুমি চা খেয়ে নাও, মা। আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব।

না, আঙ্কেল। আপনার যেতে হবে না। আমি রিকশায় যাব।

এসব নিয়ে রিকশায় যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি চা খাও। আমি গাড়ি বের করছি। আলতাফও যাবে আমাদের সঙ্গে।

এসো, মা। ডাইনিং টেবিলে মেরিনা বসে আছে তোমার জন্য।

আয়শার দিকে তাকিয়ে মাহমুদার বুক ধক করে ওঠে। এই মানুষটি সেদিন ওকে রাস্তা থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। কালকে তার গুনগুন ধ্বনি দিয়ে ওর জীবন ভরে দিয়েছে।

টেবিলে বসলে মেরিনা ওর দিকে একটি চমচম এগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমাকে খেতে বলেছেন। কালকে তুমি চমচম পছন্দ করেছিলে, সে জন্য মায়ের ইচ্ছা, তুমি একটা চমচম খাও।

আর কিছু না কিন্তু।

সে আমরা বুঝেছি। চমচম খেয়ে চা খাও। তোমার সঙ্গে আমি আর মাও যাব।

সত্যি? মাহমুদা খুশি হয়।

তুমি মাঝখানে বসবে। আমরা দুজন দুপাশে।

মন্টুর মা চা এনে টেবিলে রাখে, আপা, আপনি আবার আসবেন। আপনি তো পোলাও-রোস্ট খাননি। আবার এলে পোলাও-রোস্ট খেতে হবে।

মাহমুদা মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় নাড়ে।

তখন গাড়ি রেডি করে খবরের কাগজে চোখ বোলান আকমল হোসেন। শিক্ষার পাঠ্যসূচি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পাঠ্যসূচি থেকে উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনা বাদ দিয়ে মৌলবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানোর কথা বলা হয়। এ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানান জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযম। তিনি পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম-পরিপন্থী সব লেখা বাদ দেওয়ার কথা বলেন।

শিক্ষা সংস্কারকে অভিনন্দন জানিয়ে স্মারকলিপি দেয় ইসলামী ছাত্রসংঘ। বলা হয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের জন্য প্রবলভাবে ক্ষতিকর। এই শিক্ষা সমাজকে হিন্দুবাদ-ইহুদিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা জন্মগতভাবে পাকিস্তানি। কিন্তু পাঠ্যসূচিতে অনেক কিছু আছে, যা পাকিস্তানের আদর্শ, সংহতি ও অখণ্ডতার পরিপন্থী। ইসলামি সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।

ইসলামী ছাত্রসংগঠন সহশিক্ষা বাতিলের দাবি জানায়। তারা বলে, সহশিক্ষা আমাদের সমাজের জন্য অভিশাপ। এর দ্বারা তরুণসমাজের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটছে। সহশিক্ষা ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত না। একে বিলুপ্ত করতে হবে।

আকমল হোসেন এটুকু পড়ে মৃদু হেসে অন্য পাতায় যান। ডাইনিং টেবিল থেকে মাহমুদা আর মেরিনার কথা ভেসে আসছে। আকমল হোসেন উৎফুল্ল বোধ করেন। মেয়েটির স্পিরিট তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। মেয়েটি ভীত নয়। বেঁচে থাকার চিন্তায় তাড়িত নয়। আয়শা খাতুন তার পাশে এসে বসেন। বলেন, আমি রেডি। তুমি কি চা খাবে?

এখন না। ফিরে এসে খাব। আমি ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। ওরা আসুক আমার কাছে। আমি ওদের ডাকব না।

তিনি আবার কাগজের পৃষ্ঠায় ফিরে যান। দেশের কত জায়গায় শান্তি কমিটির নেতারা সভা করে, সে খবর পড়েন। প্রথমে কুমিল্লার হাজীগঞ্জ-তারা দেশের পরিস্থিতির জন্য ভারতকে দায়ী করে। তার পরের সভা হয় সিলেটের রেজিস্টার ময়দানে। সভা শেষে রাজাকাররা কুচকাওয়াজ করে। সভা হয় চৌমুহনীতে। তারপর চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে। এখানে ছয়জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করে। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। এরপর ময়মনসিংহ। শান্তি কমিটির গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা রাজাকারের হাতে তুলে দেয় দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে। এরপর পাংশা। এলাকার দালালেরা বলে, রাজাকার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্বক্ষণিক সতর্ক প্রহরার কারণে এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে।

একনজরে সবটুকু পড়ে তিনি কাগজ ভাঁজ করেন। শান্তি কমিটির দালালেরা কোথায় কী করছে, তা জেনে রাখা তিনি জরুরি মনে করেন। সে জন্য খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন।

কাগজ ভাঁজ করে সামনে তাকালে তিনি দেখতে পান, আলতাফ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পুবের আকাশ লাল করে সূর্য উঠি-উঠি করছে। আকমল হোসেন আয়শার দিকে তাকিয়ে বলেন, চমৎকার আগুনে-আভার আকাশ।

আয়শা চুপ করে থাকেন। একটু পর কী হবে, তা ভেবে বুক ধড়ফড় করে। তোলপাড় করছে তার ভেতরের সবটুকু।

মাহমুদা আর মেরিনা কাছে এসে দাঁড়ায়।

মাহমুদা শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি এখন যেতে চাই। আমাদের এখনই বের হতে হবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

আকমল হোসেন ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, এটা তোমার ব্যাগ। আমি তোমাকে পিন খোলা শিখিয়েছি।

আমার ভুল হবে না। আপনার কাছ থেকে যা শিখেছি, তা আমি ঠিকঠাকমতো করতে পারব। বাকিটা আমার ভাগ্য। আমার জয় বাংলা মামণির দোয়া। মেরিনার ভালোবাসা। আর আপনার মতো একজন বাবার স্নেহচ্ছায়ায় কয়েকটি দিন কাটানো আমার জীবনের বিরল সৌভাগ্য। আমি রেডি।

তাহলে চলো। তোমার যাত্রা শুভ হোক, মা।

মাহমুদা একমুহূর্ত দাঁড়ায়। দুহাতে চোখ মুছে আয়শা খাতুনের পায়ের কাছে বসে পড়ে। আয়শা খাতুন ওকে টেনে তোলেন। বলেন, এখন তোমার মনের জোর দরকার।

মনের জোর আমি একটুও হারাইনি মামণি।

আয়শা খাতুন ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

আপনারা আমাকে শান্তির মৃত্যু দিচ্ছেন, সে জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ও সোজা আলতাফের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আপনি যদি সেদিন আমাকে পথ থেকে তুলে না আনতেন, তাহলে আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য এই কাজটুকু করার সুযোগ পেতাম না।

আলতাফ দুহাতে চোখ মুছে নিজেকে সামলায়। চোখ মোছেন আয়শা আর মেরিনা। রান্নাঘরে বসে হাউমাউ করে কাঁদে মন্টুর মা।

গেট থেকে গাড়ি বের হয়। মাহমুদার কোলের ওপর ব্যাগ। ও দুহাতে ব্যাগ ধরে রাখে। ওর দুপাশে বসে আছে আয়শা আর মেরিনা।

আঙ্কেল, আপনি আমাকে মগবাজার রেললাইনের কাছে নামাবেন। তোমার ঠিকানা তো আরেকটু সামনে।

আমার মনে হয়, বাড়ির কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে না। আশপাশে রাজাকাররা থাকতে পারে। আমি একটি রিকশা নেব।

আচ্ছা। তুমি যা বলবে আজ আমি সেটাই করব। সিদ্ধান্ত তোমার। আমরা তোমার সহযোগী মাত্র।

অল্পক্ষণেই মগবাজার রেললাইনের কাছে পৌঁছে যায় গাড়ি।

আকমল হোসেন গাড়ি থামান। মেরিনা দ্রুত দরজা খুলে নামে। ওর হাতের ব্যাগ নিজে নিয়ে ওকে নামতে সাহায্য করে। আলতাফ নেমে একটি রিকশা দাঁড় করিয়েছে।

মাহমুদা মৃদুস্বরে বলে, বিদায়, জয় বাংলা মামণি।

বিদায়, মেরিনা।

রিকশাটা চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন আকমল হোসেন। আয়শা খাতুন-মেরিনা গাড়ির ভেতরে। তিনি দেখতে পান, আলতাফ নিজেকে সামলাতে পারছে না। কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছে।

আকমল হোসেন ধমক দিয়ে বলেন, থামো।

ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, স্যার, বাড়ি চলেন।

এখানে আর কিছুক্ষণ থাকব।

আশপাশের লোকজন কিছু ভাবতে পারে। সন্দেহ করতে পারে। দুচারজন দেখেছে যে রিকশাওয়ালার ভাড়া আপনি দিয়েছেন।

আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে, এমন ভান করতে হবে। গাড়ির ঢাকনা খোলো।

আয়শা খাতুন বলেন, তুমি এখানে থাকতে চাইছ কেন? আমাদের কাজ তো শেষ হয়েছে।

পনেরো মিনিট এখানে অপেক্ষা করে ওই বাড়ির গলিতে ঢুকব। জানতে হবে তো মাহমুদা কিছু ঘটাতে পেরেছে কি না।

মেরিনা সোৎসাহে বলে, আব্বা ঠিকই বলেছেন। আমাদের শেষ দেখে যাওয়া উচিত।

আকমল হোসেন গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়েন। চারদিকে রোদ ছড়িয়েছে। আলো-ঝলমল দিনের শুরু হয়েছে। রাস্তায় মানুষের চলাচল দেখা যাচ্ছে। তিনি ঘড়ি

দেখেন। দশ মিনিট শেষ হয়েছে। ভাবেন, এখন সরে পড়াই দরকার। দরকার হলে মালিবাগ-রামপুরা চক্কর দিয়ে এসে মগবাজারের গলিতে ঢুকবেন, যেখানে মাহমুদার রাজাকার শ্বশুরের বাড়ি।

রেলগেট ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে মগবাজার চৌরাস্তা থেকে বাঁয়ে মোড় নিতেই সামনে হইচইয়ের শব্দ পান। মানুষজন চেঁচামেচি করছে। বোমা বোমা—পালাও পালাও!

তার পরও তিনি গাড়ি গলিতে ঢুকিয়ে শাঁই করে সেই বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান। গাড়িতে বসে অন্যরা বাড়িটা দেখে। জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচিতে চারদিকে হুলস্থুল। আকমল হোসেন গাড়ি নিয়ে মেইন রোডে ওঠেন।

গাড়ি ছুটছে তীব্র গতিতে।

পার হয়ে যাচ্ছে বেইলি রোড, কাকরাইল, বিজয়নগর, দৈনিক পাকিস্তান চৌমাথা, মতিঝিল।

মেরিনা মায়ের হাত ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলে, স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছে মাহমুদা।

ও আমাদের ইতিহাস।

গাড়ি তখন হাটখোলার বাড়ির সামনে এসে থামে। আলতাফ গেট খুলে দেয়।

আকমল হোসেন আয়শার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আজ আমার ডায়েরির পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অক্ষরে মাহমুদার কথা লিখব।

আলতাফ নিজেকে আর সামলাতে পারে না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

কখনো জীবনের খেরোখাতার হিসাব

কখনো জীবনের খেরোখাতার হিসাব বাতাসে উড়ে যায়। মানুষ সব হিসাবের উর্ধ্বে উঠে গেলে যোগ-বিয়োগের ব্যাখ্যায় সে হিসাবের রশি টানা যায় না। একটি একটি গিট খুলে গেলে রশি লম্বায় বাড়াতে হয়। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত টানা হয় সে রশির সীমানা।

আকমল হোসেন-আয়শা খাতুন এমন উপলব্ধিতে নিচুপ হয়ে গেছেন। মেরিনার সঙ্গেও ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না। বড় বেশি নির্মম সত্যের সাক্ষী হওয়া মানুষ হয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন মেরিনার দিকে।

মেরিনা রেগে গিয়ে বলে, আপনারা এমন করে বাড়িটাকে ভুতুড়ে বানাচ্ছেন কেন? ভুলে যাচ্ছেন নাকি যে এটা গেরিলাযোদ্ধাদের আশ্রয়বাড়ি? ওরা এমন ভুতুড়ে বাড়ি দেখলে ভুলেও কেউ আর এখানে পা ফেলবে না।

মায়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে মেরিনা বলে, কী, কথা বলবেন না, আম্মা?

আমি তো তোর কথা শুনতে পাচ্ছি, মা। বল না, কী বলবি?

মেরিনা মায়ের কথা শুনে বাবার দিকে তাকায়।

আব্বা, আপনি কি আমার কথা শুনেছেন?

শুনেছি। তুই কিছু বলবি?

না। আমি আপনাদের ভূত তাড়াতে চেয়েছি। যাই নিজের ঘরে।

মেরিনা চলে যাওয়ার পরও দুজন চুপচাপ বসে থাকেন। দু-চারটি টেলিফোন আসে। কথা বলেন। কথা তেমনভাবে জমে না। কেমন আছ, ভালো আছি জাতীয় কথা। রাত

বাড়লে ভাত খান। ঠিকমতো খেতেও পারেন না। আয়শা খাতুন একবার বলেন, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

তাই বলেন, সে জন্য আপনি এমন গুটিয়ে বসে আছেন? আব্বা, আপনার কেমন লাগছে?

আমি জানি না, কেমন লাগছে। তবে তেমন খারাপ বোধ হয় নয়।

মেরিনা সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, যাক, বাঁচালেন।

খাওয়া শেষ হলে মেরিনা বাবা-মাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানা গুছিয়ে দিল। আয়শা খাতুন বিছানায় গেলেন। আকমল হোসেন পড়ার টেবিলে বসলেন।

রাতে দুজনের কারোরই ঠিকমতো ঘুম হলো না।

ভোর হলো। শেষ রাতের দিকে খানিকটা ঘুমিয়ে উঠে পড়লেন দুজনে। দিনের শুরু থেকে এরকম কাটল। দুপুরের পর থেকেই আয়শা খাতুন বলছেন, ভালো লাগছে না। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

আকমল হোসেন আয়শার কপালে হাত রেখে বললেন, জ্বর আসেনি। গা ঠান্ডা দেখছি। আমি আশরাফকে ফোন করে দেখি ও কী ওষুধের কথা বলে।

মাথাব্যথার জন্য তোমার ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করার দরকার নেই। আশরাফ টিপ্পনী কাটবে।

মেরিনা হাসতে হাসতে বলে, ডাক্তার চাচা মজার মজার টিপ্পনী কাটে। শুনতে ভালোই লাগে।

আজ আমার শুনতে ভালো লাগবে না, মা। তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে না। আমাকে একা থাকতে দাও। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

আব্বা, আপনি আম্মার কথা শুনবেন না।

ঠিকই বলেছ। আমি আশরাফকে দেখছি।

আকমল হোসেন ফোন ঘোরান। পাওয়া যায় আশরাফকে। মাথাব্যথার কথা শুনে ঝাড়ি দিয়ে বলে, মাথাব্যথা না ছাই। তোমার পিরিতের যন্ত্রণা। তোমার পিরিত কমাও, বন্ধু। আপাতত একটা পেইন কিলার খাওয়াও। আমি বিকেলে এসে দেখব।

আকমল হোসেন প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখার বাক্স থেকে একটা নোভালজিন ট্যাবলেট এনে আয়শাকে খাইয়ে দিয়ে বলেন, আপাতত চুপচাপ শুয়ে থাকো। নিশ্চয়ই কমে যাবে।

আমি বিছানায় গেলাম। দেখি, ঘুম আসে কি না।

মেরিনা মায়ের হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে আসে। বলে, আপনার জ্বর আসবে, আম্মা। গা গরম হচ্ছে। জ্বর কত উঠবে আল্লাহই জানে। মাথায় জলপট্টি দেব।

আমি একা থাকতে চাই, মা। আমার কিছু ভালো লাগছে না। দিনের বেলা হলেও মশারিটা ঠিকমতো খুঁজে দে। মশার উৎপাত বেড়েছে।

মেরিনা মশারি খুঁজতে খুঁজতে বলে, মাহমুদার ঘটনা কী...

মেয়েটা আমার ভেতরটা তোলপাড় করে দিয়েছে। পাকিস্তানি আর্মির হাতে নির্যাতিত হয়েও ও ভেঙে পড়েনি। কত বড় সাহসী কাণ্ড ঘটাল। বাড়ির একটি লোকও বাঁচল না। এমন একটা বীর মেয়েকে আমার স্যালুট করা উচিত।

আম্মা, আম্মা...

মেরিনা বুঝতে পারে, ওর মা আচ্ছন্নের মতো কথা বলছেন। মাহমুদার ঘটনা ওর মাকে বিধ্বস্ত করে রেখেছে। ওর দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডের পর দিনরাত এক হয়ে গেছে আয়শা খাতুনের। মায়ের দিকে তাকিয়ে মেরিনা নিজেও বিষণ্ণ হয়ে যায়। মাহমুদা ওকেও যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। ও আস্তে করে ডাকে, আম্মা আম্মা...

আয়শা খাতুন নিমীলিত চোখে তাকান। বলেন, বাতি বন্ধ করে দে।

তারপর চোখ বোজেন। মেরিনা বাতি বন্ধ করে চলে যায়। দরজা টেনে দেয়। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে, কোথাও একঝাক মৌমাছি গুনগুন করছে। আয়শা বিছানায় উঠে বসেন। আবার শুয়ে পড়েন। একসময় নেতিয়ে আসে শরীর। তার আর কিছু মনে থাকে না। স্মৃতিতে ভেসে থাকে হাজার হাজার মৌমাছির ওড়াউড়ি।

আকমল হোসেন সন্ধ্যায় ঘরে এসে মশারি উঠিয়ে আয়শার কপালে হাত রেখে চমকে ওঠেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কী করব, ভাবলেন। ডেকে তোলা ঠিক হবে। পুরোনো কাপড় ছিঁড়ে জলপট্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মেরিনাকে ডাকলেন। অনেকক্ষণ জলপট্টি দেওয়ার পরে তাঁর মনে হলো জ্বর খানিকটা কমেছে। ভাবলেন, একটু দুধ বা হরলিকস খাওয়ালে বোধ হয় স্বস্তি পাবে।

মৃদুস্বরে ডাকলেন, আশা।

সাড়া নেই। ঘুমের মধ্যেও মুখমণ্ডলজুড়ে বিষণ্ণতা ম্লান করে রেখেছে চেহারা। আকমল হোসেন বিপন্ন বোধ করেন। আয়শাকে কখনো এত বিষণ্ণ দেখেননি। মাহমুদার ঘটনা কি তাকে এতই বিপর্যস্ত করেছে? সাহসী মেয়েটির সাহসকে কেন দেখবে না আয়শা? পরক্ষণে ভাবলেন, এভাবে ভাবলে আয়শার প্রতি অবিচার করা হবে। আয়শা নিজেও বলেছেন, মেয়েটি বোমা ফাটিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে বাড়িটাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়েছে। এমন কথা বলার পরও মাহমুদার মৃত্যু আয়শাকে প্রবলভাবে ঘায়েল করেছে।

তিনি স্ত্রীর মুখের ওপর ঝুঁকে আবার ডাকলেন। সাড়া নেই।

ভাবলেন, তাঁর কাছে বসে থাকা উচিত। যদি নিজে নিজে ওঠেন। যদি কিছু চান। পানি কিংবা অন্যকিছু। কিংবা যদি তাকেই খোঁজেন? যদি বলেন, তুমি কি আমার কাছে একটু বসবে? দেখো তো আমার পালস ঠিক আছে কি না? তুমি আমার হাতটা ধরে রাখো।

আকমল হোসেন নিজের টেবিলে বসলেন। কাগজপত্র খুললেন। সকালের কাগজ আবার পড়বেন বলে উল্টালেন। সকালে পড়েছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করা হয়নি। এখন ডায়েরিতে লিখবেন বলে পাতা খুললেন—৭ আগস্ট, শনিবার গোলাম আযম কুষ্টিয়ার পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে শান্তি কমিটির সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিব ও বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দেশের মানুষ আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে। আমাদের ভাবী বংশধরেরা কোনো দিন এসব বেইমান ও বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করবে না। দেশকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাদ আহমেদ। সভায় যোগ দেন পশ্চিম পাকিস্তানের দুজন জামায়াত নেতা। একজন পাঞ্জাব থেকে নির্বাচিত এমএনএ নাজির আহমদ। আরেকজন রাওয়ালপিন্ডির রাজা মোহাম্মদ বারাসাত।

আকমল হোসেন নোট করার পর দেখলেন, কলমের কালি শেষ। দোয়াত থেকে কালি ভরলেন কলমে। আয়শার দিকে তাকালেন। ও গুটিসুটি শুয়ে আছে, যেন নিজেকে একটি পুঁটলি বানিয়েছে—নাকি ফসফরাস বোমা কিংবা গ্রেনেড? আকমল হোসেন চেয়ারে মাথা হেলান দিলেন। কলমের কালি পরীক্ষা করেন। মনে করেন, যুদ্ধের সবটুকু ইতিহাস তাঁকে লিখতেই হবে। মাহমুদা তার বুকের ভেতরের সবটুকু ভিত নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওর কথা ভেবে তিনি বিপন্ন বোধ করেন। চোখে পানি আসে। তিনি দুহাতে পানি মুছে আবার পত্রিকার পাতায় চোখ রাখেন।

নেত্রকোনায় শান্তি কমিটির সভা হয় বাংলা প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে। কমিটির নেতা ফারুক আহমদ বলেন, পাকিস্তান টিকে না থাকলে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, তাহজিব-

তমদুন, ইজ্জত—কিছুই রক্ষা হবে না। চব্বিশ বছর আগে এ দেশের মুসলমানরা যেমন অধিকারবঞ্চিত ও অবহেলিত ছিল, ঠিক তেমনি অধিকারহীন হয়ে হিন্দুদের গোলামে পরিণত হবে। আর এ জন্যই শেখ মুজিব ও তাঁর বাহিনী চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এবং দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনো শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না।

সভার সভাপতি বলেন, এই ডাকাতদল দেশকে মুক্ত করার নামে হিন্দুদের দাসত্বে আবদ্ধ করতে চায় জাতিকে। কাজেই এদেরকে মুক্তিবাহিনী বলা ন্যায়সংগত নয়। আকাশবাণীর জঘন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা কোনো মুসলমানেরই শোনা উচিত নয়।

আকমল হোসেন দ্রুত চোখ বোলালেন অন্যান্য খবরের ওপর। দেশজুড়ে রাজাকাররা কত কী করছে তার একটা খতিয়ান করলেন ডায়েরির পাতায়। ভাবলেন, এখন কি ঘুমোতে যাবেন? নাকি এই চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দেবেন? ভোরের অপেক্ষায় থাকবেন? আয়শার ঘুম ভাঙলে বলবেন, চলো, সূর্য ওঠা দেখি। গতকাল রাব্বানী বলেছে, তোমার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা বেশি। বাসাটা ছাড়বে কি না ভেবে দেখো। আর তা না করলে তুমি একা থাকো। আয়শা আর মেরিনাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।

আকমল হোসেন রাব্বানীকে বলেন, সবাই মিলে এই বাড়িটাকে দুর্গবাড়ি বানিয়েছে। এই বাড়ি ছেড়ে আয়শা-মেরিনা অন্য বাড়িতে প্রাণ বাঁচাতে যাবে না। ওরা এই বাড়ির প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাব্বানী মিনমিন করে বলেছিল, সবই বুঝি, কিন্তু পরিস্থিতি সামলেও চলতে হবে।

তিনি ভাবলেন, গেরিলাযোদ্ধাদের আশ্রয়ের ঠিকানা ভেঙে ফেলা ঠিক নয়। বিভিন্ন অপারেশনে গেরিলাদের সহযোগিতা না দিলে চলবে কেন? রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার রাবেয়া আর পরদেশী নির্যাতিত মেয়েদের খবর নিয়ে কার কাছে যাবে? না, এ বাড়ি ছাড়া চলবে না। তবে আরেকটু সাবধান হতে হবে।

তিনি চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ঘুমোতে চাইলেন। টেবিল-ল্যাম্প নেভালেন। ভাবলেন, ল্যাম্পের চারপাশে পিপড়েরা ভিড় করুক। ওরা আলোর কাছে জীবনের সমাপ্তি টানুক। মানুষেরও উচিত আলোর কাছে জীবনের সমাপ্তি টানা। স্বাধীনতাযুদ্ধ তো আলোর সময়। একজন মানুষের গৌরবের অর্জন সারা জীবনের সঞ্চয়। মাহমুদা আলোর সময়ে বীর নারী হয়েছে। এই নারীর স্মৃতি এই পরিবারের সবার জীবনের সঞ্চয়। মানুষ নিজে সঞ্চয় করে, অন্যের সঞ্চয়ও মানুষ নিজের মধ্যে রাখতে পারে। ওহ, এভাবেই ইতিহাসের পাতা ভরাবেন তিনি। যুদ্ধের ইতি ও নেতির সবটুকু তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আকমল হোসেন দেখলেন, টেবিল-ল্যাম্পের চারপাশে পিপড়েরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বাড়ছে। দু-একটা ডানা ঝাপটে পড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে—এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম, হায় বিধাতা! তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, তোমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলাম। মৃত্যু যে আলো, এই সত্য তোমাদের চেয়ে বেশি আর কে বোঝে! তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

সাত দিনের মাথায় আয়শা খাতুন উঠে বসলেন। প্রতিদিন এসেছেন ডা. আশরাফ। সারাক্ষণই চিন্তিত থেকেছেন। আকমল হোসেনকে বলেছেন, বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা। সব ধরনের রক্ত পরীক্ষা করালাম। কিছুই পাওয়া গেল না। আমার মনে হয়, কোনো বড় ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম থেকে এই অসুস্থতা হতে পারে। ভাবির অসুস্থতা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।

আকমল হোসেন ধীরে ধীরে মাহমুদার কথা বলেন। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত মাহমুদা কীভাবে শান্তি কমিটির নেতার বাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে, সে কথা বলেন।

ও যে আর ফিরে আসতে পারেনি, সেটাও কষ্ট হয় আশরাফের কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলেন, বুঝেছি। ভাবির অসুস্থতা নিয়ে আমাকে আর ভাবতে হবে না। তবে বিপদ কেটে গেছে। দুএক দিনের মধ্যে পুরো সুস্থ হয়ে যাবেন।

মেরিনা চা নিয়ে আসে।

আশরাফ জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেমন আছ, মা?

ধাক্কাটা আমি সামলাতে পেরেছি। আম্মা পারেননি।

বুঝেছি। দুদিন ধরে ধানমন্ডি ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে একজন যোদ্ধাকে দেখতে হয়েছে। রেকি করতে গিয়ে বুকে গুলি লেগেছে।

কেমন আছে? সুস্থ হবে তো?

মেরিনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

বিপদ কেটে গেছে। সুস্থ হতে এখন যে কয় দিন লাগে।

কয় দিন লাগতে পারে?

আমি মনে করছি, সাত-আট দিন লাগবে। তারপর ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পুরো বিশ্রামের জন্য। ওর বাড়িতে পাঠানো যাবে না। অন্য কোথায় রাখব, তা খোঁজ করছি।

ওরা কেউই বিশ্রাম নেবে না, চাচা। ওই একটি শব্দ ওরা বাতিল করে দিয়েছে।

তুমি দাওনি, মা?

হ্যাঁ, আমিও দিয়েছি। যুদ্ধের ভেতরে কত হাজার রকম কাজ থাকে, সেগুলো তো করতে হয়।

আশরাফ মৃদু হাসেন। হাসিতে আনন্দ। সময় জয়ের গল্প এখন চারদিকে। কোনো কিছুই থেমে নেই। ছুটছে আপন নিয়মে। কখনো প্রবল তীব্রতায়, কখনো নিজস্ব নিয়মের স্বচ্ছতায়। ছুটতেই হবে।

আশরাফ কপালের ওপর পড়ে থাকা এলোমেলো চুল হাত দিয়ে মাথার ওপরে ঠেলে দিয়ে বলেন, সজীবের বুকে গুলি লাগলে ওকে একটি লাল শার্ট পরিয়ে স্কুটারে করে ধানমন্ডিতে আনে শিপন। একজন রক্তাক্ত মুক্তিযোদ্ধার পাশে আরেকজন। প্রত্যেকেই দ্রুত বুঝে নেয় যে কী করতে হবে। ওরা এই শহরের আকাশে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

কথা শেষ হলে আকমল হোসেন বলেন, আমাদের সময়টা এমন। আশরাফ খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলেন, সময়টা এখন ঝুঁকির এবং মৃত্যুর।

না, চাচা, শুধু মৃত্যুর না, সাফল্যেরও। আমরা স্বাধীনতার পথে এগোচ্ছি। আমরা জয়ী হবই।

মা, তোমাকে দোয়া করি।

আশরাফ চায়ে চুমুক দিয়ে কাপ টেবিলের ওপর রাখলে ঠক করে শব্দ হয়। শব্দটা ঘরে টুনটুন করে বাজে। তিনজন মানুষ চারদিকে তাকায়। মনে হয়, একটি স্কুটার রক্তাক্ত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে এবং ফার্মগেটের ভাড়া করা বাড়িতে অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে যোদ্ধারা। টার্গেট পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়ি। বাষট্টি সালে গভর্নর হয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের হুকুমের দাস হয়েছিল লোকটি। নিজে বাঙালি। তার জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য আর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তার কোনো অঙ্গীকার ছিল না। উল্টো অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় আইয়ুব খানের পতনের আগে তার বিদায় হয়। তারপর বেশ কিছুকাল লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে ছিল। এখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেয় তাকে খতম করার।

একজন বলে, আমি একাই পারব। দুই দিন তার বনানীর বাসা রেকি করেছি। দরজা খোলা রেখে সন্ধ্যায় চামচাঁদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে আসর জমায়। ওকে মারতে আমাদের দুই জন লাগবে না।

ঠিক তো?

একদম ঠিক। দরকার হলে আরও একদিন রেকি করব। রেকি করতে আমাকে সহযোগিতা করছে বাড়ির গরুর রাখাল। ওর সঙ্গেই আমি একদিন ভেতরে ঢুকেছিলাম। কোথায় থেকে কী করা যায়, সব দেখে এসেছি। যেদিন আক্রমণ করতে যাব, সেদিন পেছনের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকব। সামনের গেট দিয়ে ঢাকা রিস্কি হবে। লোকটা একটা নরকের কীট। ওকে ধ্বংস করতে চারজন মুক্তিযোদ্ধার শক্তি ব্যয়ের দরকার নেই।

আরেকজন বলে, একই দিনে আমরা আরও একটি ঘটনা ঘটাতে চাই।

কোথায়?

কোথায় ঘটাব সেটা বুঝতে হবে।

লালবাগের শান্তি কমিটির নেতা আমাদের তালিকায় আছে। আমি ঠিক করেছি, সকাল থেকে ওর বাড়ির সামনে থাকব। বের হলে পিছু নেব। তারপর সুযোগ বুঝে গুলি।

গুলি! আশরাফ চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে আবার রাখেন। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে শব্দটি, গুলি! মাথা ঝাঁকিয়ে নেন। যুদ্ধের সময় গুলির ছোঁয়া দুপক্ষকেই নিতে হয়। তবে যোদ্ধারা নেয় বুকে, আর শত্রুপক্ষের কাপুরুষেরা নেয় পিঠে! আশরাফ মেরিনার ডাকে ঘুরে তাকান। মেরিনা বলে, আমি কি আপনার জন্য আরেক কাপ চা আনব, চাচা?

হ্যাঁ, মা। আমি আরেক কাপ চা চাই।

মেরিনা উঠে গেলে আকমল হোসেন বলেন, ফার্মগেট এলাকায় আমরা একটি চমৎকার দুর্গবাড়ি পেয়েছি। বেশ জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। নিরাপদও মনে হয়। ছেলেরা তাই বলে।

আমি একটু পরে ওখানে যাব। মাসের ভাড়ার টাকা দিয়ে আসব। আর গেরিলাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথাও জানব।

আমি বুকে গুলি নেওয়া ছেলেটিকে দেখে বাড়ি যাব। ভেবে আনন্দ পাই যে ঘরকুনো বাঙালির ছেলেরা কত অনায়াসে গুলির সঙ্গে যোঝযুঝি করছে। আমাদের আর কেউ ভিতু বলতে পারবে না।

থাক, নিজেদের গুণ আর নিজেদের গাইতে হবে না।

ঠিক বলেছিস। এখন বিশ্ববাসী গাইবে। ওই চায়নিজরা এবং আমেরিকানরাও গাইবে। যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তাদেরকে এর মূল্য দিতেই হবে। এখন উঠছি।

আশরাফ মেরিনার দেওয়া চায়ের কাঁপে শেষ চুমুক দেয়। প্রাঙ্গণে রাখা নিজের গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আগে আলতাফকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন আছ, আলতাফ?

ভালো নেই। একদম ভালো নেই। শরীরের চেয়ে মন বেশি খারাপ।

কী হয়েছে?

গ্রামে আমার ভাইটি রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বাবাকে বলেছি ত্যাজ্যপুত্র করতে। বাবা করেছেন। শয়তানটা বলেছে, ত্যাজ্যপুত্র করলে কী হবে, আমি বাবাকে ত্যাজ্য-বাবা করলাম। আর আমার বড় ভাইকে করলাম ত্যাজ্য-ভাই। ওর মুখ দেখতে না পেলে আমার কিছু আসবে-যাবে না। ও এত বান্দর হলো কেন ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না।

দুঃখ পেয়ো না। নিজেদের একদল মানুষ তো এমনই করছে। দেখছ না চারদিকের অবস্থা। চেনা মানুষও খোলস বদলে ফেলে।

আলতাফ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, আমার একটাই ভয়, ডাক্তার চাচা।

আশরাফ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলে বলেন, দেশ স্বাধীন হলে ও কি বাঁচতে পারবে? মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ও মরবে। ওকে বাঁচাবে কে?

যদি কেউ এভাবে নিজের মৃত্যু চায়, তাহলে তা-ই হবে। স্বাধীনতার বিপক্ষে চিন্তা করাটাই তো সবচেয়ে বড় অপকর্ম। এই অপকর্মের জন্য কাউকে মাফ করে দেওয়ার সুযোগ নাই। কেউ মাফ করতে চাইলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। তারাও শাস্তি পাবে।

আশরাফ গাড়িতে স্টার্ট দেন। গাড়ি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি আলতাফের দিকে তাকান। আলতাফই প্রথমে মাহমুদাকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনি। ভয়ও পায়নি। পাকিস্তানি আর্মির হাতে নির্যাতিত মাহমুদাকে বাড়িতে আনার জন্য ছুটে এসেছিল আকমল হোসেনের কাছে। তার বিপরীতে চলে গেছে তার ভাই। সে ভাইকে নিয়ে ও এখন দুশ্চিন্তায় আছে। ও ধরে নিয়েছে, দেশ স্বাধীন হবে, শুধু সময়ের ব্যাপার। আমরা সবাই আমাদের সময়কে এভাবে দেখছি। আশরাফ মতিঝিল পার হয়ে ধানমন্ডির দিকে যাবেন।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ওঠেন। কোনো ওষুধের দোকানে নেমে ওষুধ কিনতে হবে। জরুরি ওষুধ সারাক্ষণ নিজের কাছে রাখতে হয়। কখন যে কোথায় দরকার। হবে, কে জানে! আশরাফের মাথায় মাহমুদার ঘটনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

তখন আকমল হোসেন মৃদু হেসে আয়শার হাত ধরে বলেন, আজ আমার ধড়ে প্রাণ এসেছে। কয়দিন যা ভোগালে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে এভাবে কখনো ঘাবড়াইনি। তুমি তো দেখেছ।

ভেবেছিলে বাঁচব না?

অনেকটা সে রকমই। যমে-মানুষে টানাটানি বলে একটা কথা আছে না।

আমি মোটেই এতটা অসুস্থ হইনি। তুমি ভয় পেয়ে বেশি ভেবেছ।

তোমাকে হারানোর ভয় তো আমার আছে, আশা। আমি তোমার আগে মরতে চাই।

তোমার প্রাণটা উড়ে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে, তাতেই আমি খুশি। আজ রান্নাঘরে ঢুকব। কী খাবে, বলো?

আলতাফ বাজারে গেছে। ও কী আনে দেখি। তারপর বলব। রান্না নিয়ে আজ তোমাকে ঝামেলা পোহাতে হবে না। চলো, ড্রয়িংরুমে বসবে। তোমার উল-কাটা কই?

আমি নিচ্ছি। মেরিনা কোথায়?

ও নুসরাতের বাড়িতে গেছে। দুপুরের আগেই ফিরবে।

নুসরাতের বাড়িতে গেছে! দুপুরের আগেই ফিরবে! নুসরাতের বাড়িতে। আয়শা ভুরু কোঁচকান।

ওরা দুজনে মিলে বাংলাদেশের পতাকা বানাবে। সেসব পরিকল্পনা বোধ হয় করবে। আমাকে কিছু বলেনি। আমিও জোর দিয়ে জানতে চাইনি।

ঠিক আছে, থাক। ও এলে ওর কাছ থেকে শুনব। তুমি কি বের হবে?

হ্যাঁ, ফার্মগেটের বাড়িতে যাব। দেখা দরকার ওরা কী করছে। ওখানে ক্র্যাক প্লাটুনের ছেলেরা আসবে। দুপুরের আগেই ফিরে আসব।

ঠিক আছে, যাও।

তোমার মন খারাপ হবে না তো?

আয়শা মৃদু হেসে বলে, একটুতেই মন খারাপ করলে আমরা যুদ্ধ করব কীভাবে? তুমি ঘুরে এসো। আমি অপেক্ষা করব। একসঙ্গে ভাত খাব। অবশ্য ওখানে যদি বেশিক্ষণ থাকতে হয়, তাহলে ওদের কাছেই থাকবে। দুপুরের ভাত না হয় আমরা রাতেই খাব।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর গাড়ি ছুটে যায় রাস্তায়। ভিড় আছে। গাড়ি-রিকশার ভিড়। মাঝেমধ্যে আর্মির গাড়ি দেখা যায়। আকমল হোসেন দেখলেন, রাস্তায় আর্মির মুভমেন্ট বেশি। কোথাও কিছু ঘটেছে কি? নাকি ওরা পঁচিশে মার্চের মতো কিছু একটা ঘটানোর পায়তারা করছে! ভেবেছে, শহরের গেরিলারা হয়তো কয় দিন পর শহরটা দখল করে নিতে পারে। তারপর এমন একটি রাস্তায় গাড়ি চালাতে তিনি ভীত হন না। বরং স্বস্তিই পান। ওদেরকে সন্ত্রস্ত-আতঙ্কিত দেখলে নিজের ওপর আস্থা বাড়ে। বোঝেন, যে শক্তি জাহির করার জন্য ছেলেরা রাস্তায় নেমেছে, সেখানে তারা সফল। আর এই সাফল্যে আকমল হোসেন নিরাপদে ফার্মগেটের বাড়িতে ঢুকে যান। গাড়ি রেখে আসেন বেশ খানিকটা দূরে। কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে যেতে নিরাপদ বোধ করেন না। বাড়ির দুর্গচরিত্র জানাজানি হয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। এমনিতেই এই বাড়ি থেকে অস্ত্রশস্ত্র নেওয়ার জন্য ছেলেদের প্রায়শই আসতে হয়। গাড়ি দূরে রেখে ফুটপাত ধরে হেঁটে এদিকওদিক তাকিয়ে আড়ালে ঢুকে পড়েন। তারপর গেরিলাদের হাইড।

ড্রাইভিং সিটে বসে থাকে আলতাফ।

গাছপালায় ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন বাড়িটি ভীষণ মন টানে। এখানে এলেই তার গাছের নিচে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ইট-কাঠের বাড়িতে এমন স্নিগ্ধতা বুঝি আর হয় না। আজও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস টানলেন। ছোট ছোট বুনো ঝোপে পা রাখলেন। পা দিয়ে ফুটে থাকা লজ্জাবতী ফুল বুজিয়ে দিলেন। পেছন থেকে স্বপন হাততালি দিয়ে দৌড়ে আসে।

আঙ্কেল, এটা মজার খেলা। আমিও আপনার সঙ্গে খেলব।

এসো। আমরা পাঁচ মিনিট খেলব। বেশি সময় না।

পাঁচ মিনিট আমার জন্য অনেক সময়, আঙ্কেল।

স্বপন লজ্জাবতী ঝোপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে বেগুনি ফুল বুজিয়ে দেয়। তারপর ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলেন, আঙ্কেল।

আকমল হোসেন ঘাসে পা মুছে স্যান্ডেলে পা ঢোকান। ভাবেন, এখানে আশরাফকে নিয়ে আসতে হবে। ও ঘাসের পরশে স্নিগ্ধ হয়ে বলবে, এই দেশটা এত সুন্দর কেন? চলো, দুজনে পায়ে হেঁটে দেশটা ঘুরে বেড়াই।

আকমল হোসেন গেরিলাদের সঙ্গে বসে ওদের পরিকল্পনার কথা জানতে চান। তখন একটি কাগজ দেখছিল সবাই মিলে। একটি টিপয়ের ওপরে রাখা কাগজের চারপাশে ওরা বসে আছে। কেউ হাটু মুড়ে, কেউ পা গুটিয়ে। ওদের মনোযোগ গভীর। আকমল হোসেন ওদের সঙ্গে বসে পড়েন। ওরা তার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দেয়।

হাবীব বলে, আমরা স্টেট ব্যাংকের এই ম্যাপটি করেছি, আঙ্কেল। আপনি দেখেন। আমাদের নেক্সট অপারেশন এখানে হবে।

স্টেট ব্যাংক তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট ভবন। প্রতিটি গেটে কড়া পাহারা থাকে। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করতে হবে।

আমরা ঠিক করেছি পাঁচজন যাব। সিরাজ এর মধ্যে রেকি করে এসেছে। ঘটনার দিন দুলাল যাবে রেকি করতে।

এই কাগজটা দেখুন, চাচা। এই যে গেট। কতক্ষণ পরে পরে যে পাহারার বদল হয়, সেটা আমরা জানি। আমরা ঠিক করেছি, পাহারা বদলের সময়টা কাজে লাগাব। রদবদলের সময় ওরা কিছুটা অন্যমনস্ক থাকবে, ফুল অ্যাটেনশন দেবে না।

আকমল হোসেন চিন্তিত মুখে বলেন, ওদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক অস্ত্র।

তা আমরা জানি। এটাও দেখে এসেছি যে ব্যাংকের একপাশের বাংকারে পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ পাহারায় থাকে। ব্যাংক ভবনের দেয়াল ঘেঁষে আছে ওই সব পুলিশের দুটো ক্যাম্প।

আকমল হোসেন মনোযোগ দিয়ে ওদের আঁকা ম্যাপটা দেখেন। দেখে খুশি হন। ওরা ভালো পরিকল্পনা করেছে।

আমরা অপারেশন এই সময়ে করার জন্য একটি কারণ বেছে নিয়েছি।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে বলেন, দুররানি আসবে এ জন্য?

ঠিক, চাচা, একদম ঠিক। একটা হাড় বদমাশ লোক। পিআইএতে বাঙালিদের দমন-পীড়নের একজন বড় হোতা। তাকে আবার স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়েছে।

আমি জানি, বাবারা। তোমরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ও ঢাকায় আসছে চার দিনের এক সম্মেলন উদ্বোধন করতে। সম্মেলনে অংশ নেবে ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা। সব তথ্যই খবরের কাগজ থেকে পাওয়া। এ সময়ে একটা অপারেশন করতে পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বুঝবে ওরা। দুররানিকেও বোঝানো দরকার। তারপর করাচিতে ফিরে

প্রভুদের বলবে ঢাকার ঘটনা।

ছেলেদের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আকমল হোসেন ভাবেন, ওদের মুখের দিকে তাকালে নিজের বয়স কমে যায়। তিনি ওদের বলেন, তোমাদের জন্য যে জিলাপি আর বাখরখানি এনেছি, তোমরা তা খাও।

ছেলেরা প্যাকেট খুলে ওগুলো বের করে। হুটোপুটি করে খায়। তাঁর দিকে এগিয়ে দিলে তিনি বলেন, তোমরাই খাও। আমি বাড়িতে যাই।

জয় বাংলা মামণি এখন কেমন আছেন?

ভালো আছেন। সুস্থ হয়েছেন।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ঘরের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ধ্বনি। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলে মনে হয়, ওরা আছে বলে শহরের বাতাসে জীবন আছে। শত্রুপক্ষের পায়ের নিচে পড়ে গিয়েও শহর মাথা তুলে রাখে ওদের জন্য। তিনি ফুটপাত ধরে হটেন। আর্মি ক্যাম্পের পাশ কাটিয়ে সাধারণ মানুষের গা-ছুঁয়ে যখন নিজের গাড়ির কাছে আসেন, দেখতে পান, সিনেমা হলের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইটির মাথার ওপর কাক উড়ছে। তিন-চারটে কাক। কা কা শব্দ তার কানে ঢুকলে তিনি মনে করেন এরাও শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গোলাবারুদের বিপরীতে বেঁচে থাকার সূত্র। নির্মীয়মাণ সিনেমা হলের দালান ছাড়িয়ে আরও খানিকটুকু হাঁটতে হলো তাকে। দেখলেন, নিমগাছের ডালে সাদা ফুল। দেখলেন ফড়িং ও প্রজাপতি। একঝাক চড়ুইও আছে। ভাবলেন, বেঁচে থাকা সুন্দর। এর সঙ্গে যোগ হবে স্বাধীনতা।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, মেরিনা ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। বেশ উত্তেজিত। বাবাকে দেখে খানিকটা দম ফেলে। ইদানীং মেয়েটি এমন আচরণ করছে। শান্ত মেজাজ হারাচ্ছে। যুদ্ধ ওকে একরোখা করেছে। অনেক কিছুই ও সহজে মেনে নিতে চায় না। তিনি বিষয়টি আঁচ করার জন্য বললেন, কী হয়েছে, মা?

আমি তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। সবই বলব। আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন, আব্বা। খিদে পায়নি?

হ্যাঁ, তা পেয়েছে। বেলাও তো কম হয়নি।

আম্মাও খাননি। আপনার জন্য বসে আছেন। আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি। খেতে খেতে কথা বলব। মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। চেনা কারও আছাড় খাওয়া দেখলে খুবই খারাপ লাগে। মানতে পারি না।

শান্ত হ মা। বুঝেশুনে এগোতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপই সতর্ক পদক্ষেপ হতে হবে।

বুঝি, আব্বা। আপনি কাপড় চেঞ্জ করে আসুন। আম্মা, আসেন।

আকমল হোসেন শোবার ঘরে আসেন। আয়শাও যান। জিজ্ঞেস করেন, পরবর্তী অপারেশন কোথায় হবে? ছেলেরা কী বলল?

স্টেট ব্যাংক ভবন। ওরা একবার রেকি করে এসেছে।

রাইট সিদ্ধান্ত। কাগজে দেখলাম দুররানি আসবে। ওদের অপারেশনের সময় কখন?

সন্ধ্যা ছয়টায়। বেলা বারোটায় রেকি করবে দুলাল।

আকমল হোসেন বাথরুমে ঢোকেন। গরমে ঘেমে গেছেন। শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালেন। যেন তাঁর প্রিয় নদী তিতাস এখন শরীরের ওপরে। মহা আনন্দে ভিজতে থাকেন। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসতেন। ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজতেন। নয়তো সিঁড়ির সামনের পার্কে বা দূরের মাঠে। কেউ তাকে শাসন করে ফেরাতে পারত না। আর বাড়ির কারও কাছ থেকেই বকুনি শুনতে হয়নি। কারণ, কোনো দিন জ্বর হয়নি বা ঠান্ডা লাগেনি। মা বলতেন, আমার ছেলেটার গায়ের ওপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে যায়। কখনো ভেতরে ঢোকে না। বৃষ্টি ওর সঙ্গে খেলা করে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে শৈশবের কথা ভেবে ভীষণ আনন্দ হয় তার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। জলকে নির্বিঘ্নে গড়াতে দেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর আয়শা দরজায় শব্দ করেন।

কী হলো? এত সময় নিয়ে গোসল করছ কেন? তুমি সকালেও গোসল করেছ।

আকমল হোসেন ট্যাপ বন্ধ করেন। সব কাজের ব্যাখ্যা সব সময় হয় না। যে আচরণটি করে, তার ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। যদি সেই আচরণটি খুবই ব্যক্তিগত হয় ও অন্যকে বিব্রত না করে। এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে তিনি মনে করেন, সব কেনর উত্তর খুঁজতে গেলে অকারণ আনন্দ লাভ কীভাবে হবে? অন্যরা যখন আরেকজনের আচরণের কারণ জানতে চায় সেটার উত্তর না দেওয়াই ভালো। তিনি গা মুছে দরজা খুললেন।

কী হয়েছে? আয়শা ভুরু কুঁচকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

কিছু হয়নি তো। আকমল হোসেন নির্বিকার কণ্ঠে হাত নাড়েন। ভাবটা এমন যে, দেরি করেছি তো কী হয়েছে? গোসল করব তার জন্য তোমাকে জবাব দিতে হবে। কেন, আশা? আমি তোমাকে ভালোবাসি। দুজনে ছাব্বিশ বছর সংসার করেছি। সুখ-দুঃখে ভালোই তো দিন কাটিয়েছি। তিনি আয়শার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলেন।

আয়শা তাঁর হাসির অর্থ বুঝতে পারেন না। অবাক হয়ে বলেন, ছেলেমানুষি করলে?

মনে করো তা-ই। আকমল হোসেনের কণ্ঠ আগের মতোই নির্বিকার।

কার সঙ্গে করলে?

আকমল হোসেন জোরে হেসে ওঠেন, যেন নদীর কল্লোল তাঁর শরীরজুড়ে ছলছল করছে। সে শব্দ আয়শা খাতুনের কানে এসেও পৌঁছায়। তার ভালোই লাগে।

তিনি কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, নদীর সঙ্গে। তিতাস নদী।

আয়শা নিজেও হাসিমুখে বলেন, কী যে পাগলামি করো। চলো, খাবে। মেরিনা বসে আছে। মেয়েটা বলছিল ওর খিদে পেয়েছে।

তুমি যাও। আমি আসছি। মাথা আঁচড়ে নিই। আবার চুল থেকে পানি পড়তে দেখলে মেয়েটা আবার বলবে, আব্বা ডাইনিং টেবিলের ম্যানারই শিখল না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার চুল নিয়ে ছেলেমানুষি করবে না তো? আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

করতেও পারি। তোমার আশঙ্কা ঠিকই আছে। আজ আমি মনে মনে ছেলেমানুষি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বেশ করেছ। এবার কোন নদী?

নদী না। এবার গাছ। ঝকড়া নিমগাছ। একটু আগে দেখে এসেছি। এতই ঝকড়া যে ওটার নিচে দাঁড়ালে আকাশ দেখা যায় না। আমি ফার্মগেট গেলে ওই গাছের নিচে দাঁড়াই। দু-পাচটা নিম ফল কুড়িয়ে নিই। আজও গাছটা ভালোই মিলিয়েছ।

তোমার মাথার ঝাকড়া চুলের সঙ্গে মিলবে। যুদ্ধের সময়ও তোমার মাথা থেকে গাছ আর নদী সরে যায় না। পায়রা বাপু।

আমি গেলাম।

মাকে টেবিলে দেখে মেরিনা ভুরু কোঁচকায়—আব্বা, গোসল হয়নি? আজ কেন আব্বা এত সময় লাগিয়ে গোসল করছেন? আব্বার কী হয়েছে?

তোমার আব্বার কিছুই হয়নি। বরং আমি দেখে এসেছি যে বেশ আনন্দে আছেন। বলা যায়, তোমার আব্বা খেলছেন।

মানে? কী খেলা খেলছেন? কার সঙ্গেই বা খেলছেন?

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে খেলেছেন তিতাস নদীর সঙ্গে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খেলছেন ফার্মগেটের নিমগাছের সঙ্গে।

বুঝেছি। আব্বা আনন্দে আছেন। স্টেট ব্যাংক অপারেশন সাকসেসফুল হবে। ওয়াও-ও-ও-

মেরিনা উচ্ছাসে হইচই করে ওঠে। ভাতের থালায় চামচ দিয়ে টুংটুং শব্দ করে বলে, জয় বাংলা।

আকমল হোসেন ততক্ষণে টেবিলের সামনে আসেন। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়েছেন। নীল রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। যদিও লুঙ্গি পরা এবং পায়ে স্যান্ডেল, তার পরও তাকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। আয়শা তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকান এবং বুকের ভেতরে টুং করে ওঠে। তিনি প্লেটে ভাত দেওয়ার জন্য চামচের দিকে হাত বাড়ান। তাঁর দৃষ্টি মানুষের ওপর থেকে বস্তুর ওপরে আসে।

মেরিনা কলকল করে বলে, কনগ্রাচুলেশনস, আব্বা।

আকমল হোসেন চেয়ার টেনে বসে নিজের প্লেটে হাত রাখেন। পরে মেরিনার দিকে ঘুরে বলেন, বলল, কী করেছি? সাফল্য কোথায়?

আপনি আনন্দে আছেন, একটি সাকসেসফুল অপারেশনের জন্য। সাফল্য আপনার দোরগোড়ায়, আব্বা।

ঠিক বলেছ। কনগ্রাচুলেশনস এ বাড়ির সবাইকে। দাও প্লেটভর্তি ভাত দাও। পেট পুরে খাই।

আয়শা মৃদু হেসে বলেন, কতটুকু খেতে পারবে তা তো আমি জানি। নিজেই তো বলো, যতকাল বেঁচেছ তাতে অনেক খাওয়া হয়েছে। এবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে হবে। আমি তো দেখেছি কমিয়েছ।

আকমল হোসেন মৃদু হাসেন। আয়শার কথার জবাব দেন না। কত কথাই তো জমে আছে বুকের ভেতরে। সব কথা কি আয়শাকে বলা হয়েছে? না, হয়নি। যত দিন বাঁচবেন, তত দিন বলেও শেষ করতে পারবেন না। কিছু কথা অনুক্তই থাক।

আকমল হোসেনের প্লেটে ভাত দিলে তিনি প্রথমে লালশাক ভাজি দিয়ে খেতে শুরু করেন। দুলোকমা খেয়েই বলেন, এবার তোমার কথা বলো, মা।

আপনি তো জানেন, আব্বা, নুসরাতের ভাই রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ট্রেনিং শেষ করেছে। ওর অ্যাটিচুড খুবই আক্রমণাত্মক, আব্বা।

আকমল হোসেন খাওয়া বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মেরিনা আবার বলতে থাকে, গেরিলাযোদ্ধারা তো ঠিক করেছে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে গ্যাস বেলুনে বেঁধে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হবে। আমি, নুসরাত, হাসনা, ঝর্না পতাকা বানানোর দায়িত্ব নিয়েছি। নওশীন একদিন হঠাৎ করে বাড়িতে এসে নুসরাতকে পতাকা সেলাই করতে দেখে। কাপড়গুলো মেঝেতে টেনে ফেলে পায়ের নিচে রেখে দাঁড়ায়। তারপর ওকে শাসিয়ে বলে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে নুসরাতকে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে দিয়ে আসবে।

কী? কী বললে?

আব্বা, ও এত দূর বেড়েছে। নুসরাত আমাকে কাঁদতে কাঁদতে এসব বলেছে। আরও বলেছে, মেরিনা, ও বোধ হয় আমার আপন ভাই না। আপন ভাই হলে ও আমাকে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে দিয়ে আসার কথা বলতে পারত না। মা গো, কী করে ও এসব কথা মুখে আনল!

নুসরাতের আব্বা-আম্মা...

তাঁদের জীবন তো অতিষ্ঠ। নুসরাতের বাবা নাকি ওকে ছাতা দিয়ে তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু সবাই খুব তটস্থ। ছেলেটা কী ঘটাবে চিন্তা করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। চাচা বললেন, ছেলেটি যদি আরেকবার বিরক্ত করতে আসে, তবে বাড়িতে তালা দিয়ে গ্রামে চলে যাবেন।

আকমল হোসেন ভাত খেতে পারেন না। হাত থেমে থাকে প্লেটের ওপর। আয়শা মৃদুস্বরে বলেন, তুমি ভাত খাও। সবকিছু সহ্য করতে হবে। ভাতও খেতে হবে।

আকমল হোসেন প্লেটের ভাত রেখে উঠতে গেলে মেরিনা তড়িঘড়ি বলে, আব্বা, আমার কথা তো শেষ হয়নি।

বলো, মা। আকমল হোসেন এক গ্লাস পানি শেষ করেন। আকস্মিকভাবে মনে করলেন, তার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তিনি মরুভূমির মতো বিরান জনপদে একা একা পানির জন্য ঘুরছেন।

আব্বা, আপনি ভাত শেষ করেন। আমিও খেয়ে নিই।

আকমল হোসেন খুব বিষণ্ন বোধ করেন। তার পরও খেতে শুরু করলে আয়শা তার প্লেটে পাবদা মাছ তুলে দেন।

মাছটা ভাতের মাঝখানে টেনে এনে বলেন, মারুফ পাবদা মাছ খুব ভালোবাসে।

আব্বা, এভাবে মনে করে মন খারাপ করবেন না। পাবদা মাছটা আপনি আয়েশ করে খান। এ বাড়িতে সবাই পাবদা মাছ ভালোবাসে।

মাছ দিয়ে এক লোকমা ভাত মুখে পুরে বলেন, গত সাত দিন ছেলেটার ফোন পাইনি।

ও ফোন করেছিল। আপনি বাইরে ছিলেন, আম্মা অসুস্থ। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।

আমাদের তো বলোনি, মা।

ইচ্ছে করে বলিনি। ভাইয়া মনে করছে এ বাড়িতে আমার আর থাকা ঠিক হবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের আসা-যাওয়ায় বাড়িটা আশপাশের লোকদের নজরে পড়তে পারে বলে ভাইয়া মনে করছে। সে জন্য আমাদের সতর্ক হতে হবে। নওশীনের এই হুমকি শুনে আমার মেজাজ আর ঠিক নেই।

মেরিনা থেমে এক গ্রাস ভাত খায়। পানিও।

ও কি তোমাকে ত্রিপুরা নিতে চায়?

হ্যাঁ, আব্বা। বিশ্রামগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে হাসপাতাল করা হয়েছে, ওখানে নার্স হিসেবে কাজ করব। ঢাকা থেকে বেশ কয়েকজন মেয়ে গেছে।

আকমল হোসেন চিন্তিত মুখে ভাতের প্লেটের ওপর মুখ নামান। আকস্মিকভাবে গবগবিয়ে তিন-চার গ্রাস ভাত খেয়ে ফেলেন। আয়শা খাতুন পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেন, পানি খাও।

আকমল হোসেন পানির গ্লাস নেন। হাতে নিয়ে আবার টেবিলে রাখেন। বুঝতে পারেন, পানি খাওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

আব্বা, আমার আরেকটা কথা আছে।

আয়শা ধমকের সুরে বলেন, এসব কথা এখন বন্ধ রাখ, মেরিনা। খাওয়ার পরে নিরিবিলি এসব কথা বলা যাবে। কী করা হবে, সেটাও আমরা চিন্তা করতে পারব। তোমার কোনো ভাবনা থাকলে তা-ও আমাদের জানাবে।

এবার অন্য কথা, আম্মা। পতাকার কথা।

আকমল হোসেন চোখ তুলে সরাসরি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, পতাকার কথা কী?

আমার আরও কিছু কাপড় দরকার হবে, আব্বা।

আগে যেভাবে কিনেছিলাম, সেভাবে?

আগের মতো টুকরো টুকরো আনতে হবে। সবুজ লুঙ্গি, লালসালু আর হলুদ কাপড়।

বুঝেছি। একসঙ্গে আনলে ওরা সন্দেহ করবে। তুমি চিন্তা কোরো না, মা। আমি বিকেলেই বের হব। কতগুলো বানাবে ঠিক করেছ?

পাঁচ শ। দেখা যাক কতগুলো পারি। মানচিত্রটা কেটে সেলাই করতে সময় লাগে। তবে সবাই মিলে তিন শ তো হবেই।

ভেরি গুড। আমি উঠছি।

তোমার আব্বা কাজ পেলে সবচেয়ে খুশি হয়। তাই বলে ভেবো না যে মাছ-তরকারি কিনতে বললে খুশি হয়।

মেরিনা হাসতে হাসতে বলে, তা আমি জানি, আম্মা। যুদ্ধ আব্বাকে নতুন মানুষ করেছে।

আমাদেরকেও। আয়শা জোরের সঙ্গে বলেন।

হ্যাঁ, আমাদেরকেও নতুন মানুষ করেছে, আম্মা।

যেতে যেতে আকমল হোসেন ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, পতাকা ওড়ানোর সময় মারুফ কি ঢাকায় থাকবে?

ও আসবে বলেছে। তবে কবে আসবে, তা নিশ্চিত নয়।

বাড়িতে কি আসবে?

তা কিছু বলেনি।

আচ্ছা, দেখা যাক।

আকমল হোসেন হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমে যান। মেরিনা প্লেটের ভাতটুকু শেষ করে বলে, ভাইয়া বলেছে, মাকেও খালাদের কারও বাড়িতে সরিয়ে দেব।

তোর বাবা কি একা থাকবে?

আলতাফ ভাই থাকবে।

না, তা হবে না। তোর বাবাকে একা রেখে আমি কোথাও যাব না। ছাড়তে হলে সবাই এই বাড়ি ছাড়ব।

এই অনিশ্চিত সময়ের সিদ্ধান্ত এক রকমই হওয়া দরকার। আমরা এখন থেকেই ভাবব, মা।

মেরিনা প্লেট-বাটি-গ্লাস গোছাতে থাকে। মন্টুর মা এসে নিয়ে যায়। দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকেল সূচিত হয় মাত্র, তখন আকমল হোসেন পতাকার জন্য কাপড় কিনতে বের হন।

আজ স্টেট ব্যাংকে অপারেশন

আজ স্টেট ব্যাংকে অপারেশন। ক্র্যাক প্লাটুনের পাঁচজন সদস্য তৈরি। ব্যাংকের একজন পিয়নের সাহায্যে বেলা বারোটার দিকে রেকির কাজ শেষ করা হয়েছে। অপারেশনের সময় ছয়টা।

এদের কাছে আছে স্টেনগান ও হ্যান্ড-গ্রেনেড। বিস্ফোরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে প্লেটার চার্জ। ওর ভেতরে আছে কুড়ি পাউন্ড পিকে এবং সাত সের স্প্লিন্টার।

প্লেটারটি বানানোর খরচ দিয়েছেন আকমল হোসেন। এখন ঘড়ি ধরে বসে আছেন। তিনি জানেন, তার সামনে এখন একেকটি মুহূর্ত অনন্তকাল। ড্রয়িংরুমে মৃদু আলো জ্বলছে। মেরিনা ওর নিজের ঘরে। পতাকা বানানোতে ব্যস্ত। আয়শা খাতুন সোয়েটার বোনা বাদ দিয়ে পতাকা সেলাইয়ে হাত লাগিয়েছেন।

আকমল হোসেনের সামনে পরিকল্পনার কাগজ। তিনি খুঁটিয়ে দেখছেন। বিস্ফোরক প্লেটারটি ব্যাংকের উত্তর দিকের গেটে পুলিশদের বাংকারের পাশে বসানো হবে। হাতের আড়ালে স্টেনগান লুকিয়ে মনিরুল কাভার দেবে। গ্লাক্সো ভবনের কাছে গ্রেনেড নিয়ে তৈরি থাকবে মাসুদ ও জিনাত। ওরা রিকশায় করে স্টেট ব্যাংক ভবনের গেটের কাছে আসবে।

আকমল হোসেন ম্যাপের ওপর মাথা নামিয়ে রাখেন। চোখ সরাতে পারছেন না। মাথাও তুলতে পারছেন না। তাঁর মনে হয়, তিনি ফিক্সড হয়ে গেছেন অপারেশন ম্যাপের ওপর। বুঝতে চাচ্ছেন, এখন ওরা কোথায়। ঘড়ি দেখে সময় মেলালেন। ধরে নিলেন, ওরা এখন প্লেটার চার্জ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানেন প্লেটারটি ওজনে ভারী এবং দেখতে খানিকটা অন্য রকম। প্রচলিত আকারের নয়। যে কেউ বলবে, অদ্ভুত এই জিনিসটা কী।

সন্ধ্যা বলে রাস্তা বেশ ফাঁকা। লোক চলাচল কম। রিকশা আছে। যারা হাঁটছে তারা বেশ দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে। শাহজাহান আর জলিল বাক্সটি নিয়ে দ্রুত পায়ে যায়। পাহারারত পুলিশের সন্দেহ হয়। এগিয়ে আসতে থাকে ওদের দিকে। ওরা বুঝতে পারে

যে এটা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। ওরা বাক্সটি এক জায়গায় রেখে খানিকটা দূরে সরে যায়।

পুলিশ কিছু অনুমান করতে না পেরে পিছু হটে নিজের জায়গায় যায়। ওদেরকে একটু বিভ্রান্ত মনে হয়। বোঝা না-বোঝার দোলাচলে ওরা নিজের অবস্থান নেয়। চারদিকে তাকায়।

মুহূর্ত সময় মাত্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় মনিরুল। বুঝতে পারে যে দেরি করলে সময় নষ্ট হবে। ও একটি সিগারেট জ্বালিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। কয়েকজন পথচারী অদ্ভুত বাক্সটি দেখে দাঁড়িয়েছে। নানাজনে নানা কথা বলছে। মনিরুল সিগারেটে টান দিয়ে এগিয়ে যায়। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে প্লেটারের চার্জকে ইগনাইট করে। তারপর নিমেষে সরে পড়ে। ওর এই কাজটুকু দেখে পথচারীসহ এগিয়ে আসা পুলিশের মনে হয় কিছু একটা ঘটবে। ওরা ঝটিতি পিছু হটে যায়। অল্পক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ড-গ্রেনেড ছুড়ে মারা হয়।

চোখের পলকে জনশূন্য হয়ে যায় এলাকা।

গেরিলারা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে ফোন দেয় আকমল হোসেনকে। উজ্জ্বল মুখে তিনি বলেন, কনগ্রাচুলেশনস। ফোন কেটে দেন।

আয়শা হেসে বলেন, খবর পেয়ে গেছি। তোমাকেও অভিনন্দন। যাই, পতাকা বানানোর কাজটা শেষ করি।

হ্যাঁ, দ্রুত করো। সময় বেশি নেই।

বলতে বলতে তিনি নিজের পড়ার টেবিলে এসে কাগজ খুলে বসেন। প্রতিদিনের কাগজ না পড়লে তিনি একটুও স্বস্তি পান না।

প্রথম যে খবরে চোখ যায়, তা টিক্কা খানের নির্দেশ। সামরিক দপ্তরের এক নোটিশে যোলোজন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে কাউকে নাটোরের ২ নম্বর সেক্টরের উপসামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। কাউকে কাউকে যশোরের ৩ নম্বর সেক্টরের উপসামরিক প্রশাসকের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আকমল হোসেন নামগুলো লিখে রাখেন। কেউই দেশে নেই। সবাই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতা দিচ্ছে। সরকার শক্ত হাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সামলাচ্ছে। এখন তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার হবে। ইন্ডিয়া বসে কেউ যদি এমন খবর পায়, তাহলে তারা বুড়ো আঙুল দেখাবে।

আকমল হোসেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল কাসেমের বিবৃতি ডায়েরিতে তুলে রাখেন—৫৪ সাল থেকেই আওয়ামী লীগ অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। মার্চ থেকে এই সমাজবিরোধীরা চূড়ান্ত আঘাত হানে। সম্মিলিতভাবে এসব দুষ্কৃতিকারীকে প্রতিহত করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ডায়েরির পাতা বন্ধ করলেন তিনি।

খুললেন আরেকটি পত্রিকা। পড়লেন খবর—নিয়াজি রংপুর ও বগুড়া সফরে গিয়েছে। রংপুরের শান্তি কমিটি, রাজাকার ও সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় বলেন, আবার তিনি ডায়েরির পাতা উল্টালেন, লিখলেন নিয়াজির বক্তৃতার অংশ-ভারত কোনো দিনই পাকিস্তানের বন্ধু নয়। বাঙালির প্রতি লোক দেখানো সহানুভূতির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অঞ্চল কুক্ষিগত করা। তাই তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সমাজবিরোধীদের সাহায্য করছে। কিন্তু আমাদের বীর সেনাবাহিনী এই অপপ্রয়াসকে কোনো দিন সফল হতে দেবে না।

চোখ গেল আরেকটি খবরের ওপর। ৮৮ নম্বর সামরিক আদেশ জারি হয়েছে। এই আদেশবলে আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক এক বা একাধিক ফৌজদারি আদালত গঠনের ক্ষমতা লাভ করে।

আকমল হোসেন সব কাগজ ভাঁজ করে সরিয়ে রাখলেন। ভাবেন, পাকিস্তানের তেইশ বছরে এ দেশের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের নানা নিপীড়ন সহ্য করেছে। এসব দমন-পীড়নে মানুষের আর কিছু যায় আসে না। মানুষ এখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে। পেছন ফিরে তাকাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের বিচার করবে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে স্বাধীন দেশেও তোমাদের বিচার হবে। তৈরি হও।

আকমল হোসেন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন।

কয়দিন পরই প্রতিটি বাড়ি থেকে তৈরি করা পতাকাগুলো চলে যায় ধানমন্ডি ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে। সেখানে বসে পরিকল্পনা করা হয়। ঢাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে পতাকা ওড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। চুনু ধোলাইখাল এলাকা থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আসে ধানমন্ডির বাড়িতে। কারও চোখে ঘুম নেই। সবাই ব্যস্ত থাকে বেলুনে গ্যাস ভরার জন্য। রাত কেটে যায় নানা গল্পে। একজন একটা বলে তো আরেকজন আরেকটা। রাত ওদের কাছে রাত মনে হয় না। দিনরাত সমান।

হেলাল চুটকি কেটে বলে, কাল ওরা উদ্যাপন করবে আজাদি দিবস।

আর আমরা করব আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দিবস। আমাদের লাল-সবুজ পতাকা ঢাকার আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বলব, দেখো আমাদের। আমরা তোমাদের মাথার ওপর উড়ছি। বাতাসের বেগে ছুটছি। আমাদের পথ আটকাবে কে?

হা হা করে হাসে সবাই।

ওরা আমাদের কাজ দেখেও দেখতে পায় না রে।

ওদের কি দেখার চোখ আছে নাকি? ওরা তো অন্ধ। যেটুকু দেখে ওটুকু ওদের ক্ষমতার জমিন। বাকিটা সাফা। অন্ধের না দেখা।

রাজাকারগুলোও এমন হয়েছে। সব জাউরা। পা চাটাই শিখেছে। স্বাধীনতার মূল্য বোঝেনি।

চীন আর আমেরিকার মতো বড় দেশ দুটোও যা করছে, তাতে মনে হয়, ওরা কখনো স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়নি।

ওরা তো ঘরে বসে পেয়েছে। ভাবখানা এমন।

কাজ করতে করতে ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, বিগ পাওয়ার। বিগ পাওয়ার হলে মাথাটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। এটা যে ওরা কোথায় থেকে শিখল কে জানে! আমরা বিগ পাওয়ার হলে আমাদের এমন ভীমরতি হবে না।

ঠিক বলেছিস। হা হা হাসিতে অন্ধকার তাড়ায় ওরা।

শেষ রাতে ওদের ঘুম পায়। পরদিন সারা দিনের অপেক্ষা। চৌদ্দ তারিখে রাতের আকাশে উড়ে যায় বাংলাদেশের পতাকা। গ্যাস বেলুনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া পতাকায় চাঁদের আলো ছড়ায়।

আকমল হোসেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছাদে ওঠেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘন হলে তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে পতাকা নিয়ে উড়ে যায় পাঁচটি গ্যাস বেলুন। মেরিনা হাততালি দিতে চেয়েছিল। আয়শা খাতুন ওর হাত চেপে ধরে বলেন, এখন উচ্ছ্বাসের সময় না। উচ্ছ্বাসের দিন সামনে।

মেরিনা নিজেকে সামলায়। ভাবে, এত পতাকা সেলাই করে মরে গেলে ও কি শহীদ হবে? শহীদের সংজ্ঞা কী? মেরিনার ভাবনায় শব্দটি তোলপাড় করে। এই মুহূর্তে মাকে এই সব কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। বাবাকেও না। আকাশে উড়ে যাওয়া পতাকার দিকে

তাকিয়ে ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। গতকাল নুসরাত বলেছে, নওশীন খুবই বাড়াবাড়ি করছে। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। তাই আমরা চলে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে কবে আবার দেখা হবে, জানি না। জয় বাংলা, মেরিনা।

জয় বাংলা।

মেরিনা টেলিফোনে চেঁচিয়ে জয় বাংলা বলেছিল। এখন খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারছে না। বাড়িটা নিয়ে চিন্তিত সবাই। এই মুহূর্তে কেউ কোনো কথা বলছে না। মন্টুর মা একটি পাটি এনে বিছিয়ে দিয়েছে। সবাই বসে আছে। নিচে বাড়ির সব বাতি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ঘরেও তালা, গেটেও। কেউ এসে খোঁজ করলে বুঝবে বাড়িতে কেউ নেই। আর মুক্তিযোদ্ধারা খুঁজতে এলে ভাববে দুর্গবাড়ি। পরিবারের সবাই আজ ছাদে। আকাশে পতাকা-বেলুন ওড়াচ্ছে। ওরা কেউ এলে অপেক্ষা করবে। নইলে ঘুরেফিরে আবার আসবে। বলবে, জয় বাংলা মামণি, মিষ্টি খাব। আজ উৎসবের দিন।

পরদিন লালবাগের শান্তি কমিটির নেতা ওবায়দুল্লাহর পিছু নেয় ক্র্যাক প্লাটুনের দুজন। সোহেল আর শিহাব। দুজনই মোটরসাইকেলের আরোহী। ওবায়দুল্লাহও মোটরসাইকেলে যাচ্ছে। বকশীবাজারের কাছে রিভলবারের গুলিতে বিদ্ধ করা হয় তাকে। মোটরসাইকেল সামলাতে না পারলে সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ে রাস্তার পাশের একটি বাড়ির দেয়ালের ওপর। ওরা দুজন মোটরসাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই ওরা চলে যায় নিরাপদ দূরত্বে।

সেই সন্ধ্যায় ফার্মগেট এলাকার দুর্গবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একজন। যাবে বনানী। একসময়কার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়ি সেখানে। ক্ষমতার সুতা ধরে বনানীতে বড় একটি বাড়ির মালিক হয়েছিলেন তিনি। প্লটটা অনেক বড়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের দখলে নেওয়া। শাসনকালের পুরো সময় নিজের দেশের মানুষকে পীড়িত করেছেন অনবরত। আর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পা চেটেছেন প্রভুদের। লজ্জা-শরমের ধার ধারেননি লোকটি। মানুষ কী করে এমন নির্লজ্জভাবে

নিজের স্বার্থ পূরণের জায়গাটি ভরাতে পারে? লোকটি আত্মসম্মান শব্দের মানেই জানেন না।

দুর্গবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একজন বনানীর বাড়ির ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে দাঁড়ায়। পেছনের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকেছে মুক্তিযোদ্ধা। দরজার দিকেই মুখ করে বসে আছেন মোনায়েম খান। চারপাশে বেশ কয়েকজন লোক। চামচা গোছের হবে। যারা তার কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পেট ফুলিয়েছে। এখন স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করছে।

লুঙ্গি এবং হাওয়াই শার্ট পরা গেরিলা স্টেনগান তাক করে ফায়ার করে। গুলি তার তলপেট ভেদ করে সোফা ভেদ করে দেয়ালে গিয়ে লাগে। অন্যদের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে বেরিয়ে যায় একজন গেরিলা। মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। প্রধান সড়কে তখনো গাড়ি ও মানুষ। ফুটপাত ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষের ভিড়ে মিলেমিশে এক হয়ে গেলে একজন পথচারী জিজ্ঞেস করে, একটুক্ষণ আগে গুলির শব্দ পেলাম। কারা হতে পারে? কোথায় হতে পারে?

আমি কী করে জানব! আমি তো আর কাউকে দেখিনি।

আপনি গুলির শব্দ পাননি?

পেয়েছি। আপনারা সবাই পেলে আমি পাব না কেন?

কিছু ভাবেননি? কারা এটা করতে পারে?

ভাবব কী, পালাতে পারলে বাঁচি। মুক্তিযোদ্ধাদের দাপট যে কত বেড়েছে, তা কি আর বলে শেষ করা যায়। ছোটখাটো গুলির শব্দ ওদের কাছ থেকেই আসবে। আর্মি হলে তো চারদিক ফাটাবে।

ওরা আছে বলে তো ধড়ে প্রাণ ফিরে পাই। নইলে আর্মি আর রাজাকারদের অত্যাচারে দেশটা ছারখার হয়ে যেত। ওরা আছে বলেই তো স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাই না। স্বাধীনতার অপেক্ষায় থাকি।

ঠিক বলেছেন। আমিও আপনার মতোই ভাবি।

গেরিলাযোদ্ধা পথচারীর সঙ্গে হাত মেলায়।

তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে মিশে যায় অন্ধকারে। রাস্তার মিটমিটে বাতি সে শরীর স্পর্শ করে না। যেন মানুষটাকে আড়ালে রাখতে চায়। ফুটপাতে হেঁটে যাওয়া লোকজনের পাশ কাটিয়ে এগোতে এগোতে যোদ্ধা ভাবে, দুর্গবাড়িতে অন্যরা অপেক্ষা করে আছে খবরের জন্য। ওদের কেউ উঠোনে পায়চারি করছে। কেউ হয়তো রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। উৎকন্ঠিত অপেক্ষা এখন। যোদ্ধা একটি রিকশা নিয়ে মহাখালী পার হয়ে ফার্মগেটের রাস্তায় ওঠে। ইচ্ছে হয় গলা ছেড়ে গান গাইতে। সেটা আর হয়ে ওঠে না। তার পরও দেশের জন্য একটি সাফল্য ওর জীবনের সবটুকু ছাপিয়ে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। অল্পক্ষণে ও পৌঁছে যায় ফার্মগেটের দুর্গবাড়িতে।

আকমল হোসেন নিজের টেবিলে বসে পত্রিকার পাতা উল্টান। প্রথম খবর পড়েন, আজাদি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সভাটি হয়েছে। সভাপতিত্ব করেছেন পিডিপির নেতা নুরুল আমিন। জামায়াত নেতা গোলাম আযম আজাদির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, কখনো দেশ তার নিজের দেশের মানুষ দ্বারা শাসিত হলেই আজাদ হবে, আজাদির এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

আগা সাদেক লেনে আবদুল মালেক গেটের উদ্বোধন করেন মতিউর রহমান নিজামী। খুলনার খালিশপুরের সভায় বক্তৃতা করেন সবুর খান। রাজশাহীতে আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম এ বারী—আজাদি দিবসের খবরাখবর নোট করে ডায়েরির পাতা বন্ধ করেন আকমল হোসেন।

তখন ফোন আসে ক্র্যাক প্লাটুনের হাসানের কাছ থেকে। উচ্ছ্বসিত কন্ঠস্বরে বলে, আঙ্কেল, আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে।

লাইন কেটে যায়।

আজ ওরা আইয়ুব গেটের কাছে একটি আর্মি কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। মোহাম্মদপুর থেকে ওরা গাড়ি নিয়ে বের হয়। দেখতে পায়, মিরপুরের দিক থেকে আর্মি কনভয় আসছে। আইয়ুব গেটের কাছে পেট্রল পাম্পে ওরা পেট্রল নেওয়ার জন্য ঢোকে। পুরোটাই ছিল ছল করে ঢোকা এবং সময় কাটানো। গাড়ি থেকে নেমে জুয়েল রাস্তায় কয়েকটি মাইন পেতে দিয়ে আসে। কনভয়ের প্রথম দুটি গাড়ি মাইন চাপা না দিয়ে বেরিয়ে যায়। তৃতীয় গাড়ির চাকা মাইন চাপা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গাড়ির চাকা বা হয়।

চারদিকে হইচই দৌড়াদৌড়ির মাঝে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওদের লক্ষ্য, সুযোগ বুঝে আরও দু-চার জায়গায় অপারেশন চালানো। এভাবে ওরা শহরকে সন্ত্রস্ত রাখছে। পাকিস্তানিরা বলে, মুকুত। কেউ ধরা পড়লে চেঁচিয়ে বলে, মুকুত মিল গিয়া। মুকুতের ভয়ে পাকিস্তানি আর্মি যেন তটস্থ থাকে—এই ইচ্ছা নিয়ে ওরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো আক্রমণ চালাচ্ছে।

পরদিন ফোন আসে। ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন আকমল হোসেন।

আঙ্কেল, আমরা বের হচ্ছি। দোয়া করবেন।

ওরা পাঁচজন বের হয়। লক্ষ্য দাউদ পেট্রলিয়াম লিমিটেডের পেট্রল পাম্প। টয়েনবি সার্কুলার রোড। বঙ্গভবনের পাশেই পেট্রল পাম্পটি।

ওরা কালো মুখোশ পরে ছিল। বের করে রাখা চোখজোড়া জ্বলছিল জ্বলজ্বল করে। ওরা একটি ফোক্স ওয়াগনে করে এসেছে। নেমেই ঝটপট ঘিরে ফেলে পাম্প অফিস। অফিসের পাহারায় থাকে একজন। কালো মুখোশ পরা গেরিলাদের দেখে পাম্পের

অবাঙালি কর্মচারী দুজন ভয়ে চিৎকার করে উঠে বলে, ফ্যান্টোমাস আ গিয়া। ছুটে পালিয়ে যায় ওরা।

নীলু হাসতে হাসতে বলে, দেখো দেখো, এই ব্যাটারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে।

আরেকজন বলে, চুনোপুঁটিদের কথা ছাড়।

ওরা তিনজন স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরক চার্জ বসায় মারুফ। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বসে আছে সামাদ। কাজ শেষে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দাউদাউ জ্বলে ওঠে পেট্রল পাম্প।

গাড়ি ছুটে যায় হাটখোলার দিকে।

ওরা জানে, আরেকদল গেরিলা পীরজঙ্গী মাজার পাওয়ার স্টেশন অপারেশনে যাবে। কমলাপুর রেলস্টেশনের উল্টো দিকে পাওয়ার স্টেশনটি। ওয়াপদার তৈরি। এই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা, মতিঝিল আবাসিক কলোনি, শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি এবং কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে।

আকমল হোসেন ঘড়ি দেখেন এবং নিজের আঁকা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে থাকেন। লাল কালি দিয়ে রাস্তা আঁকা আছে। গাড়ি যাচ্ছে এমন করে ছবি এঁকেছেন, যেন তিনি বুঝতে পারেন গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে ছুটছে। তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। ভাবেন, মনোযোগ ছুটে যেতে দেওয়া যাবে না।

পাশে বসে আছে আয়শা ও মেরিনা। তারাও খুব উদ্বিগ্ন। এমন পরিস্থিতিতে আয়শা সব সময় আঙুল মটকান। আর মেরিনা দাঁতে নখ কাটে। আকমল হোসেন নিজে একদম নিশ্চুপ হয়ে যান, যেন তাঁর সামনে কথা বলার মতো পরিস্থিতি থাকে না। মনে করেন, গুটিয়ে থাকাই এ সময়ের কথা। নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটে। ঘরে দিনের আলোর আলো-আঁধারি। জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা টানা। দুপাশের দরজা মুখে মুখে লাগানো। ড্রয়িংরুমের দেয়ালে ছোটোছুটি করে একটা টিকটিকি।

পাওয়ার স্টেশন অপারেশনের জন্য দশ পাউন্ড পিকে দিয়ে তৈরি করা হয় দুটো ইমপ্রোভাইজড গ্রেনেড। সঙ্গে দেওয়া হয় দুটো নন-ইলেকট্রিক ডেটোনেটর-২৭ এবং প্রতিটিতে দেড় মিনিটের ফিউজওয়্যার। সঙ্গে আছে স্টেনগান ও গ্রেনেড-৩৬।

আকমল হোসেন ওদের পরিকল্পনার কথা জানেন। ওরা লুঙ্গি আর শার্ট পরে যাবে। পাওয়ার স্টেশনের পাহারায় থাকা দুজন পুলিশকে হ্যান্ডস আপ করাবে নজরুল ও মীজান। অসীম জুডো জানে। ও কায়দা করে প্রহরীদের ফেলে দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলবে। তারপর ইমপ্রোভাইজড গ্রেনেড ফিট করে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাকশন শুরু হয়।

পুলিশদের পাশ কাটিয়ে স্টেনগান হাতে ভেতরে ঢুকে পড়ে নজরুল ও মীজান।

ধমক দিয়ে বলে, হ্যান্ডস আপ।

গোঁ গোঁ করতে থাকে দুজনে। নিজেদের রাইফেল নামিয়ে রেখে হাত তুলে দাঁড়ায়।

চুপ, শালারা। শব্দ করবি না।

ওরা আতঙ্কে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। অসীম কারাতের আঘাতে কাত করে ফেলেছে প্রহরীদের। জসীম আর শিবলি ইমপ্রোভাইজড গ্রেনেড ফিট করে ফেলেছে।

মাত্র কয়েক মিনিট।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত হয় একজন প্রহরী।

ওরা ততক্ষণে হাওয়া।

ফেরার পথ করে নেয় শাজাহানপুরের ভেতর দিয়ে। আকস্মিকভাবে লোকোশেডের কাছে স্থাপিত রাজাকারদের চেকপোস্টের সামনে পড়ে যায়। রাজাকাররা ওদের চ্যালেঞ্জ করে।

কোথা থেকে আসছ তোমরা? দাঁড়াও। দেখে তো এলাকার ছেলে মনে হয় না।

আমরা যেখান থেকে আসি না কেন, তোমাদের কী?

আবার বড় গলায় কথা বলা হচ্ছে। আমাদের পাড়ায় ঢুকেছ কেন? ঠিক করে বলো?

ওরে আমার কে রে। এদের কাছে আবার কৈফিয়ত দিতে হবে। যত্তসব।

আমরা তোমাদের সার্চ করব।

করেই দেখো। তোমাদেরও আমরা সার্চ করব।

কী, এত বড় কথা! ব্যাগে কী আছে, দেখা।

রাজাকাররা নজমুলকে জাপটে ধরলে শিবলি ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নেয়। নজরুল ইচ্ছে করে জোর খাঁটিয়ে জাপটাজাপটি করার ফাঁকে শিবলি ব্যাগ থেকে গ্রেনেড বের করে ছুড়ে মারে। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলে রাজাকাররা হকচকিত বিমূঢ় হয়ে যায়। এই ফাঁকে ওরা নিজেদের মুক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেনগান বের করে গুলি করে। লুটিয়ে পড়ে দুজন রাজাকার। নিহত হয় কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রিকশাওয়ালা।

ওরা আর একমুহূর্ত দাঁড়ায় না।

যে যে দিকে পারে সুযোগ বুঝে নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। ওদের আর একসঙ্গে থাকা হয় না।

কয়েক ঘন্টা পর তরিকুল আলমের বাড়িতে ফোন করে আকমল হোসেন জানতে পারেন যে অপারেশন সাকসেসফুল এবং ওরা নিরাপদে নিজ নিজ হাইডে চলে যেতে পেরেছে।

তিন দিন পর বাড়িতে আসে মারুফ।

আগস্টের এক বিকেল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ঝট গায়ে মাখে মেরিনা। আজ বাড়িতে ও একা। আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন জরুরি মিটিংয়ে আরেক দুর্গবাড়িতে গিয়েছেন। এলিফ্যান্ট রোডে। বলেছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন। নুসরাত ঢাকায় না থাকায় মেরিনা একা হয়ে গেছে। এখন এই নিশ্চুপ বাড়িটি ওর কাছে ভুতুড়ে বাড়ি মনে হচ্ছে।

মারুফ ওর দরজায় এসে দাঁড়ালে চমকে ওঠে মেরিনা।

ভাইয়া, তুই। কবে এসেছিস? কী যে খুশি লাগছে। এবার বাড়িতে থাকবি?

তাই ভাবছি। বাবা-মা-বোনের আদর চাই।

অপারেশন নাই?

আছে। পাঁচ দিন থাকতে পারব বাড়িতে।

পাঁচ দিন। অনেক সময়। আমার কাছে এখন প্রতি সেকেন্ড এক দিন হয়ে যায়। উহ্, কী যে খুশি লাগছে!

তোর খুশি দেখে আমিও খুশি। আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। কী করছিস একা একা?

বৃষ্টি দেখছি। তুই কাপড় চেঞ্জ করে নে, ভাইয়া। আমি তোর জন্য চানাশতার ব্যবস্থা করছি। তারপর দুজনে বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখব।

তা-ই সই। আমি আসছি।

মারুফ নিজের ঘরে চলে গেলে মেরিনা বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। জেবুন্নেসার কথা কি আজ ওকে বলবে? বুঝতে পারে না। বাবা-মাকে জিজ্ঞেস না করে বলা ঠিক হবে কি না, সেটাও চিন্তা করতে হবে। জেবুন্নেসার মৃত্যুর আঘাতে ও যদি দমে যায়? যদি মন খারাপ করে বসে থাকে? যদি...মেরিনা আর ভাবতে পারে না।

ও উঠে রান্নাঘরে যায়। চুলোয় চায়ের পানি বসায়। ফ্রিজ থেকে পাটিসাপটা পিঠা বের করে। মারুফ এই পিঠা খুব পছন্দ করে। ওর ভাগ্য, মায়ের হাতে বানানো পিঠা খাবে বলে ও আজ বাড়িতে এসেছে। মেরিনা এটুকু ভেবে খুশি হয়। দুঃখের খবর দেওয়ার আগে ওকে আনন্দ পেতে হবে। কতটা ও সইতে পারবে কে জানে! মেরিনা ট্রে-ভর্তি খাবার নিয়ে বারান্দার ছোট টেবিল গোছায়। চেয়ার আনে। হাসনাহেনা ফুলের ছোট একটি ডাল ভেঙে ছোট ফ্লাওয়ার ভাসে দিয়ে টেবিলে রাখে। ভাবে, আর কী করতে পারবে একজন যোদ্ধা ভাইয়ের জন্য। যার সামনে ও আজই এক দুঃখের কথা বলবে। বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। দুঃখের রূপকথা এখনই বলতে হবে। মেরিনা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে জেবুন্নেসার চিঠিটা ড্রয়ার থেকে বের করে নিজের পড়ার টেবিলে চাপা দিয়ে রাখে।

বারান্দায় এসে ছোট টিপয়ের দিকে তাকিয়ে মারুফ বলে, বাহ্, সুন্দর আয়োজন তো। শান্ত এবং স্নিগ্ধ। একদম মনের মতো। পাটিসাপটা পিঠাও আছে দেখছি।

খাও। তুমি মায়ের ভাগ্যবান ছেলে। কত দিন পর বাড়ি এসে মায়ের বানানো পিঠে পেলে।

তুই কি আমাকে হিংসা করছিস?

মোটেই না। মায়ের ভালোবাসার আবার ভাগাভাগি কী! তুমি তো জানো, মা তোমার জন্য ফ্রিজে নানা খাবার রেডি রাখেন। বলেন, ও কোথায় কী খায় তার তো ঠিক নাই।

বাড়িতে এসে যদি ঠিকমতো কিছু না পায়, তাহলে মন খারাপ করবে। আমাকে কিছু বলবে না, নিজে নিজে দুঃখ পাবে। থাকগে। তোমার কথা বলো। যুদ্ধের কথা।

ঢাকাকে ঘিরে গেরিলা তৎপরতা বেড়েছে। টের পাচ্ছিস না?

আমরা তো টের পাচ্ছি। আব্বা খুবই খুশি।

বলা যায়, পুরো রূপগঞ্জ থানা গেরিলা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা নদীর পাড় ধরে যে মিলগুলো আছে, সেখানে শুরুর দিকে আর্মির বাংকার ছিল। গেরিলা আক্রমণের কারণে তারা বেশ নাজেহাল হয়ে পড়েছে। বাংকার গুটিয়ে পিছু হটেছে। মনে হয়, আস্তে আস্তে কেটে পড়বে। স্থানীয় পাঠশালায়, আমরা যেখানে থাকি, ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা, আমরা তো সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি। এই পতাকাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। এমনকি হেলিকপ্টারে করে কমান্ডাো নামানোর চেষ্টা করেছিল। নামাতে পারেনি। আমরা বুঝে গেছি যে আমরা ওদের মুখোমুখি হওয়ার সমান হয়েছি। আমরা গুল টেক্সটাইল মিলের বাংকার আক্রমণ করেছিলাম। বড় একটি এলাকা নিয়ে যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা সাতাশটি লাশ ফেলে রেখে পিছু হটে যায়। গেরিলারা বড় আকারের প্রতিরোধব্যূহ রচনা করে। আমরা ভাবছি, স্বাধীনতার জন্য আমাদের আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

এটুকু বলে মারুফ থামে।

মেরিনা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলে, কয়টা পিঠা খাব রে?

পিরিচে যা আছে, তার সবগুলো। একটাও বাদ দিতে পারবে না।

হা হা করে হাসে মারুফ।

ছুটে আসে আলতাফ আর মন্টুর মা।

কী হয়েছে? কোনো খুশির খবর আছে?

হ্যাঁ, আছে। যুদ্ধের খুশির খবর আছে বলেই তো হাসতে পারছি।

কী, কী খবর?

দুজনে কাছে এসে দাঁড়ায়।

আমাদের যুদ্ধের দিন ফুরিয়ে আসছে। আর বেশি দিন যুদ্ধ করতে হবে। আমরা জয়ী হবই।

সত্যি?

একদম সত্যি। আপনারা নিজেদের কাছে পতাকা রাখবেন। স্বাধীনতার খবর পেলেই পতাকা ওড়াবেন।

মন্টুর মা মারুফের মুখোমুখি বসে পড়ে। আলতাফ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বলে, ওরা যত হারবে তত হিংস্র হবে। মরণকামড় দিতে পারে। আলতাফ দুপা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলে, দেবেই। ওরা তো খালি হাতে এখানে মরতে আসেনি।

ঠিক বলেছেন, আলতাফ ভাই।

মেরিনাও সায় দিয়ে বলে, একদম ঠিক।

তখন বাইরে থেকে ফিরে আসেন আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন। মারুফকে দেখে দুজনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে যান। আকমল হোসেন ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুই কেমন আছিস, বাবা? আয়শা খাতুন ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তোর শরীরে বারুদের গন্ধ পাচ্ছি, বাবা।

সব অপারেশনে জিতেছি বলে বারুদের গন্ধ আমাদের শরীরের গন্ধ, আম্মা। আমরা সময়কেও গায়ে মেখে রেখেছি।

চল, ঘরে চল।

রাতের খাবারের পরে ড্রয়িংরুমে এলে আকমল হোসেন মেরিনাকে বলেন, মা, মারুফের একটা চিঠি আছে তোমার কাছে। নিয়ে এসো।

মেরিনা উঠে যায়। নিজের ঘরের দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। তারপর পড়ার টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা নিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে আসার সময় শুনতে পায় মারুফের কন্ঠস্বর। নিজের ঘরে যাওয়ার সময়ও একবার মারুফের কন্ঠস্বর শুনেছে। তখন ওর জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ দেয়নি। মেরিনা ড্রয়িংরুমে এলে শুনতে পায় মারুফ আবার একই কথা বলছে।

চিঠি? আমার? কে লিখেছে? আপনারা তো জানেন কে লিখেছে। তাহলে বলছেন না কেন?

আয়শা খাতুন মৃদুস্বরে বলেন, জেবুন্নেসা।

জেবুন্নেসা! মারুফ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। মেরিনার দিকে যাওয়ার জন্য দুপা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায়। কাউকে সরাসরি উদ্দেশ না করেই বলে, ও কেন এ বাড়িতে চিঠি লিখবে? ও কোথায় আছে, জানি না। শুনেছি ওরা বাবামায়ের সঙ্গে গ্রামে কোথাও চলে গেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আকমল হোসেন বলেন, বস, বাবা। আগে চিঠিটা পড়।

আপনাদের সঙ্গে ওর কোথায় দেখা হলো?

আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। পাকিস্তানি সেনারা ওকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের নির্যাতনে ও মারা যায়। তার আগে একটি চিঠি লিখে পুলিশ লাইনের সুইপার রাবেয়াকে দিয়ে বলেছিল এই বাড়িতে পৌঁছে দিতে। মনে হয়, এই বাড়ির ঠিকানা ওর কাছে ছিল। আমরা চিঠিটা যত্ন করে রেখেছি।

মেরিনা চিঠিটা মারুফের হাতে দেয়। চিঠির খামে ও আতর মাখিয়ে রেখেছিল। মারুফ চিঠি খোলার সময় আতরের গন্ধ সবার নাকে লাগে।

চিঠি পড়ে মারুফ প্রবল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। দুহাতে মুখ ঢাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জেবুন্নেসাকে দেখেছি, ভাইয়া। তেমন আলাপ ছিল। এখন মনে হচ্ছে, কেন যে আমার সঙ্গে আলাপ হলো না!

মারুফ শূন্যদৃষ্টিতে মেরিনার দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, ওর ভেতরে বোধ কাজ করছে না। ও মেরিনাকে চিনতে পারছে না। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখে একজন অচেনা মানুষ তার সামনে বসে আছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তাকে কখনো কোথাও দেখেনি ও। ঘরটা রূপগঞ্জের একটা ক্যাম্প-মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। ওখানে দাঁড়িয়ে জেবুন্নেসা ওকে বলছে, একটি মিলিটারি কনভয় উড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি সুইসাইডাল অ্যাটাক করতে চাই। বোমাটা আমার শরীরের কোথায় বাধলে ঠিক হবে?

আমাকে ভাবতে দাও, জেবুন্নেসা। দুজনে মিলে ঠিক করব যে, কীভাবে কী করা যায়। তবে শরীরে বোমা বেঁধে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? আমিও পড়তে পারি।

না, তুমি যুদ্ধ করবে। ফ্রন্টে যাবে। যদি তোমাকে যুদ্ধের শেষ মানুষটি হতে হয়, তুমি তা-ই হবে। আমি কাজ ভাগ করে নিতে চাই। ওহ্, জেবুন্নেসা! ও পাগলের মতো মাথা ঝাঁকায়।

আকমল হোসেন ওর পাশে এসে বসেন। ঘাড়ে হাত রাখেন। মেরিনা একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে এনে বলে, চলো, তোমার ঘরে দিয়ে আসি।

ফ্লাওয়ার ভাস দেখেছিলাম বাইরে। ওটাও দিস।আলো এবং গন্ধ চাই আমি।

আকমল হোসেন ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিলে ও চিৎকার করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে যায়। পেছনে যায় মেরিনা। ফুলের সৌরভ আর আলোর শিখা নিয়ে। গুনগুন ধ্বনি ওঠে আয়শা খাতুনের কন্ঠে। ধ্বনি ছড়াতে থাকে ঘরে–

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে–
কী উৎসবের লগনে...।

মায়ের কন্ঠের ধ্বনি শুনে নিজের ঘরে দাঁড়ায় মারুফ। বুঝতে পারে, ধ্বনি ওকে বেদনার অতলে নিয়ে যাচ্ছে–

সব আলোটি তেমন করে ফেললা আমার মুখের পরে...

তুমি আপনি থাকো আলোর পেছনে...।

মারুফ দুহাতে মুখ মোছে। ভাবে, ওর মতো কত শতজন বুঝতে পারছে যে যুদ্ধ মানে প্রেম এবং মৃত্যু। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জীবনের নতুন পথ তৈরি হয়। প্রেম ও মৃত্যু পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটে। বোঝার সময় থাকে না কীভাবে মৃত্যু প্রেমকে ঢেকে দেয়। প্রেম কীভাবে মৃত্যুকে ভালোবাসাময় করে দেয়। ওহ্, জেবুন্নেসা। ভেসে আসে গুনগুন ধ্বনি–

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয় গগনে–
কী উৎসবের লগনে–
সব আলো তার কেমন করে–
পড়ে তোমার মুখের পরে–
আমি আপনি পড়ি আলোর পিছনে—

মায়ের গুনগুন ধ্বনি তো ও কত দিন শুনেছে, সেই বুঝে ওঠার বয়স থেকে; কিন্তু মায়ের কন্ঠস্বর ওর কাছে আজকের মতো এমন তোলপাড় করা মনে হয়নি, এমন শান্তির স্নিগ্ধতায় ভরপুর মনে হয়নি। জীবনকে বিলিয়ে দেওয়ার মগ্নতায় এমন ঐশ্বরিক মনে হয়নি।

বুকভাঙা কান্নায় মারুফ নিজেকে উজাড় করে দিতে থাকে। কখনো পুরো ঘরে হাঁটতে হাঁটতে, কখনো বালিশে মুখ গুঁজে। কখনো দুহাতে চুলের মুঠি ধরে। কখনো জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, আকাশের কোন তারাটি তুমি হয়েছ, জেবুন্নেসা? কথা ছিল, তুমি-আমি একসঙ্গে যুদ্ধে যাব, কথা ছিল যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে বলব, ফুল ফুটুক না-ফুটুক আজ বসন্ত...

একসময় স্তব্ধ হয়ে যায় মারুফ।

ঘরময় শুধু মৌমাছির গুঞ্জনের মতো মুখরিত হয় গানের ধ্বনি–

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে।
কী উৎসবের লগনে।।

এখন স্বাধীনতার সময়। জেবুন্নেসা, তোমাকে বলি, তুমি জীবন দিয়ে আমার সামনে মৃত্যুর উৎসব সাজিয়েছ। আমরা মৃত্যুর উৎসব পালন করব। তোমাকে বলি জেবুন্নেসা–

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয় গগনে
কী উৎসবের লগনে
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের পরে
আমি আপনি পড়ি আলোর পিছনে।।

মোমবাতিটি হাতে তুলে মারুফ ঘরে ঘুরতে ঘুরতে বলে, তুমি আমার আলোর শিখা, জেবুন্নেসা। শহীদের চেতনায় জ্বলে থাকবে আমৃত্যু।

পুলিশ লাইনের ড্রেনের ধারে

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ড্রেনের ধারে বসে রাবেয়া পরদেশীকে বলে, পাকিস্তানিদের আজাদি দিবসে আকাশে বাংলাদেশের পতাকা দেখেছি। মহল্লার ছেলেমেয়েরা ওই বেলুনটা ধরার জন্য ছোটোছুটি করছিল। বুড়োরা ওদের থামিয়েছে। বলেছে, গুলি খেতে চাস? ওই পতাকার জন্য ছুটতে দেখলে মহল্লার সবাইকে মেরে সাফা করে দেবে। চুপ করে বসে থাক তোরা।

ছেলেমেয়েরা মুখ চুপসে থেমে গিয়েছিল।

বেলুন তো আর কলোনিতে নামেনি। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়েছে, কে জানে।

চুপ কর, রাবেয়া।

পরদেশী ওকে মৃদু ধমক দেয়।

কেন চুপ করব, কেন?

দেয়ালেরও কান আছে, জানিস না!

থাকুক। ইচ্ছা করে চিল্লাই। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পুলিশ লাইনের ব্যারাকে যে আজাব চলছে মেয়েগুলোর ওপর, তা কি সহ্য করা যায়! বলল, সহ্য করি কীভাবে! আমি আমার এক জীবনে শত মরণ দেখতে পাচ্ছি। মরণের এত চেহারা দেখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

থাম, রাবেয়া। থাম বলছি। তুই আমাদেরও মরণ ডেকে আনবি। মেয়েদেরকে মিলিটারির কাছে রেখে আমি মরতে চাই না। আমি ওদের দেখব।

ড্রেনের ভেতরে যে ছুরিটা রাখা হয়েছে, তুই তা বের কর।

কাকে দিবি?

নীলুকে। দুই দিন ধরে আমাকে ছুরির জন্য পাগল করে ফেলছে। বলছে, ছুরি না দিলে ও দোতলা থেকে লাফ দেবে।

ব্যাপার কোথায় দাঁড়াবে, বুঝিস তো?

বুঝি, বুঝি। তুই আমাকে এত শেখাতে আসিস না তো, পরদেশী। তোর শাসনে আমি অতিষ্ঠ। এদেরকে রেখে তুই মরবি না। বলিস পাহারা দিবি। কী ছাতুর পাহারা দিচ্ছিস? এটা কোনো পাহারা হলো?

তুই তো বুঝতে পারছিস যে একজনের জন্য সব মেয়েকে ওরা মারবে।

ওরা তো মরেই আছে। ওদের আবার বাঁচা কী? শহরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ জোরদার হয়েছে। মোনায়েম খানকে মেরে ফেলেছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। পেট্রল পাম্প পুড়িয়েছে। রাজাকার মরেছে কতগুলো।

চুপ কর, রাবেয়া। তোর আজকে কী হয়েছে? তুই এত কথা কেন বলছিস? অন্যদিন তো তুই এত কথা বলিস না।

পরদেশী, তোর কি মনে হয় না মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে? বিজয় কত দূর, ভেবে আমি অস্থির হয়ে যাচ্ছি। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে, সেদিন আমি এই মেয়েদের নিজের হাতে স্নান করিয়ে একটি করে বকুল ফুল দেব। বলব, দেখো, ফুলের

গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। তোমরা জোরে জোরে শ্বাস টানো। পরদেশী, আমরা বিজয়ের পথে যাচ্ছি তো?

যাচ্ছি, যাচ্ছি। আর বেশি দিন সময় লাগবে না। আকাশে পতাকা উড়লে অপেক্ষার সময় বেশি থাকে না।

পরদেশী ড্রেনে নেমে ছোট ছুরিটা তুলে এনে লুঙ্গিতে মুছে কচু পাতায় মুড়িয়ে রাবেয়াকে দেয়। রাবেয়া কচু পাতাসহ ছুরিটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। হাতে কী নিয়ে যাচ্ছে, এটা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তাহলে কী বলবে ও? ঘাবড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে। সময়টা এখন প্রবলভাবে অবিশ্বাসেরও। নানাভাবে বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে। তাই ছুরিটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে ব্যারাকে ঢুকতে হবে। কোনোভাবেই ধরা পড়ে সব মাটি করা চলবে না। রাবেয়া ড্রেনের ধার থেকে উঠে পড়ে। নিজের কাপড় ঝেড়েঝুড়ে ঘাসের কুচি ছাড়িয়ে নেয়। ব্যারাকের দিকে পা বাড়ানোর আগে মাটিতে হাত ছুঁইয়ে কপালে ঠেকায়।

দুপুরের খাবার আসে ব্যারাকে।

মেয়েরা বারান্দায় লাইন করে বসেছে। ওরা ক্ষুধার্ত। বালতি ভরা ডাল। গরুর মাংস আর আলুর তরকারি। ওরা হাপুস-হুপুস খায়। শুধু খেতে পারে না নীলুফার। এক গ্রাস মুখে দিলে গিলতে ওর সময় লাগে।

রাবেয়া একটু দূরে বসে ছিল। ওর নজর ছিল নীলুফারের ওপর। যতক্ষণ ক্যানটিনের সেপাইরা খাবার দিচ্ছিল, ততক্ষণ রাবেয়া দূরে ছিল। ও কাছাকাছি আসুক, সেটা ওরা চায় না।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাবেয়া নীলুফারের মুখোমুখি এসে বসে।

খাচ্ছ না যে? দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছ। আজ তো গরুর মাংসের তরকারি দিয়েছে। শুধু ডাল না। খাও।

খেতে পারছি না। খেতে ভালো লাগছে না।

না খেলে শরীর ভালো থাকবে?

শরীর? কার জন্য? ওই লুচ্চাদের জন্য?

লুচ্চাদের জন্য না, নিজের জন্য।

বাঁচার সাধ নাই। শরীর এখন বোঝ। বোঝা টানতে চাই না।

নীলু, দেখো। তুমি যা চেয়েছিলে তা আছে। বেশি বড় না, তবে কাজ হবে। খুব ধার আছে। পরদেশী এনেছে।

রাবেয়া ব্লাউজের ভেতরে ছুরি রাখার ইঙ্গিত করে। নীলুফার বুঝে যায়।

তোমার কাছে রাখো। নেব। তুমি ভাত খাবে?

মাথা খারাপ। আমাকে খেতে দেখলে মারবে। তুমি তো জানো সব।

তে দেখলে মারইয়া তুমি আমারটা খাও। এই প্লেটে যা আছে তা। আমি আমার ভাগ তোমাকে দিচ্ছি।

না, না, তুমি আমাকে খেতে বলো না।

একপাশ থেকে এইটুকু খেয়েছি। এঁটো হয়নি।

না গো, খেতে বলল না। খিদায় জীবন গেলেও খেতে পারব না। চাবুক দিয়ে মারবে। তুমি কি চাও যে আমার পিঠ কেটে রক্ত পড়ুক?

নীলুফার আর কথা বলে না। উঠে হাত ধুয়ে নেয়। বারান্দার কোনায় দাঁড়িয়ে রাবেয়ার কাছ থেকে ছুরিটা নেয়। কলা পাতাটায় ভালো করে প্যাঁচিয়ে নিজের কোমরের কাছে পায়জামার সঙ্গে গুঁজে রাখে। রাবেয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমাকে ওই সাদা ফুলটা এনে দেবে, রাবেয়া খালা, এমন সুন্দর ফুল আমি কোনো দিন দেখিনি। কী ফুল ওটা?

রাবেয়া ভালো করে তাকিয়ে দেখে, ব্যারাকের দেয়ালের পাশে যে ফুলটি ফুটেছে, ওটা একটা চালতাগাছ। সাদা বড় পাপড়ি-মাঝে হলুদ রঙের খানিকটাতার ওপরে সাদা ছোট্ট ফুল, ওর মাঝে আবার একটু হলুদ রং-রাবেয়া তাকিয়ে থাকে। এর বেশি বর্ণনাও করতে পারে না। প্রতিবছর বর্ষায় এই ফুল ফোটে। আষাঢ় শেষ হলে শ্রাবণের শুরুতে বৃষ্টিতে ভিজে ফুলের পাপড়ি মেলে ওঠে। কারুকাজ করা পাতার মধ্যে এমন সাদা ফুল দেখা খুব ভাগ্যের মনে হয় রাবেয়ার।

মাঝেমধ্যে ও নিজেও এই ফুলটা দেখে। এত সুন্দর! হঠাৎ ওর বুক ধড়ফড় করে ওঠে। এই মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে মেয়েটির চোখ গেছে ফুলটির দিকে। আশ্চর্য! একটি ছুরি নিজের কোমরে গুঁজে রেখে ফুলের নাম জানতে চায় কেন মেয়েটি? মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরার খুব সাধ হয় ওর। কিন্তু ধরতে পারে না। সাহস হয় না। যে মেয়ে মৃত্যু সামনে রেখে ফুল খোঁজে, তাকে স্পর্শ করার সাধ্য হয় না রাবেয়ার। ও নিজের ভেতর অভিভূত হয়ে থাকে।

কী ভাবছ, খালা? ফুলের নামটা তো বললে না?

ওটা তো চালতা ফুল।

চালতা ফুল? আমি নুন-মরিচ মাখিয়ে চালতা খেয়েছি। কিন্তু ফুল দেখিনি। ও মা গো, এত সুন্দর ফুল! আমার জন্য একটা ফুল ছিঁড়ে আনো, খালা।

কী করবে?

ওটা একটা শান্তির ফুল।

কী করবে?

মরণের আগে খোপায় খুঁজে রাখব। এই মরণের খাঁচায় কালই আমার শেষ দিন।

রাবেয়া দুহাতে মুখ ঢাকে।

নীলুফার ওর হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, কেঁদো না। এটা আমার গৌরবের মৃত্যু। এই মৃত্যুর কথা ছড়িয়ে দিয়ে চারদিকে।

পুলিশরা উঠে আসে বারান্দায়। রাবেয়া দ্রুত পায়ে অন্যদিকে সরে যায়। ও জানে, এখন থালাবাসন গোছানো হবে। তারপর মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা দেওয়া হবে।

পরদিন কিছু ঘটাতে পারে না নীলুফার।

তার পরদিনও না।

তৃতীয় দিনে একজন নগ্ন ধর্ষকের পেটে ঢুকে যায় নীলুফারের ছুরি। ওর চিকার যখন ঘরের চারদেয়ালে আছড়াতে থাকে, তখন নীলুফার হাসতে হাসতে বলে, এটা আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। তোমাদের একটাকে না মেরে আমি এই আজাবখানা থেকে বের হব কেন, কুত্তার বাচ্চারা!

ও হাত বাড়িয়ে অপরূপ শান্তির ফুলে হাত রাখে।

গত বিকেলে বাড়ি যাওয়ার আগে একটি ফুল ওকে দিয়ে গেছে রাবেয়া। ও ধীরেসুস্থে ওর নিজের কাপড় পরে। দেখতে থাকে লোকটির মৃত্যু। প্রবল রক্তস্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ওর নাড়িভুঁড়ি।

খবর ছড়িয়ে যায় পুলিশ লাইনের চারদিকে। ছুটে আসে অফিসার এবং পুলিশ। শত শত সেপাই জড়ো হয় ব্যারাকের সামনে। প্রত্যেকে বিস্মিত, হতভম্ব। এত সাহস মেয়েটির! কোথায় থেকে এত সাহস পেল? ছুরি কোথায় পেল? সবার চোখে ধুলা দিয়ে কোনো মুক্তিযোদ্ধা কি ব্যারাকে ঢুকেছিল? কীভাবে ঢুকল? চারদিকে এত পাহারার মধ্যে ঢোকা তো সম্ভব না, তাহলে কেউ কি সাহায্য করেছে? যদি করে থাকে, তাহলে সে কে?

বারান্দায় পাঁচজনের বুটের নিচে চিত হয়ে পড়ে আছে নীলুফার। ওরা তখনো বুট দিয়ে পিষ্ট করেনি ওকে। ওর কাছ থেকে জানতে হবে, কে ওকে সহযোগিতা করেছে। ও ছুরি কোথায় পেল?

একটু আগে মৃত অফিসারের লাশ সরানো হয়েছে। স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গেছে তাকে। বারান্দায় পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। সে রক্ত উত্তেজিত সেনাদের বুটের নিচে গড়াচ্ছে। বারান্দায় লেপ্টে যাচ্ছে। সেই রক্তমাখা বুট এখন নীলুফার শরীরের ওপর। ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ও নিজেও চেষ্টা করছে প্রতিটি নিঃশ্বাস না ফেলার জন্য। ওর ডান হাত শুধু চুলে গুঁজে রাখা সাদা ফুলটির ওপর রাখা আছে। ওকে বুট দিয়ে পিষ্ট করলে ওর হাত ওখান থেকে ছিটকে পড়বে। ওকে ওরা উর্দুতে প্রথমে প্রশ্ন করে। ও কোনো উত্তর দেয় না। পরে একজন বাঙালিকে লাগানো হয়।

লোকটি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে, বল, ছুরি কোথায় পেয়েছিস?

একজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়েছে।

নাম কী?

জানি না।

বল, নাম কী?

বাইরে থেকে মুক্তিযোদ্ধা ঢুকতে পারবে না। তাহলে ভেতরের কেউ।

বুট চেপে বসে শরীরের ওপর। তখন সাদা ফুলের ওপর নীলুফারের হাত। ও ফুলটিকে অক্ষত রাখতে চায়। শান্তির-স্বাধীনতার এই ফুল যেন ওরা থেতলাতে না পারে।

নীলুফারের মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ ধ্বনি বের হয়।

কথা বলবি না? এত তেজ কিসের?

পাঁচ-পাঁচটি বুট ওর শরীর চেপে ধরলে ও ঘাড় কাত করে। দম বেরিয়ে যায়। চুলের পাশে আশ্চর্য সজীব হয়ে থাকে চমৎকার সাদা-হলুদ রঙের চালতা ফুল।

ড্রেনের পাশে বসে থাকে সুইপাররা। আজ ওরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। সবার আতঙ্ক রাবেয়াকে নিয়ে। ও মেয়েগুলোর দেখাশোনা করেছে। দায়টা ওর ওপর বেশি আসবে। নির্দেশ হয়েছে, কেউ যেন পুলিশ লাইনের বাইরে না যায়। গেলে, চাবুক দিয়ে পিটিয়ে জর্জরিত করা হবে।

সেনারা যত বলছে, তার চেয়ে বেশি বলছে বাঙালিগুলো। বলছে, কার গায়ে হাত দিয়েছিস, বুঝবি। স্বাধীনতার সাধ মিটিয়ে দেব।

রাবেয়া চুপচাপ থাকে। পরদেশী ওকে এক খিলি পান দিয়েছিল, সেটা চিবোয়। মেয়েদের চিৎকার ভেসে আসছে। ওর বুক ধড়ফড় করে। একটু পরে দেখতে পায়, মেয়েগুলোকে মারতে মারতে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। ব্যারাক খালি করে ফেলছে ওরা। রাবেয়া বুঝে যায় যে ওদেরকে কোথাও নামিয়ে দেবে। লাথি দিয়ে নামাবে। তারপর নতুন মেয়েদের নিয়ে ভর্তি করবে ব্যারাক। ও দুহাত পেছনে দিয়ে ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নীরব হয়ে যায় এলাকা। থমথম করে চারদিক। সুইপার কয়েকজন ড্রেনের পাশে বসে থাকে। রাবেয়া খাতুন পা মেলে দেয়, আবার পা গোটায়। পরদেশীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার একটা কাজ করা হলো না। আর করা হবে বলে মনে হয় না।

কী কাজ? কোনো কাজই আর করা যাবে না। আমাদেরকেও হয়তো বের করে দেওয়া হবে। চাকরি খতম। তার পরও বল, কী কাজ করতে চেয়েছিলি?

ঝরনাকে কথা দিয়েছিলাম যে সুইপারের কাপড় পরিয়ে ব্যারাক থেকে বের করে দেব। হলো না।

পরদেশী সঙ্গে সঙ্গে বলে, এই জন্য তুই আমার বউয়ের পুরান শাড়ি চেয়েছিলি?

তুই বলেছিলি, দিবি। তোর কাছে ওর দুটো শাড়ি আছে, তার একটা দিবি।

আমি তো কাগজে মুড়ে রেডি করে রেখেছিলাম। আনার সময় তো পেলাম।

তোরা চুপ কর। ওই দেখ, পাঁচজন পুলিশ আমাদের দিকে আসছে। এবার বোধ হয় আমাদের পালা।

রাবেয়া সোজা হয়ে বসে বলে, কী আর করবে। কচু করবে। যা করবে করুক। তোরা কিন্তু ওদের হাতে-পায়ে ধরবি না।

কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু সামনে তাকিয়ে থাকে। যমদূতের মতো এগিয়ে আসার দৃশ্য দেখে।

ওরা পাঁচজন এসে সামনে দাঁড়ায়। সরাসরি রাবেয়ার দিকে তাকায়।

তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। আমাদের সঙ্গে আয়। সাহস দেখিয়েছিস। এখন ঠেলা বুঝবি।

যাচ্ছি। আমাকে ভয় দেখানোর দরকার নেই।

রাবেয়া সামনে এগিয়ে যায়। একটু জোরেই যায়। দেখাতে চায় যে তোদেরকে ডরাই না। ওর ভেতরে এখন আর মৃত্যুভয় কাজ করছে না। ভয় করবে কেন? এর জন্য তো ওর প্রস্তুতি ছিল। ও শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচায়। ওর কাঁচা-পাকা চুল বাতাস এলোমেলো করলে ও দুহাতে খোঁপা বাঁধে।

পেছন থেকে একজনে ছোট লাঠি দিয়ে গুঁতো দেয়। ও ফিরে রুখে দাঁড়ায়। চোখ জ্বলে ওঠে। নিজেকে বোঝায় যে মৃত্যু সামনে থাকলে সাহসী হতে হয়।

মারছ কেন? যেতে বলেছ, যাচ্ছি। দোষ করলাম কী?

গেলে টের পাবি, হারামজাদি। বেশ্যার হাতে ছুরি দিয়েছিস তুই। তুই ছাড়া আর কে দেবে?

কেউ একজন পাছায় লাথি দিলে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। পরদেশী ছুটে এসে রাবেয়াকে টেনে তোলে।

সুইপার এবং ডোমরা এতক্ষণ ওদের পিছে পিছে আসছিল। রাবেয়াকে সামনে রেখে ছোটখাটো একটা মিছিল যেন। পুলিশের হাঁকে বন্দীদের মিছিল।

পরদেশী মৃদুস্বরে বলে, ব্যথা পেয়েছিস, জানি। উঠে দাঁড়া। আমাকে ধর।

রাবেয়া উপুড় হয়ে পড়েছিল। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। ঠোঁট কেটে গেছে। হাঁটু ইটের ওপর পড়ে টনটন করছে। চামড়া উঠেছে।

পরদেশী আস্তে করে আবার বলে, ওঠ।

পারছি না। পা টনটন করছে। হাঁটু বুঝি ভেঙেই গেছে।

উঠে দাঁড়া, নইলে আবার লাথি দেব।

পরদেশী টেনে তুললে রাবেয়া উঠে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ও পরদেশীর হাত চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

রাবেয়াকে অফিসে এনে প্রথমে চাবুক দিয়ে মারা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, মেয়েটিকে ছুরি দিয়েছে কে?

রাবেয়ার মুখে কথা নেই।

বল, কথা বল। কেন ওকে ছুরি দিয়েছিস?

রাবেয়া কথা বলে না।

ওর শরীরের ওপর পাঁচটি বুট উঠে আসে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য সুইপাররা। ওরা সবাই জানে, রাবেয়া কথা বলবে না। রাবেয়া মরে যাবে, তা-ও কথা বলবে না।

একসময় অফিসার হুকুম দেয় ওকে গাছে ঝুলিয়ে রাখার। বলে, ও ঝুলে থেকে মরবে। ওকে উলঙ্গ করে ঝুলিয়ে দাও। পা বেঁধে ঝোলাবে, ওর মাথা নিচের দিকে থাকবে। কাক এসে ওকে ঠোকর দেবে। শকুন এসে ওর মাংস খুবলে তুলবে। ওকে মারার জন্য গুলি খরচ করা হবে না। ওর শাস্তি ঝুলে থেকে একটু একটু করে মরণ।

হুকুম শুনে সুইপাররা চোখ মোছে। ওরা বুঝে যায় যে রাবেয়াকে মেরে ফেলা হবে। ওকে বাঁচানোর আর কোনো সুযোগ নেই। এই চালতাগাছের নিচে রাবেয়াকে কখনো

বসতে দেখেনি ওরা। এ গাছের ফুল কখনো খোপায় দেয়নি রাবেয়া। মৃত্যুর সময় গাছ ওকে বুকে টেনে নিয়েছে। ওই গাছে ঝুলে থেকে রাবেয়ার স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুল হয়ে ফুটবে।

ব্যারাকের দেয়ালের পাশের চালতাগাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ওকে। ছোট গাছ বলে ওর উল্টে থাকা হাতের আঙুল মাটি ছুঁয়ে থাকে। লম্বা চুলের গোছা মাটি ছুঁই-ছুঁই করে। যেহেতু রাবেয়ার জ্ঞান নেই, সেহেতু ও তাকাতে পারছে না এবং দেখতে পারছে না যে চালতার সুন্দর সাদা ফুলটি ওর হাতের কাছে ঝরে পড়েছে।

সন্ধ্যা নামে।

পরদেশী এসে দাঁড়ায় আকমল হোসেনের বাড়ির গেটে। দরজা খুলে দেয় আলতাফ। ওকে কাঁদতে দেখে বুঝে যায় কিছু একটা ঘটেছে। সে পরদেশীকে হাত ধরে বারান্দায় এনে বসায়। তার পরে মৃদুস্বরে বলে, কান্না আমাদের মানায় না। আমরা কাঁদব না।

পরদেশী তার দিকে তাকিয়ে বলে, চোখের জল আটকানো কঠিন। জল আটকালে বুক ফাটবে। দেখব নর্দমা সাফ করতে গিয়ে ওখানে মরে পড়ে আছি। অহেতুক মরার চেয়ে একটাকে মেরে মরাই তো উচিত।

আলতাফ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বলে, জয় বাংলা।

কেউ এসেছে সাড়া পেয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে আসেন আকমল হোসেন, আয়শা খাতুন ও মেরিনা। ওদের দেখে প্রথমে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেও অল্পক্ষণে নিজেকে সামলায় পরদেশী। আকমল হোসেন ওর পাশে বসে ঘাড়ে হাত রাখেন। পরদেশী চোখ মুছে নীলুফারের কথা বলে, রাবেয়ার ঝুলে থাকার কথা বলে। চালতাগাছ, শ্রাবণের বৃষ্টি, সাদা ফুলের কথা বলতেও ও ভোলে না। নীলুফারের জন্য ও কোথায় থেকে ছুরি কিনেছে, সে কথা বলে। কয়েক দিন ছুরিটা নর্দমায় লুকিয়ে রেখেছিল, সে কথা বলে।

রাবেয়ার সাহসের কথা বলে। ঘটনার দিন রাবেয়া ওকে বলেছে, ছুরির কথা আমি একা স্বীকার করব। কোনো কথা না বলে স্বীকার করা। তুই কিছু জানিস না, পরদেশী। মেয়েগুলোর দেখাশোনার জন্য তোকে এখানে থাকতে হবে, পরদেশী। তোর ধরা পড়া চলবে না। মনে থাকবে তো?

থাকবে। আমি দম বন্ধ করে মাথা নেড়েছিলাম। এই রাবেয়াকে আমি বাইশ বছর ধরে চিনি। চাকরি শুরুর প্রথম থেকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাবেয়া আমাকে চোখ খুলে দিয়েছে। আমি রাবেয়াকে ফুটে উঠতে দেখেছি। ওহ্, রাবেয়া।

পরদেশী বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাঁদে। কেউ ওকে কাঁদতে মানা করে না। সবাই ভাবে, ও কেঁদে নিজেকে হালকা করুক। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে ও চোখ মোছে। আলতাফ ওর জন্য খাবার নিয়ে আসে। ও আয়শার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলে, মাইজি, আজ আমি খেতে পারব না। আমাকে জলও ছুঁতে বলবেন না, মাইজি।

আয়শা ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, তুমি সুস্থ থাকো, পরদেশী। ভালো থাকো, এই প্রার্থনা করি। এই দরজা তোমার জন্য খোলা থাকবে। যখন খুশি আসবে।

সবাইকে স্তব্ধ বসিয়ে রেখে পরদেশী চলে যায়। যেন অনন্তকাল বয়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। অনেকক্ষণ পর আয়শা খাতুন বলেন, চলো, আমরা ওদেরজন্য প্রদীপ জ্বালাই।

হ্যাঁ। চলো। ওদের স্মরণে গুনগুন ধ্বনি হবে না?

হবে। আয়শার ভেজা কন্ঠস্বর শুনে আকমল হোসেন মনে করেন, একই ক্ষরণ তার ভেতরেও হচ্ছে। তাদের দূরে সরার উপায় নেই।

একই ভাবনা নিয়ে মেরিনা উঠে যায় প্রজ্বলিত মোম আনার জন্য।

গুনগুন ধ্বনি বয়ে যায় ঘরে। আয়শার মনে হয়, আজ ওর হৃদয়ে মৃদু কাপন। তার পরও সুর ওঠে

ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন করে চরণ ’পরে প্রণত করো মন।।

গানের সুর মেরিনাকে আপ্লুত করে। ও তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। মায়ের দৃষ্টি মোমবাতির শিখার ওপর—ধেয়ে যায় গুনগুন ধ্বনি–

বেঁধেছ মোরে নিত্য কাজে প্রাচীরে-ঘেরা ঘরের মাঝে
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে সাজের আভরণ।।

আকমল হোসেনের মনে হয়, আয়শা গানটি তার জন্য গাইছেন। বাঁশির সবটুকু তার বুকের ভেতরে গেঁথে যাচ্ছে। তিনি প্রবল মনোযোগে গানটি শোনার জন্য কান পেতে রাখেন। আয়শা খাতুন দৃষ্টি সামনে ছড়িয়ে দেন–

এসো হে ওহে আকস্মিক, ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক।।
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন!
তাহার পরে প্রবেশ হোক
উদার তব সহাস চোখ—তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন।।

গানের রেশ শেষ হওয়ার আগেই আয়শা উঠে যান। হাঁটতে হাঁটতে গেয়ে শেষ করেন বাকিটুকু। মোমবাতির শিখা নিবুনিবু হয়ে আসে। ফোন বেজে ওঠে। আকমল হোসেন উঠে ফোন ধরেন।

হ্যালো, আঙ্কেল, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি আগে, আমি আরিফ, আঙ্কেল। আজ আমরা মন্ত্রীর গাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছি।

কোন মন্ত্রী, আরিফ?

মাওলানা মোহম্মদ ইসহাক।

ও বুঝেছি, মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রী। তার পার্টি নেজামে ইসলাম। ঘটনাটা কোথায় ঘটালে?

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের রাস্তায়। সময় ছিল বেলা বারোটা পঞ্চাশ মিনিট। মাওলানা লালবাগে নেজামে ইসলামের এক কর্মিসভায় যোগদান করে সেক্রেটারিয়েটের দিকে যাচ্ছিল। লালবাগের এক রেস্তোরাঁয় বসে মন্ত্রীকে ফলো করার জন্য অপেক্ষা করি। আবুল হোন্ডার নাম্বার প্লেটে আবছাভাবে চুন লাগিয়ে নিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ছিল গ্রেনেড-৩৬ ও ফসফরাস-৭৭।

মন্ত্রী বের হলে আমরা তার গাড়ির পিছু নেই। গাড়ি মেডিকেল কলেজের সামনে আসতেই ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে ওঠে। গাড়ি থেমে যায়। আমরা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাত ঢুকিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে দিই। তারপর হোন্ডা নিয়ে ছুটে যাই। পেছনে শুনতে পাই বিস্ফোরণের শব্দ।

কনগ্রাচুলেশন! তোমাদের জন্য দোয়া করি, বাবা।

ফোন রেখে দেন তিনি।

আয়শা খাতুন পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, সফল অপারেশন?

হ্যাঁ। মন্ত্রীর গাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছে আরিফ। এমন দিনদুপুরে অপারেশন করে খুব সাহস দেখিয়েছে ওরা। নিরাপদে যেতে পেরেছে এটাও খুশির খবর।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ। আমার ছেলে কোথায় আছে খবর পেয়েছ? গত দশ দিনে ওর কোনো খবর পাইনি।

শুনেছি ও ফার্মগেটের বাড়িতে আছে। এখনো আছে কি না, তা তো জানি না।

যাক, ভালো থাকুক। ও একটা ফোন করলে পারত।

ওই বাড়িতে ফোন নেই। তা ছাড়া সব সময় ওর খবর পাব, এমন আশা না করাই ভালো বোধ হয়। কত দিকে কত জায়গায় থাকছে, তার কি ঠিক আছে!

মন বলে যে জিনিসটি আছে, সেটা সব সময় যুক্তি মানে না। আয়শার ভেজা কণ্ঠস্বর আবার ঘরে ছড়ায়। সে কণ্ঠস্বর আকমল হোসেনের বুকে বেঁধে।

মন খারাপ করলে? আকমল হোসেন অপরাধীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন।

একটু তো খারাপ হয়েছেই। এমন করে বললে, যেন এ সময় আমি বুঝি বা ছেলের চলাচল আমি নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছি।

সরি, আশা। আমি এতটা বোঝাতে চাইনি। তোমার ভাবনা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছি। হয়তো বলাটা ঠিক হয়নি।

এসো। বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

আয়শা মৃদু হেসে আকমল হোসেনের হাত ধরেন। দুজনে পেছনের বারান্দায় এসে বসেন। ঝোপঝাপের জোনাকি দেখেন। আয়শা বলেন, আজকের ঘটনাগুলো খুবই আকস্মিক।

যুদ্ধের সময় কোনো কিছু আকস্মিক থাকে না, আশা। সবটাই প্রস্তুতির ঘটনা। প্রতিটি ঘটনার ভেতরে গভীর অর্থ আছে। তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমি যে সময়ের ইতিহাস লেখার উপকরণ সংগ্রহ করে যাচ্ছি, এসব সে ইতিহাসের বড় তথ্য। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এই ইতিহাসের উপকরণ।

হয়তো তা-ই। এত কষ্টের অভিজ্ঞতার ইতিহাস কি পৌঁছাবে স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে?

আয়শা দীর্ঘশ্বাস ফেললে আকমল হোসেন আয়শার মাথা নিজের ঘাড়ের ওপর রাখেন। হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখেন তাঁকে। আয়শা, আমরা একসঙ্গে এই বাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াব।

সেই রাতের শেষ প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছের একটি দুর্গবাড়িতে ঢোকে পাকিস্তান আর্মি। এই বাড়ির পেছনে কাঁঠালগাছের নিচে গর্ত করে হাউস বানিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়েছে।

ওরা প্রথমেই প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে, আলতাফ মাহমুদ কৌন হ্যায়?

আমি। তিনি সামনে এগিয়ে যান।

সেনা অফিসারদের একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে ভীষণ জোরে তার বুকে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে।

এরপর হুকুম দেয়, যেখানে অস্ত্র রাখা আছে, সেটা খুঁড়ে অস্ত্র বের করতে। মাত্র দিন কয়েক আগে আরও দুই বাক্স অস্ত্র আনা হয়েছিল। আলতাফ মাহমুদ তার কালো রঙের অস্টিন কেমব্রিজে করে গোলাবারুদ নিয়ে আসেন তার বাড়িতে। একটি টিনের বাক্সে ভরা ছিল সেগুলো। বাড়ির চারজন মুক্তিযোদ্ধা অনেক রাত পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে অস্ত্রের বাক্স রেখে তার ওপর ইট-বালু দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।

আগস্ট মাসে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির ভারত সফর করার কথা ছিল শরণার্থী শিবির দেখার জন্য। পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল, তাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখাবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কেনেডির অবস্থান দেখে তারা সে আমন্ত্রণ বাতিল করে। কেনেডি কলকাতা থেকে ফিরে যান। ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকার কথা ছিল কেনেডির। ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা ফাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্যোগ নিয়েছিল জানান দিতে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। শহরজুড়ে আমরা আছি।

গেরিলাদের বড়সড় আক্রমণের জন্য গোলাবারুদ জোগাড় করা হয়েছিল অনেক। পরিকল্পনামতো কাজ না হওয়ায় অল্প বারুদ দিয়ে বোমা ফাটানো হলো ঠিকই, রয়ে গেল অনেক। সেগুলো রাখার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন আলতাফ মাহমুদ।

যমদূতের মতো এসে দাঁড়াল ইবলিসরা।

ওদের দিয়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ তুলিয়ে গাড়িতে ওঠানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে ওঠানো হলো বাড়ির সব কয়জন গেরিলাযোদ্ধাকে। আলতাফ মাহমুদের বুকে-মুখে তখনো রক্তের দাগ।

গাড়ি যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন দিনের আলো শুরু হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া তেমন নেই। প্রচুর কাক উড়ছে শহরের ওপর দিয়ে। পুব আকাশে সূর্য লাল হয়ে বেরিয়ে আসছে। গাড়ি ছুটছে তেজগাঁওয়ের এমপি হোস্টেলের দিকে। সেটি এখন একটি বন্দিশিবিরে পরিণত হয়েছে। ওদের সেই বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হলো।

রাতে প্রায় নির্ঘুম কাটিয়েছেন আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন। বারান্দায় আসতেই দেখলেন সিঁড়ির ওপর মেরিনা বসে আছে।

কিরে, তুই এত ভোরে?

ঘুম আসছিল না, মা। বারবার মনে হচ্ছিল, কেউ বোধ হয় গেটে ধাক্কা দিচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, মাঝেমধ্যে গোলাবারুদ রাখার জন্য যারা আসে, তাদের কেউ হবে। তাই উঠে পড়েছি। দেখছি কোথাও কেউ নেই। বাইরে এসে দেখি, আলতাফ ভাইও ঘাসের ওপর বসে আছেন।

আমিও ঘুমোতে পারিনি। কেমন জানি লাগছিল, বলতে পারব না। অন্য সময় ভোররাতের দিকে ঘুম আসে। কালকে তা-ও হয়নি। আমি তো সেই ভোররাত থেকে উঠে বসে আছি। রাস্তাটা এমন ফাঁকা। গেট খুলে বাইরে এসে বুক খা খা করছিল। ভয়ে আবার গেটের ভেতরে ঢুকে পড়ি।

আলতাফ থামতেই আকমল হোসেন এবং আয়শা খাতুনের দৃষ্টি মন্টুর মায়ের ওপর পড়ে। ও বারান্দার এক কোনায় গুটিসুটি শুয়েছিল। আলতাফের কথা শুনে উঠে বসেছে।

মেরিনা বলে, আমি ঘুম থেকে উঠে বুয়াকে বারান্দার কোনায় শুয়ে থাকতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? বলল, ভোররাত থেকে শরীর খারাপ লাগছে। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুক ধড়ফড় করছে। আমি বললাম, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকেন। আমাকে বলল, ঘরে ভালো লাগছে না। মনে হয়, দম আটকে আসছে।

সবার কথা শুনে আকমল হোসেন আর আয়শা খাতুন বিষণ্ন হয়ে যান। বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন। দেখতে পান, মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। চারদিকে ম্রিয়মাণ দিন। প্রবল বিষণ্নতায় আক্রান্ত দুজন মানুষ তো এই সময়কে দেখছেন একটি বড় ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। সেই ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারা তাদের প্রত্যেকের কাছেই গৌরবের অংশীদারি হওয়া। তবে তারা কেন বিষণ্নতায় আক্রান্ত হবেন?

দুজনে একই ভাবনায় আত্মস্থ হওয়ায় ফাঁকে মেরিনা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি নিজের ঘরে গেলাম, আম্মা। আমি নাশতা খাব না। আমাকে ডাকবেন না।

তুমিও রান্নাঘরে ঢুকবে না, মন্টুর মা?

আমি তো ঢুকবই। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের দেখে শরীর আর তেমন খারাপ লাগছে না। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

মন্টুর মা শাড়ির আঁচল নিজের মাথার ওপর তুলে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। আলতাফ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলে, আজ বোধ হয় বাজার লাগবে না। কালকে তো অনেক বাজার করেছি।

তোমার কি বাজারে যেতে ইচ্ছে করছে না?

করছে। বাজার করতে আমার ভালো লাগে। আপনি বললে আমি এখনই যাব।

তুমি তো জানো, আমার ছেলেটা যখন-তখন আসতে পারে। ওর জন্য...

ও একা নয়, খালাম্মা। আমাদের এখানে গেরিলাযোদ্ধা যে যখন আসবে, তাদের জন্য আমাদের কিছু-না-কিছু খাবার মজুত রাখতেই হবে। আমি কি বাজারে যাব?

আমি দেখে নিই ফ্রিজে কী আছে। তারপর ঠিক করব বাজার লাগবে কি। তুমি তো সকালে কিছু খাওনি, আলতাফ?

এখনো কিছু খাইনি। খাব। আমি তো পান্তা ভাত খেতে চাই।

আয়শা হাসতে হাসতে বলেন, সঙ্গে পোড়া মরিচ আর পেঁয়াজ। এবং ভাতের সঙ্গে থালাভর্তি পানিও চাই।

আলতাফ আর কথা বাড়ায় না। হকার খবরের কাগজ নিয়ে আসে। আলতাফ গেটের কাছে গিয়ে কাগজ নেয়। আকমল হোসেন হাত বাড়িয়ে রাখেন কাগজের জন্য।

পত্রিকায় অস্ত্রের ছবির ওপর সহজে দৃষ্টি আটকে যায়। প্রথমে ক্যাপশন পড়েন : শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার : কয়েকজন গ্রেপ্তার।

তিনি কাগজ মুড়ে ফেলেন। চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। কীভাবে কী হলো? কোথায়? কাদের ধরল সেনা অফিসাররা?

ফোন করলেন আশরাফকে।

আশরাফ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। ধরা পড়েছে কয়েকজন গেরিলাযোদ্ধা।

আবার কান্নার শব্দ ভেসে এলে মর্মাহত আকমল হো◌েসন বলেন, বুঝেছি। আমি পরে শুনব। এখন থাক।

আকমল হোসেন নিজেকে সামলান। বুকের ভেতরে প্রবল তোলপাড়। হাত থেকে রিসিভার পড়ে যায়।

আয়শা রিসিভার ওঠাতে ওঠাতে বলেন, কী হয়েছে?

আকমল হোসেন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নেন। তার পরও তিনি একজন পর্যদস্ত মানুষ। গলা দিয়ে স্বর বের হতে চায় না। দুবার কাশেন।

আয়শা খাতুন তাঁর হাত ধরে বলেন, এসো, বসবে।

দুজনে সোফায় গিয়ে বসেন।

যুদ্ধ তো একতরফা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা বিপর্যয় আছে। আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। আমাদেরকে এই সহজ কথাটা বুঝতে হবে।

আয়শা প্রথমে চমকে ওঠেন। তারপর নিজেকে নিজে সামলে বলেন, গেরিলাদের কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ।

ধরে পড়েছে?

বেশ কয়েকজন।

শহীদ?

এত খবর একবারে নিতে চাইনি। আশরাফ কাঁদছিল। আমি নিজে বের হব। বিভিন্ন বাড়িতে যাব।

আমিও যাব।

হ্যাঁ, যাবে।

নীরব হয়ে যায় বাড়ি।

আয়শার গুনগুন ধ্বনি ছড়াতে থাকে ঘরে–

অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন বাতাসে।।
যে ফুল গেছে সকলে ফেলে
গন্ধ তাহার কোথায় পেলে।

গুনগুন ধ্বনি শুনে মেরিনা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। কী ঘটল? মায়ের কণ্ঠে গুনগুন ধ্বনি কেন? ও দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভেতর ঢোকে না। আয়শা খাতুনের কণ্ঠে সুর জেগে ওঠে—

যার আশা আজ শূন্য হলো কী সুর জাগাও তাহার আশে॥
সকল গৃহ হারাল যার তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাসা॥

আকমল বারান্দায় উঠে আসেন। তিনি বুঝে গেছেন গুনগুন ধ্বনির অর্থ কী। কোথায় কী ঘটল? তার পা কাঁপে। তার চোখ ভিজে আসে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে মন্টুর মা। কোথায় কী হলো? কেন গুনগুন ধ্বনি ছড়িয়ে গেছে বাড়িতে? কেন এই ধ্বনি বুকে এসে বাধে? কেন হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে? মন্টুর মা দরজায় মাথা রেখে নিজেকে সামলায়। সুর ছড়াতে থাকে–

শুকালো যেই নয়নবারি
তোমার সুরে কাঁদন তারি।।
ভোলা দিনের বাহন তুমি
স্বপন ভাসাও দূর আকাশে।।

গুনগুন ধ্বনি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মেরিনা সেই সুর বুকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যায়। মন্টুর মা রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভ থেকে চায়ের কেটলি নামায়। আলতাফ বারান্দায় বসে খবরের কাগজ খোলে আর ভাঁজ করে।

গান শেষ হয়ে গেছে। জেগে থাকে রেশ।

অকস্মাৎ আকমল হোসেন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। ফোপাতে থাকেন। যেন সারা জীবনের কান্নার সঞ্চয় আজ এক লহমায় শেষ করবেন। শেষ না করে তার উপায় নেই। কারণ রোধ করার সাধ্যও নিঃশেষ।

একসময় আয়শাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। জীবনের শেষ রক্ত দিয়ে প্রভাতের আলো দেখতে চাই।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলেন

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলেন আকমল হোসেন।

টেবিলের ওপর ডায়েরি খোলা। কখনো লিখছেন, কখনো চুপচাপ বসে থাকছেন। বুঝতে পারছেন, নিজের চিন্তাশক্তি বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বারবার বোঝালেন যে, যুদ্ধ কোনো সুখের সময় নয়। বিশেষ করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ।

স্বাধীনতাযুদ্ধের কঠিন সময়ে দিনরাতের কোনো আলাদা প্রহর হয় না। এর রং দুটি—হয় কালো, না হয় সাদা। হয় আনন্দ, না হয় কষ্ট হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। এমন ভেবে ডায়েরির পাতা ভরালেন তিনি। সময়ের স্মৃতিচারণা করলেন। গতকাল মেলাঘর থেকে তিনজন গেরিলাযোদ্ধা ঢাকায় ঢুকেছে। তাদের কথা লিখলেন। ওরা বলেছে, একটি সিটি টেরোরাইজিং অপারেশন করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে শত্রুপক্ষকে নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়া গেরিলাযুদ্ধের কৌশল।

ওদের দীপ্ত চেহারায় যুদ্ধ ও শান্তির ছবি প্রতিফলিত হচ্ছিল। ওদের স্নিগ্ধতার সঙ্গে বারুদের গন্ধের মাখামাখি ছিল। তিনি আঁকিবুকি রেখায় ওদের নাম লিখলেন। ডিজাইন করলেন নামের রেখার সঙ্গে ফুলপাতা এঁকে। মনে হলো, এইটুকুতে তার খানিকটুকু স্বস্তি ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে নামের সঙ্গে পতাকার ছবি আঁকলেন। ডায়েরির বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা এভাবে ভরালেন। মনে করলেন, এটিও যুদ্ধের স্মৃতি।

রাত বাড়ছে।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। কিন্তু ঘুমোবার কথা তার মনে এল না। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে রাখলেন। আয়শা ঘুমোচ্ছ। ভাবলেন, ও ঘুমাক। এই মুহূর্তে ঘুমই ওর যুদ্ধ।

এই রাতে ঢাকা শহরের গেরিলাদের আশ্রয়-বাড়ি আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। আক্রমণের সময় ছিল সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত। বেশ অনেকজন গেরিলা ধরা পড়েছে। এই খবরে মর্মাহত আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন।

সারা দিন গাড়ি চালিয়ে প্রতিটি আক্রান্ত বাড়িতে গেরিলাদের খবরাখবর নিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরলেন দুজন।

মেরিনার খোঁজ করলেন। বাড়িতে নেই ও। কোথায় গিয়েছে, তা কাউকে বলে যায়নি। আয়শা খাতুন শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। আকমল হোসেন নিজের পড়ার টেবিলের ওপর কনুই রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

গতকাল রাব্বি, বাকের আর শরীফ অস্ত্রসহ ঢাকায় ঢুকেছিল। অপারেশনের নতুন পরিকল্পনা ছিল ওদের। দুই ট্রাঙ্ক অস্ত্র নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ। সেই ট্রাঙ্ক বাড়ির পেছন দিকে মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

ওই বাড়ির কারও কাছ থেকে এসব কথা শুনেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছিল পাকিস্তানি কয়েকজন সেনা, পেছন দিকের গেটের দরজা ভেঙে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আরও বলেছিলেন, আমাদের যোদ্ধা মানুষটি সৈনিকদের জিজ্ঞাসার সামনে নির্ভীক ছিলেন। নিজে একাই কথা বলেছিলেন। কাউকে কোনো কথা বলতে দেননি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নিয়েই তিনি বন্দী হয়েছিলেন।

আকমল হোসেন চারদিকে তাকিয়ে বাড়িটি দেখছিলেন। আয়শা ছিলেন তাঁর পাশে। দেখেছিলেন খোঁড়া মাটির স্তুপ। জানতেন, ঘরের কোথাও তার প্রিয় হারমোনিয়াম আছে। এই হারমোনিয়ামে তিনি অসাধারণ সুর তুলেছিলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে। এই বছরেও সেই গান গেয়ে শহীদ মিনারে গিয়েছিল শহরের মানুষ।

সুরের মানুষের দাঁত ভেঙে যায় রাইফেলের বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে।

বেয়নেটের খোঁচায় কপালের চামড়া উঠে যায়। চামড়ার একাংশ ঝুলতে থাকে কানের পাশে।

সেই অবস্থায় সুরের মানুষ মাটি খুঁড়তে থাকেন। টেনে তোলেন লুকিয়ে রাখা অস্ত্র। তুলে দেন শত্রুর হাতে। যাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই, তাদের হাতে। তিনি তখন জানতেন না স্বাধীনতা দোরগোড়ায়। মাত্র সাড়ে তিন মাস বাকি।

একজন বললেন, তিনি সুর আর অস্ত্রের সঙ্গে জীবন বাজি রেখেছিলেন।

আকমল হোসেন শুনতে পেলেন কান্নার শব্দ।

শুনতে পেলেন শিশুর চিৎকার।

তিনি জানতেন, তাঁর মেয়েটির নাম শাওন। বয়স চার বছর মাত্র।

তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজনকে যখন বন্দী করে গাড়িতে তোলা হলো, তিনি বুঝলেন, অতি যত্নে সংরক্ষিত অস্ত্র আর গেরিলাযুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। এই ভাবনায় তার ভেতরে যন্ত্রণা দগ্ধীভূত হলো।

আকমল হোসেন দেখলেন, বাড়ির ছাদে রোদ লুটোচ্ছে। উঠোনের কাঁঠালগাছে কাকেঁদের কা কা শব্দ নিস্তব্ধতার বুক চিরে দিচ্ছে।

বাড়িটির খুব কাছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। পঁচিশের রাতে পুলিশ লাইনে ভয়াবহ তাণ্ডব সংঘটিত হয়েছে। এখন পুলিশ লাইনের ব্যারাকে বন্দী আছে মেয়েরা। নির্যাতনে জর্জরিত মেয়েদের কণ্ঠে আছে প্রতিশোধের শপথ। তিনি দূরের দিকে তাকিয়ে রাবেয়ার কথা ভাবলেন। সুইপার রাবেয়া। সুইপার পরদেশীর কথাও ভাবলেন। তাঁর মনে হলো, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোটাই এখন তার সামনে।

তিনি আয়শা খাতুনকে নিয়ে মগবাজারে এলেন। এই প্রথম তিনি গাড়ি চালাতে ক্লান্তি বোধ করলেন। তাঁর মনে হচ্ছে, পথ ফুরোচ্ছে না। সামনে আরও দীর্ঘ পথ। যেতে হবে, যেতেই হতে থাকবে।

মগবাজারের ৩০ নম্বর দুর্গবাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে মনে হয়, এই বাড়ি থেকে যদি মারুফ গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, তাহলে কোথায় খুঁজবেন ওকে? না, তিনি ওকে খুঁজতে নামেননি। ক্র্যাক প্লাটুনের সব সদস্যের খোঁজখবর নিচ্ছেন, যারা তাঁর বাড়িতে সব সময় যোগাযোগ রেখেছে। কখনো থেকেছে, কখনো থাকেনি। কখনো তার বাড়ি থেকে অস্ত্র নিয়ে অপারেশনে বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ করে আয়শা খাতুন তার দিকে তাকিয়ে বলেন, মারুফ!

আমাদের একটিমাত্র ছেলেই গেরিলাযোদ্ধা নয়, আয়শা।

তা নয়। ওর সঙ্গে সব নামই থাকে। কখনো একটা নামই উচ্চারিত হয় নিজের অজান্তে। পেটে ধরেছি। লালন-পালন করেছি। এইটুকু মায়া ও আমার কাছ থেকে বেশিই পাবে।

আয়শা আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর মনে হচ্ছে, আজ তিনি একটু বেশি ঘামছেন। বারবার মুছেও ঘাম কমাতে পারছেন না। কেমন করে যাবেন মুক্তিযোদ্ধা রাশেদের মায়ের সামনে? কেমন করে জিজ্ঞেস করবেন, যারা ধরা পড়েছে তাদের নাম কী? জিজ্ঞেস না করেও রাজারবাগ আউটার সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে জানতে পেরেছিলেন সুরের মানুষটির সঙ্গে আর কারা ধরা পড়েছিল। এখন কী করবেন? বুকের ভেতরে প্রবল আতঙ্ক!

গাড়ি লক করে আকমল হোসেন বললেন, এসো।

নিস্তব্ধ এলাকা। তিন মাস আগে রেললাইনের কাছাকাছি জায়গায় নামিয়েছিলেন মাহমুদাকে। এখন যাবেন রেললাইন থেকে শিল্প এলাকার দিকে খানিকটুকু এগিয়ে হাতের ডান দিকের একটি গলিতে। একতলা বাড়ি। দেখলেন আশপাশের বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। এই একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সামনের দরজা খোলা। দু-চারজন মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। বাড়িতে পরিচিত কেউ আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না।

একজন বললেন, আসুন। বসুন। আপনাকে আমি চিনি। ভাগনের মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনার ছেলে কোথায়?

আয়শা বুঝলেন, তার ছেলে রাতে এই হাইডে ছিল না। আকমল হোসেনও উত্তর পেয়ে গেছেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, মারুফ যে কোথায়, তা তো আমি জানি না।

জানারই কথা। এ কয় দিনে ঢাকায় না থাকলে হয়তো রূপগঞ্জে আছে, নয়তো মেলাঘরে।

হ্যাঁ, সেরকমই হবে।

কাল এ বাড়িতে গোলাগুলি হয়েছে। কাজী গুলি করেছিল পাকিস্তানি সৈন্যকে। তারপর পালিয়ে যেতে পেরেছে। ধরা পড়েছে বাকি ছয়জন। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন রেকি করতে গিয়ে জুয়েলের আঙুলে গুলি লেগেছিল। ও দিলু রোডের বাড়িতে ছিল।

আকমল হোসেন ভুরু কুঁচকে বলেন, আমি শুনেছিলাম, ও অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়ার কথা বলে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মাকে ওর দেখতে যাওয়া হয়নি। মানে, ও যায়নি। ও এসেছিল এই বাড়িতে। ওদের পরিকল্পনা ছিল অপারেশনের। আজাদের সঙ্গে ও ধরা পড়েছে।

আকমল হোসেন বিবর্ণ মুখে কথাগুলো শোনেন। মনে মনে উচ্চারণ করেন, সেই ছেলেটি...। আয়শা খাতুন ভেজা চোখ নিয়ে অন্যদিকে তাকান। একদিন ও বলেছিল, আমি গাজরের হালুয়া পছন্দ করি। আমি আরও এক বাটি হালুয়া খাব।

আয়শা বিব্রতবোধ করে চুপ করে ছিলেন। সেদিন বাটিতে আর হালুয়া ছিল না।

ও মৃদু হেসে বলেছিল, জয় বাংলা মামণি, যেভাবে বসে আছেন, আমার মায়ের হাতেও খাবার না থাকলে এমন গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। দিতে না পারার কষ্ট আমি মায়েদের মুখ দেখে বুঝতে শিখেছি।

আয়শা খুঁজে দেখার দৃষ্টিতে বাড়িটি দেখেন। গলির রাস্তাটির এমাথাওমাথায় তাকান। রিকশাগুলো খোঁজেন। ভাবেন, যদি কোনো পরিচিত মুখ দেখতে পাওয়া যায়। যদি কেউ কাছে দাঁড়িয়ে বলে, জয় বাংলা মামণি, ঠান্ডা পানি চাই। ফ্রিজে কি পুডিং আছে? আজ কি মুগের ডাল রান্না হয়েছে? পুঁইশাক-চিংড়ি মাছের তরকারি? আমি বিরিয়ানি খাব। কাচ্চি বিরিয়ানি।

আয়শা নিজের ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে যান। তার চোখের সামনে থেকে একতলা বাড়িটি উধাও হয়ে যায়। জেগে থাকে অপার প্রান্তর। যেখানে শত শত ছেলেমেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন একজন এক বস্তা গুলি এনে বলছে, এগুলো রাখেন। দরকারমতো নিতে থাকব। তিনি তো রেখেছেন। গ্যারেজের মেঝে খুঁড়ে। সেদিন সব ব্যবস্থা শেষ করতে রাত ফুরিয়ে গিয়েছিল। একবারও মনে হয়নি, আজ না কাল করব। এখন না তখন। ছেলেদের যা হুকুম, সেটা তো নিমেষে করতেই হয়।

আকমল হোসেন বলেন, চলো, যাই।

আয়শা খাতুন বিড়বিড় করে বলেন, বিদায়, যোদ্ধারা। তোমরা ধরা পড়েছ। যদি ছাড়া পাও, আবার দেখা হবে।

আকমল হোসেন আবার বলেন, চলো যাই। যুদ্ধক্ষেত্র দেখার শেষ থাকে, আয়শা। যত দিন বাঁচব, এই সব যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে হবে। স্মরণের দীপশিখায় আমাদের জ্ঞানের আলোয় দেখতে হবে। ইতিহাসের পাতায় গেঁথে রাখতে হবে পরবর্তী মানুষদের জন্য।

গাড়ি আবার ছুটছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

এলিফ্যান্ট রোডে।

কণিকা বাড়িতে?

হ্যাঁ। মাত্র কিছুদিন আগে ঘুরে এলাম ওখান থেকে।

যুদ্ধের সময় মুহূর্তে মুহূর্তে অন্য রকম হয়ে যায় সবকিছু। আনন্দ-কষ্ট পাশাপাশি থাকে।

জানি। বুঝতে পারি। আমরা প্রতি মুহূর্তে এর ভেতরে দিন কাটাচ্ছি।

গাড়ি যাচ্ছে। দুজন চুপ। তারা বুঝতে পারেন, আজ তাদের কথা বুকের ভেতরে বেশি। যেটুকু বলছেন, সেটুকু জোর করে। অনেক বেশি কথা ভেতরে স্তব্ধ হয়ে আছে।

গাড়ি গেটের কাছে থামলে তারা দেখলেন, দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলল, খালাম্মা বাড়িতে নাই।

একজন বলল, পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গেছে। রুমীর বাবাকেও।

আয়শা স্খলিত কণ্ঠে বললেন, ইমাম ভাইকেও?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। আকমল হোসেনের মনে হলো, তিনি একজন অসহায় মানুষ। যুদ্ধের সময় মানুষ কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির শিকার হয়। মানুষের অসহায়ত্ব নির্ণয় করা কঠিন।

কেউ একজন বললেন, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মোট ছয়টি বাড়ি আক্রমণ করেছে সৈন্যরা। প্রথম আক্রমণ হয়েছে মগবাজারের ৪১৫ নম্বর বাড়ি। ধরে নিয়ে গেছে আবদুস সামাদকে।

আমরা তো ওই দিক থেকেই এলাম। জানতাম না বলে ঢোকা হয়নি। এমন সর্বনাশ কী করে হলো? ওরা কেমন করে জানল?

কেউ কোনো কথা বলে না। কোন অন্তরালে কোথায় কী ঘটেছে, তা তো কেউ জানে না। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো কাঁদতে শুরু করে।

আরেকজন বলে, ওই বাড়ির পেছন থেকে ধরা পড়েছেন সরকার আবদুল হাফিজ। নির্যাতনে তার একটি চোখ বের হয়ে গিয়েছিল। একটি রগের সঙ্গে তাঁর চোখটি আটকেছিল।

উহ, মা! আয়শা খাতুন অস্ফুট শব্দ করেন। তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখছিলেন অন্য বাড়িগুলো। মেইন রোড থেকে যে গলিতে বাড়িটা, সেটা একটা ব্লাইন্ড গলি। কণিকা বাড়ির পরে আর একটি মাত্র বাড়ি আছে। হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ারও রাস্তা নেই। সব বাড়িতে অজস্র গাছ। বৃষ্টিস্নাত গাছের পাতা চকচক করছে। ফুল আছে অনেক গাছে। গেরিলাযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং গোলাবারুদের আনা-নেওয়ার মধ্যে আশ্চর্য স্নিগ্ধ প্রকৃতি। আয়শা খাতুনের মনে হয়, সংগীতের মতো এই প্রকৃতি, যা মানুষের চিত্তকে মোহিত করে। শান্তির মগ্নতায় মানুষ স্থির হয়। আজকের প্রকৃতি ধরা পড়া গেরিলাদের জন্য প্রার্থনা করছে। আয়শা খাতুন এতক্ষণে বুকের ভেতর স্বস্তি অনুভব করেন।

আকমল হোসেন তাঁর দিকে তাকালে তিনি বলেন, ধানমন্ডি আটাশে চলো যাই।

আকমল হোসেন পা বাড়াতেই একজন বলে, ওই বাড়ি থেকে কেউ ধরা পড়েনি। গেরিলারা কেউ ছিল না। আমি বাড়িতে ঢুকেছিল। এই ঘটনার দুদিন আগে দুজন যোদ্ধা মেলাঘরে চলে গিয়েছিল। ওরা একজন দারোয়ানকে ধরে। অন্যজন পালিয়ে যায়।

চলো, আমরা দিলু রোডে যাই।

হ্যাঁ, চলো।

গলি ছেড়ে বের হয়ে গাড়ি মেইন রোডে ওঠে।

ছুটতে শুরু করে গাড়ি। পৌঁছে যায় দিলু রোডে। মেইন রোড থেকে বেশ অনেকটা ভেতরে ছিল বাড়িটা। আকমল হোসেন যখনই এসেছেন, মাঠে এক চক্কর ঘুরেছেন। বাড়ির পাশের বড় মাঠটি তিনি খুব পছন্দ করেন। আলমকে বলেন, মাঠটি হলো শান্তির জায়গা। আলো-বাতাসের মুক্তি। পতাকা ওড়ানোর মুক্তি।

হা হা করে হাসত আলম। বলত, তোমার ভাবনাই অন্য রকম। কোথাকার জিনিস কোথায় যে নিতে পারো। ভাবতেও পারো, বাপু।

আলমের হাসি বুকে নিলে যুদ্ধের ছবি অন্য রকম হয়ে যায়। যুদ্ধ আর প্রতিদিন এক হয়ে থাকে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

একজন বলল, বিশ-পঁচিশ জন সেনা এসেছিল। প্রবল মারমুখী হয়ে। সে রাতে বাড়িতে এসেছিলেন কাজী। আজাদের বাড়িতে আর্মি ঢুকলে কাজী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্যাপ্টেনের ওপর। বেশ ধস্তাধস্তি হয়েছিল। সেপাইরা এলোপাতাড়ি গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয় দুজন যোদ্ধা। আহতদের ফেলে রেখে অন্যদের ধরে নিয়ে যায় সৈন্যরা। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া কাজী এই বাড়িতে এসেছিল।

আকমল হোসেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

আয়শা ভেতরে ঢুকেছেন। যোদ্ধারা কেউ নেই বাড়িতে। বাড়ির মেয়েরাও সবাই নেই। শুধু একজন আছে। মাত্র কয়েক দিন আগে সে করাচি থেকে এসেছে। এই বাড়ির বড় মেয়ে সে।

সে বলল, বাবা আর্মির উপস্থিতি টের পেয়ে পেছনের দেয়াল টপকে পাশের বাসায় চলে গিয়েছিলেন।

আয়শা জানেন, এ বাড়ির ছেলে একদম প্রথম দিককার গেরিলাযোদ্ধা। নিজের বিছানায় কোলবালিশ চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। তবে বাবার কাছে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল।

আয়শা তার বোনের দিকে তাকালে সে বলে, আমি খুব ভালো উর্দু জানি। ওদেরকে করাচি থেকে এসেছি, সে কথা বললাম। বিমানের টিকিট দেখালাম। কিছুটা দমল

ওরা। কিন্তু ওদের আক্রমণটা এল অন্য দিক থেকে। মনে হলো, ওরা যেন জেনেশুনেই এসেছে যে বাড়ির কোথায় কী আছে। ওদের হাঁটাচলার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছিল, বাড়ির ম্যাপটা ওদের মুখস্থ। দেড় তলা বাড়িটা ওদের নখদর্পণে। ওরা সরাসরি রান্নাঘরে যায়। রান্নাঘরে ওদের কী আছে, তা ওরা যেন জেনেশুনেই এসেছে। সেপাইরা আগেই শাবল এনে রেখেছিল। ওরা রেডি ছিল। ক্যাপ্টেনের ইশারা পেয়েই শাবল দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে খুঁড়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ বের করল। ক্যাপ্টেনসহ অন্যরা হা হা করে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, বহুত আচ্ছা। বহুত আচ্ছা।

আরও কী কী সব বলেছিল, তা আমি মনে করতে পারছি না। আমার মধ্যে তখন একটাই চিন্তা ছিল, ওরা রান্নাঘরে অস্ত্রের খোঁজ পেল কোথা থেকে! আমার আব্বা মেঝে খুঁড়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ রেখেছিলেন। তার ওপরে স্ল্যাব দিলেন। স্ল্যাবের ওপর রাখা হলো কেরোসিনের চুলা। পাশে শুকনো লাকড়ি। বোঝার কোনো উপায় ছিল না। অথচ ওরা ঠিকই শাবল দিয়ে মেঝে খুঁড়ে ফেলল।

যোদ্ধার বোন দুহাতে মুখ ঢাকলে আয়শা তার মাথায় হাত রাখেন। গুনগুনিয়ে বলেন, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ...। মেয়েটি তার দুহাত জড়িয়ে ধরে। আয়শার সামনে দেড় তলা বাড়িটি যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায়। যে বাড়িতে অস্ত্র রাখা হয়, যোদ্ধারা থাকে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে আসা সে বাড়ি তো একটি যুদ্ধক্ষেত্রই হবে। এমন দুর্গবাড়িগুলো এখন এই শহরের প্রাণ।

ওদের গাড়ি আবার ছুটছে। যাচ্ছে নাসিরাবাদ। এখানকার বাড়িটিও মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের ও অস্ত্র রাখার জায়গা। দূর থেকেই দেখলেন, বাড়িটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাই ও কয়লার স্তূপের পাশে পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত লাশ। চিত হয়ে পড়ে থাকা লাশে অজস্র বুলেটের চিহ্ন।

তাঁরা গাড়ি থেকে নামলেন না। গেলেন এলিফ্যান্ট রোডে। একটি সরকারি বাড়ি এটি। বড় ভাই সরকারি চাকুরে। ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা। এ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। যখন-তখন যেকোনো প্রয়োজনে চলে আসত ওরা। এমন অনায়াস যাতায়াতের জন্য ভীত ছিলেন গৃহকর্তা। তিনি সরকারি বাড়িতে বসবাস করতেন

চাকরিসূত্রে। অন্যদিকে বাড়িতে অস্ত্র-গোলাবারুদ ছিল। আলমারিতে স্যুটের আড়ালে রাইফেল লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গ্রেনেড ছিল অনেকগুলো। চুল্লু বুঝতে পেরেছিল যে একটা কিছু ঘটবে। প্ল্যান ছিল সকালের আগেই এসব অস্ত্রসহ সরে পড়বে। কিন্তু হয়নি। ভোর হওয়ার আগেই আর্মির গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামে। দরজায় বুটের লাথি পড়লে ঘুম ভেঙে যায় সাদেকের।

বাড়িতে অতিথি এলে এভাবে দরজায় ধাক্কা দেয় না। এত রাতে কারও আসার কথাও নয়। তাহলে কি মুক্তিযোদ্ধাদের আসা-যাওয়া আর্মির নজরদারিতে পড়েছে? শুনতে পায়, দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে বলে গালাগালি করছে সেপাইরা।

সাদেকের মুখের দিকে তাকিয়ে আকমল হোসেন বলতে চান, এখন মধ্যরাতে সেপাইরা নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের জীবন। লাথি দিয়ে, তো দিয়ে, বুলেটের আঘাতে, বেয়নেটের খোঁচায় তারা যা খুশি তা করতে পারে।

সাদেক বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, এই বাড়িতে আমি ওকে প্রশ্রয় না দিলে ওকে হয়তো আর্মির হাতে ধরা পড়তে হতো না। অন্তত আমার সামনে থেকে ওকে ধরে নিয়ে যেতে দেখতাম না।

আপনি এভাবে বলতে পারেন না। যিনি যোদ্ধা, তিনি বিপদের ভেতর দিয়েই হেঁটে যান। মৃত্যুভয় নিয়ে কেউ যুদ্ধে যায় না। আপনি ভাইকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছেন। আজাদের মা যে ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে দেখলেন। আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী যে স্বামীকে ধরে নিয়ে যেতে দেখলেন। মিসেস ইমাম যে স্বামী ও দুই ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে দেখলেন!

আয়শা কান্নাভেজা স্বরে অস্ফুট আর্তনাদ করে বললেন, উহ, থাম!

সাদেক আকমল হোসেনের দুহাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠিকই বলেছেন। ওর জন্য কষ্ট হচ্ছে বলেই নিজের ওপর এমন দায় টেনেছি। দুঃখ কখনোনা খুবই ব্যক্তিগত, কখনো সামষ্টিক।

আকমল হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, আমাদের সকলের বুকবোঝাই কষ্ট আছে। আমরা কেউই কষ্ট থেকে বের হতে পারছি না। একের কষ্ট অপরের কষ্টের সঙ্গে যোগ হচ্ছে অনবরত।

পাশাপাশি স্বপ্নও আছে।

হ্যাঁ, তা আছে। স্বপ্ন ছাড়া আমরা দিন গুজরান করি না।

আবার সবাই চুপ হয়ে যান। এই মুহূর্তে এসব কথার কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না আয়শা খাতুনের। মনে হয়, যা কিছু বলা হচ্ছে; তা অর্থহীন। শুধু রিয়ালিটি সত্য। এই বাস্তব নিয়ে বুকে অনেক কিছু জমবে। তাকে ঘাটাঘাটি করার দরকার কী! যা জমছে জমুক। ইসমাত তাকে হাত ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায়।

মুখোমুখি চেয়ারে বসলে ভিজে ওঠে দুজনের চোখ।

ভাবি, কী হলো আমাদের?

যাত্রাপথে এমন অঘটন ঘটেই থাকে। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।

ওরা কি ফিরে আসবে?

আয়শা খাতুন চুপ করে থেকে বলেন, জানি না তো। ওদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা কি ওদের খোঁজটুকুও পাব না।

এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? আমাদের চারপাশে উত্তর দেওয়ার লোক নেই।

আয়শা খাতুন জানেন, এসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। উত্তর দেওয়ার সাধ্য তার নিজের নেই। শুরুর সময়ে ওরা একদিন বলেছিল, আপনার কাছ থেকে সেই গুনগুন ধ্বনি শুনতে চাই—

লাজুক হেসে থেমেছিল চুন্নু। কোন গানটা শুনতে চায়, তা বলতে দ্বিধা করছিল।

মারুফ ধমকে উঠেছিল, তুই আমার মায়ের সামনে লজ্জা পাচ্ছিস রে?

মারুফের পিঠে চাপড় দিয়ে আয়শা বলেছিলেন, আহ্, এভাবে বলিস না। তুই কোন গানটা শুনতে চাস, বল চুল্লু।

চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

সেদিন গুনগুন ধ্বনি শোনার পর ওরা পাঁচজন মার্চপাস্টের ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর ঘুরেছিল। বলেছিল, আমরা পারব। যিনি এই গানের কবি, তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। আমরাও জীবন-জয়ের সৈনিক হব।

আয়শা খাতুন ইসমাতের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওরা জীবন-জয়ের সৈনিক। ওদের হাতে লাল-সূর্যের পতাকা। তাদের মাথায় তুলে রাখার সাধ্য আমাদের নাই। ভারি তো এক কাপ চা আর দুই মুঠো ভাত খাইয়েছি—

আয়শা চোখে আঁচল চাপা দেন। ইসমাত বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে। মধ্যরাতে হিংস্র সেনাদের হাতে ধরা পড়া কতিপয় যোদ্ধার সঙ্গে পরিচয় ওদের বাকি জীবনের সঞ্চয়। এই সঞ্চয় ইতিহাসের। স্বাধীনতার গৌরবের। যদি বেঁচে থাকেন, তারা এই সঞ্চয়ের সাক্ষী হবেন। আয়শা ইসমাতকে জড়িয়ে ধরলে দুজনের নিঃশ্বাস দুজনের শরীরে বয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের স্পর্শ অনুভব করেন। এবং দুজনেই বলেন, আমরা রাত জেগে ওদের জন্য অপেক্ষা করব। পাকিস্তানি সৈন্যদের শত নির্যাতন আমাদের পিছিয়ে রাখতে পারবে না। বাড়ি আক্রান্ত হলেও আমরা ভীত নই।

আয়শা ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা ওদের জন্য জেগে থাকব। আমাদের কেউ মেরে শেষ করতে পারবে না।

ওরা যতই খুঁজে খুঁজে আমাদের দুর্গগুলো ভেঙে চুরমার করুক, আমরা নতুন দুর্গ গড়ব।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আবার শহরকে কাঁপাবে।

কথা বলতে বলতে নেমে যান আয়শা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আকমল হোসেন। দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও কেউ কেউ। আয়শা বাড়িটা দেখেন। একতলা বাড়িটার সামনে যোদ্ধারা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলত। দুর্গবাড়িটির একটি স্বাভাবিক ইমেজ রাখার জন্য। আয়শা দৃষ্টি ঘুরিয়ে আকমল হোসেনের দিকে তাকান।

চলো।

আপনারাও সাবধানে থাকবেন।

সাবধান! আকমল হোসেন সবার দিকে তাকান।

আমরা একটা ধাক্কা খেলাম না।

আমরা যা করছি তার থেকে তো পিছিয়ে যেতে পারব না। সাবধান শব্দটি আমরা সঙ্গেই রাখি। তার পরও দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

আপনারা না থাকলে ওরা সাপোর্ট পাবে কোথায়? অপারেশন চালানোর জন্য ওদের আশ্রয় দরকার। খোলা মাঠ থেকে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালিত হয় না।

আমরা আপনার কথা বুঝেছি। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আমরা যাই।

গাড়ি ছুটছে।

ছুটছে ঘরবাড়ি। মানুষ। গাছপালা।

ছুটছে চিন্তা এবং পরিকল্পনা।

আয়শা বলেন, আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

আমরা তো বাড়িতেই ছিলাম। এতক্ষণ আমরা যা দেখেছি, তার খতিয়ান করেছি।

আমরা কি বাড়িতে আছি?

এখনো আছি।

এবং থাকব।

ওরা যদি এই বাড়ি আক্রমণ করতে আসে?

আসবে।

ওরা যদি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায়?

যেতে হলে যাব।

আমি খুশিমনে যাব।

যদি বন্দিশালায় ওদের দেখা পাই, মনে করব, ঠিক জায়গায় এসেছি। যদি ওদের সঙ্গে কথা হয়, বুঝব, ভুল ঠিকানায় যাইনি। যদি ওদের সঙ্গে মৃত্যু হয়, মনে করব, স্বাধীনতা পেয়েছি।

বিষাদ এবং কষ্ট নিয়ে দুজনে শোবার ঘর ছাড়েন। কতক্ষণ আগে বাড়িতে ফিরেছেন, তা ভুলে যান। দুপুরের ভাত খাওয়া হয়নি, তা মনে থাকে না। ঘুম কী জিনিস, তা-ও ভুলে যান। রেস্ট শব্দটি তাদের জীবনপাতার কোথাও লেখা নেই। দুজনে মৃদু পায়ে বারান্দায় আসেন। দেখতে পান, আলতাফ গেট খুলে দিচ্ছে। মেরিনা রিকশা থেকে নামছে। ও বারান্দায় বাবা-মাকে দেখে বলে, আপনারা কখন ফিরলেন?

বেশ কিছুক্ষণ হলো।

আপনাদের সঙ্গে কথা আছে। আমি আসছি।

কোথায় গিয়েছিলি, মা?

আমি আসছি, আব্বা।

আকমল হোসেনের মনে হয়, ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

পাশাপাশি জেদি এবং একরোখা ভঙ্গি ওর ভেতরে কাজ করছে। আকমল হোসেন আর আয়শা খাতুন ড্রয়িংরুমে এসে বসেন। টেলিভিশন ছাড়েন।

খবরে দেখতে পান, নতুন গভর্নর হিসেবে শপথ নিচ্ছেন ডা. মালিক। তল্কালীন প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী তাকে শপথ পাঠ করান। দুদিন আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ডা. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন গতকাল। জামায়াতে ইসলামীর এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী সর্বশক্তি দিয়ে দেশের শত্রুদের দমনের ব্যাপারে নতুন গভর্নরকে সহায়তা করবে।

আকমল হোসেন খবরের এতটুকু দেখে নিজের পড়ার টেবিলে আসেন। সকালে খবরের কাগজ পড়া হয়নি। কয়েকটি সংখ্যা টেবিলের ওপর জমা করে রেখেছেন।

পত্রিকার পাতা উল্টাতেই দেখতে পেলেন, নতুন গভর্নর ডা, মালিকের ছবি ছাপা হয়েছে। নতুন সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি। তিনি পত্রিকা মুড়ে পাশে রাখলেন। খুললেন দৈনিক পাকিস্তান। একটি খবরের জন্য কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন; কিন্তু পত্রিকায় তেমন করে আসেনি। আজ সেই খবরের ওপরে চোখ আটকে গেল। লেখা হয়েছে—মরতে যখন হবেই, তখন দেশের জন্যই মরি। বিশ বছর বয়স্ক পাইলট রশিদ মিনহাজ গত ২০ আগস্ট পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একটি বিমানকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন।

তিনি মুখে মুখে শোনা খবরটির আরও বিস্তারিত জানার জন্য যে কাগজগুলো পড়া হয়নি, তার পাতা উল্টাতে লাগলেন। দেখলেন, কয়েক দিন ধরে কেবল রশিদ মিনহাজের বীরত্বের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। তাকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করার কথা আছে। কিন্তু কে বিমান হাইজ্যাক করলেন, তাঁর নাম নেই।

শেষ পর্যন্ত নাম পাওয়া গেল। তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ কে এম মতিউর রহমান। তিনি বিমান হাইজ্যাক করে ভারতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রশিদ মিনহাজের সাহসিকতার কারণে তিনি সে কাজটি করতে পারেননি। ভারতের সীমানায় পৌঁছানোর কয়েক মাইল আগে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। সরকার রশিদকে দিয়েছে সর্বোচ্চ বীরের খেতাব। আর মতিউরকে বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দার। তিনি পত্রিকা ভাঁজ করে পাশে রাখলেন। খুললেন দৈনিক পূর্বদেশ। পত্রিকায় বড় করে ছাপা হয়েছে বিশ্বাসঘাতকের নাম মতিউর রহমান।

আকমল হোসেন পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। একজন বীর বাঙালিকে একটি বাংলা ভাষার দৈনিক পত্রিকা এভাবে লিখতে পারে? পরমুহূর্তে তিনি নিজের ভাবনার সংশোধন করলেন। বাংলা ভাষার অসংখ্য মানুষই তো যুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হয়েছে। তাহলে শুধু একটি পত্রিকার ক্ষতের মতো শিরোনাম তাকে এমন পীড়িত করছে কেন? তিনি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সব পত্রিকা ভাঁজ করে ফাইলে রাখেন ইতিহাস লেখার জন্য। ইতিহাসের উপকরণ রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। তিনি জানেন না, ইতিহাস তিনি

লিখতে পারবেন কি না, কিন্তু উপকরণ সংরক্ষণ করে যেতে তো পারবেন। যুদ্ধের পাশাপাশি এই পারাটাও নৈতিক কাজ। তিনি মতিউরকে সর্বোচ্চ বীরের খেতাব দিয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে ডায়েরির পাতায় বড় করে লিখে রাখেন।

আয়শা এসে পাশে দাঁড়ালেন।

খাবে, চলো।

আকমল হোসেন ডায়েরি বন্ধ করলেন। কলমের মুখ আটকালেন।

ডায়েরিতে কী লিখেছ?

মতিউরের কথা। লিখেছি, বল বীর চির উন্নত মম শির। তোমার একটি গুনগুন ধ্বনি না হলে আমি আজ রাতে খেতেও পারব না, ঘুমোতেও পারব না।

চলো, একসঙ্গে গাইব।

আকমল হোসেন আয়শার ঘাড়ে হাত রাখেন। আয়শা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করেন গুনগুন ধ্বনি–

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করা দহন-দানো।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।।

মেরিনা কান খাড়া করে গুনগুন ধ্বনি শোনে। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে বাবা-মায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ছড়াতে থাকে সুর। আজ ওর মন ভালো নেই।

প্রবল দুশ্চিন্তায় ওর প্রতিটি মুহূর্ত আক্রান্ত। তার পরও গানের শক্তিতে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আয়শার কন্ঠ একা নয়, যুক্ত হয়েছে আকমল হোসেনের কন্ঠও—

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোঁটাক তারা নব নব
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে।।

মেরিনা মায়ের সুরের ধ্বনি শেষ হওয়ার আগে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। কোথাও না রেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ধরে রাখে।

আকমল হোসেন কাছে এসে মোমবাতি ওর হাত থেকে নিজে নিয়ে বলেন, আয় মা। তোর কথা শুনব এখন।

ডাইনিং টেবিলে বসে মেরিনা

ডাইনিং টেবিলে বসে মেরিনা প্রথমেই বলল, আমাদের পরিবারে যুদ্ধের আরেকটি ফ্রন্ট ওপেন হয়েছে, আব্বা।

ফ্রন্ট!

শব্দটি দুজনে একসঙ্গে উচ্চারণ করেন।

হ্যাঁ, আমি বলব যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট।

দুজনে আবারও একসঙ্গে বলেন, ফ্রন্ট।

মেরিনা এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে বলে, আপনারা ভাত খান। তার পরে শোবার ঘরে গিয়ে বলব। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি দুপুরের পর থেকে আর কোনো কিছু খাইনি।

আমরাও খাইনি। চা-ও না।

তাহলে তো পেটপুরে খেতে হবে এখন। আরেকটি নতুন ফ্রন্টে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে হবে না।

মেরিনা, ফিক করে হেসে বাবা-মায়ের দিকে তাকায়। দুজনেই চমকে ওঠেন। ওর বিষণ্ণ মুখের হাসি দেখে দুজনেই ভাবলেন, যেন মর্গের ভেতরে শায়িত কেউ। দুজনের ভাত খাওয়া মাথায় উঠল।

তাঁরা ভাত নাড়াচাড়া করলেন। মাছের টুকরো বোন-প্লেটে উঠিয়ে রাখলেন।

মেরিনা তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে, এভাবে খেলে আজ রাতে আমার না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে। আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে না।

আকমল হোসেন প্লেটের ওপর মাথা নামিয়ে গবগবিয়ে কয়েক গ্রাস মুখে পোরেন। আয়শা ভাতে ডাল মাখালেন। ডাল দিয়ে প্লেটের ভাত শেষ করেন।

মেরিনা নিজে ধীরেসুস্থে ভাত খায়। ভাত-মাংস শেষ করে। দুটুকরো ভাজা মাছও খায়। এক বাটি ডাল খায় স্যুপের মতো করে।

ওর দিকে তাকিয়ে আয়শার মনে হয়, মেয়েটি নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করেছে। ওর ভেতরে কোথাও কোনো ফাটল হয়েছে কিংবা কোথাও আগুন লেগেছে। ও নিজেকে সামলানোর চেষ্টায় আছে। দুজনের কেউই ওর দিকে না তাকিয়ে ঘরের এপাশে-ওপাশে তাকান। ভাবেন, আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ঠিকমতো শুনতে হবে।

মেরিনা যখন বাবা-মায়ের মুখোমুখি বসে, তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা বারোটার প্রান্ত ছাড়িয়েছে। ও সরাসরি বলে, আজ আমাকে নওশীন ফোন করেছে।

নওশীন? দু

জন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন।

নুসরাতের ভাই। সে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মনে হলো, এখন প্রবল দাপটে আছে।

কিছু বলেছে তোকে?

হ্যাঁ। আপনারা তো জানেন, ও একটা দুষ্টু ছেলে। চান্স পেলেই নিজের বোনকে বলত, আর্মির ক্যাম্পে দিয়ে আসব।

ওর বাড়াবাড়ির কারণে ওর বাবা-মা অন্যদের নিয়ে গ্রামে চলে গেছে। ও আমাকে দুটো কথা বলেছে। প্রথমে বলেছে মাজিয়ার কথা।

তোর বান্ধবী মাজিয়া?

হ্যাঁ, আম্মা। আমরা একসঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে আকাশে উড়িয়েছিলাম।

কী হয়েছে ওর?

নিউ মার্কেটের সামনে ওকে রিকশায় উঠতে দেখে নওশীন গিয়ে ওকে আটকায়। তারপর জোর করে টহলদার আর্মির গাড়িতে তুলে দেয়।

ওহ, গড!

আকমল হোসেন দুহাত চুলের মধ্যে ঢোকান। আয়শা খাতুন বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন। যেন নিজের মেয়ের চেহারা মনে পড়ছে না। ওকে চেনা যাচ্ছে না।

নওশীন বিকট হাসিতে ভরে দিয়েছিল টেলিফোন। বলেছিল, পতাকা বানানোর মজা বুঝিয়ে দিলাম ওকে। বুঝুক ঠেলা। পাকিস্তানের গায়ে হাত দেওয়া সহজ কথা না।

তুই এত কথা শুনলি, মা?

অনেক ধৈর্য ধরে, কষ্ট করে শুনেছি, আম্মা। আমার পুরো বিষয়টা বোঝার দরকার ছিল। ও কত দূর এগোতে চায়, তা দেখতে চাই।

রাগারাগি করিসনি তো?

প্রথমে করিনি। কৌশল হিসেবে রাগব না বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু পরে আর ধৈর্য রাখতে পারিনি।

কী বলেছে?

একটা গুন্ডার মতো কন্ঠস্বর বানিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছে, এইবার তুমি তৈরি হও, মেরিনা জাহান। তোমাকেও স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝিয়ে ছাড়ব। টের পাবে কত ধানে কত চাল।

কী বললি? আয়শা ছিটকে ওঠেন। এত বড় কথা বলেছে?

নওশীন নুসরাতের ছোট ভাই। ওদের বাড়িতে গেলে, দেখা হলে ও আমাকে আপা ডাকত। আজকে তুমি করে বলেছে, নাম ধরে বলেছে।

তুই কিছু বলেছিস?

আমিও চিৎকার করে বলেছি, তোকেও আমি দেখে নেব, শুয়োরের বাচ্চা। তারপর আমি ফোন রেখে দিয়েছি। ফোনটা পরে আবার বেজেছিল। আমি ধরিনি।

ওর কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে থাকেন আয়শা। আকমল হোসেন উঠে পায়চারি করেন।

আমি ভয় পাইনি, আম্মা। ও আমার সঙ্গে বদমাশি করতে এলে আমিও ছাড়ব না।

আয়শা খাতুন কথা না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মেয়ের দৃষ্টি পড়তে থাকেন। মেরিনা মাকে শান্ত করার জন্য বলে, আমি বিকালবেলা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। তিনটে ছোট-বড় ছুরি কিনে এনেছি। সব সময় আমার সঙ্গে রাখব। প্রয়োজনে সুযোগ বুঝে ব্যবহার করব। হয় পেট ফুটো হবে, নয়তো বুক।

ওর কথা শুনে আকমল হোসেন ফিরে দাঁড়ালেন।

কী বললি, মা?

আমি তো নওশীনকে ছাড়ব না, আব্বা। ওর পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বপ্ন আমার হাতে দুটুকরো হবে।

আমি ভাবছি, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাব। এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না।

আয়শা চোখ গোল করে আকমল হোসেনের দিকে তাকান। সমর্থন প্রত্যাশা করেন।

আকমল হোসেন ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন, না, সবাই ছাড়ব না। আমি একা থাকব আলতাফকে নিয়ে। তুমি আর মেরিনা যাবে।

তুমি থাকলে আমিও থাকব। আমিও বাড়ি ছাড়তে চাই না। এখনো এই বাড়িতে গোলাবারুদ-অস্ত্র আছে। এখনো এই বাড়িতে যখন-তখন ছেলেরা আসবে। খাবেদাবে,

ঘুমাবে, অস্ত্র নিয়ে সরে পড়বে। মারুফ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলবে, মা, আমি এসেছি। তুমি দেখো, গেরিলারা কেউ যদি মেলাঘরে যায়, তার সঙ্গে মেরিনাকে পাঠিয়ে দাও। ওরা ওকে বিশ্রামগঞ্জ ফিল্ড হাসপাতালে নার্সিংয়ের কাজে লাগিয়ে দেবে।

মেরিনা বাবা-মাকে সাহস দিয়ে বলে, আমি কাউকে পেলে মেলাঘরে যাওয়ার চিন্তা করব। তার আগে নওশীনকে মারব। তাহলে আমি শান্ত হব। বিশ্রামগঞ্জে হাসপাতালে আহতদের শুশ্রূষার কাজ করতে পারলে আমিও শান্তি পাব। আপনাদের এই বাড়ি ছাড়া ঠিক হবে না।

দুজনে একসঙ্গে বলেন, মেরিনা ঠিকই বলেছে। আমাদের সিদ্ধান্ত এটাই হোক।

রাতে ঘুমোলেও যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট সকাল থেকে আকমল হোসেনকে ভাবিত করে। মেরিনাকে তার বোনের বাড়িতে দিয়ে আসবেন, নাকি ওর নানার বাড়িতে পাঠাবেন। বাবার প্রস্তাব শুনে মেরিনা কোথাও যেতে রাজি হয় না। ওর এক কথা, হয় মেলাঘরে যাব, নয়তো এই বাড়িতে থাকব। আমাকে ধরতে এলে একটাকে মেরে মরব। কাউকে না মেরে আমি এই দুনিয়া ছাড়ব না।

আকমল হোসেনের মনে হয়, মেয়ের জেদের সঙ্গে তিনি পারবেন না। দুদিন পর চেনা আস্তানা খোঁজ করেন। কোথাও কেউ নাই। যারা পেরেছে নদী পার হয়ে চলে গেছে। যারা ঢাকায় আছে, তারা সবাই আস্তানা বদল করেছে। কেউ কারও খবর বলতে পারছে না। আশরাফ বলে, একসঙ্গে কয়েকজন গেরিলা ধরা পড়ল, এত বড় একটা বিপর্যয়ের পর শহর নীরব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ নীরবতা কয়েক দিনের জন্য মাত্র। আবার ফুটবে বোমা, পুড়বে পেট্রল পাম্প-পাওয়ার স্টেশন, গুলিবিদ্ধ হবে শত্রুসেনারা কিংবা তাদের দোসররা।

আকমল হোসেনও তা-ই মনে করেন।

খবরের কাগজ খুলে বসলে দেখতে পান, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে।

শির দেগা, নাহি দেগা আমামা—এই স্লোগান দিয়ে দিবস উদযাপন করা হবে। প্রতিরক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে শুরু হবে সভা-সমাবেশ। মিছিল। আকমল হোসেন কাগজ ভাঁজ করে রেখে উঠে পড়েন। ফার্মগেটের বাড়ির ভাড়া দিতে হবে। ছেলেদের খোঁজ নিতে যাবেন। ড্রয়িংরুমে আসতেই ফোন বাজে।

অপর প্রান্তে নওশীন।

হ্যালো, আমাকে মেরিনাকে দেবেন।

তুমি কে, বাবা?

আমি নওশীন। মেরিনাকে দিন।

মেরিনাকে কেন চাইছ? ওর সঙ্গে কী দরকার?

ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে। আমি ওকে চাই। আপনি ফোন দেন।

ও বাড়িতে নেই। ও ওর খালার বাসায় আছে।

মিথ্যা কথা বলবেন না। আমি জানি, ও বাড়িতে আছে। আজ বের হয়নি। আমাদের লোক আপনার বাড়ির ওপর নজরদারি রাখে।

ওহ্, মাই গড।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনি না সাহসী বীরযোদ্ধা। দেশকে স্বাধীন করবেন বলে জানপ্রাণ দিয়ে খাটছেন। আপনার পরিবারকে ধরে...

আকমল হোসেন ফোন রেখে দেন। আয়শা এসে ওটা ক্রেডলে না রেখে পাশে রাখেন। মেরিনাও বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আকমল হোসেন বলেন, তোমাকে অন্য জায়গায় যেতেই হবে, মা। বুঝতে পারছি, ও মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর্মির কাছে নিজের বাহাদুরি দেখাবে।

আয়শা বলেন, যাও মা, ছোট একটা ব্যাগ রেডি করে নাও।

মেরিনা কথা না বলে বের হয়ে যায়। থম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার পাশে। একসঙ্গে এত মুক্তিযোদ্ধা দেখার পর এমন একজন রাজাকার দেখতে হবে—এটা ও ভাবতেই পারে না। ক্রোধ ওকে উত্তেজিত করে। যে ছুরিটা কিনেছে, সেটা ওর বুকে বেঁধানো উচিত। হোক ও বান্ধবীর ভাই, তাতে কিছু যায়-আসে না।

সেদিন বিকেলে কেঁদেকেটে বাড়ি তোলপাড় করে আলতাফ। ওর সঙ্গে কাঁদে মন্টুর মা। খবরটা প্রথমে মন্টুর মা-ই দেয় সবাইকে।

কাঁদতে কাঁদতে বলে, আলতাফের বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে।

কী খবর এসেছে? ওর বাবা ভালো আছে তো? বাড়ির অন্যসব খবর ভালো?

অত কিছু জানি না। শুনেছি ওর ভাই মারা গেছে।

ওর তো পাঁচ ভাই। কোন ভাই মারা গেল? যে

ভাইটা রাজাকার হয়েছিল।

মন্টুর মা চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।

আয়শা বলে, বোধ হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা গেছে। পাকিস্তানি আর্মি তো আর ওকে মারবে না।

হতে পারে। ঠিকই বলেছ। অথবা কোনো অসুখেও মারা যেতে পারে।

জওয়ান ছেলের আবার অসুখ কী!

আয়শা বিরক্তির সঙ্গেই বলেন। আকমল হোসেন নিজের মনে হাসেন। ভাবেন, সময়টাই এমন। এখন কোনো লোক অসুখে মরবে না। সবাই মরবে গুলিবিদ্ধ হয়ে কিংবা বিস্ফোরণে। হয় শত্রুপক্ষের, নয়তো মুক্তিবাহিনীর হাতে। মৃত্যুর উত্তর বড় সহজ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যায় পুরো খবরটা আলতাফ জানাল।

মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। আমার ভাই পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধে ছিল। মুক্তিসেনার গুলি খেয়েছে। ছয়জন পাকিস্তানি সেনা মরেছে। মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে দুজন।

তোমার বাবার খবর কী?

বাবা ভালোই আছেন।

আলতাফ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একদিন দেশ স্বাধীন হবে। গাঁয়ের লোকে ওর নামে ধিক্কার দেবে। কেউ বলবে না যে, ও শহীদ হয়েছে। দেশের জন্য শহীদ হওয়ার ভাগ্য ওর ছিল না।

একসময় হাউমাউ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে, এই মরণ ওকে মরতে বলেছে কে? ওহ, আল্লারে, এর চেয়ে ও যদি নদীতে ডুবে মরত, তাও সান্ত্বনা পেতাম। আল্লায় আমারে এমন কষ্ট দিল ক্যান? ও আল্লারে।

মেরিনা এসে সামনে দাঁড়ায়।

থামেন তো। ও কি একটা মানুষ, তার জন্য আবার কান্নাকাটি!

আলতাফ চোখ মুছতে মুছতে বলে, ছোটবেলায় একসঙ্গে বড় হয়েছি না। ও আমার পাঁচ বছরের ছোট ছিল। কত কোলে নিয়েছি। এক থালায় ভাত ভাগ করে খেয়েছি। নিজের কথা নিজে ভুলব কেমন করে?

থামেন, বললাম। থামেন। এমন ছোটবেলা সব্বার আছে। এই ছোটবেলা নিয়ে কথা বলার কিছু নাই।

আলতাফ হা করে তাকায়। তারপর উঠে চলে যায়। বুঝতে পারে, মেরিনার মেজাজ খারাপ। মেরিনা ওর সঙ্গে এমন করে কথা বলে না। আজ তার অন্য কিছু হয়েছে।

ওর সঙ্গে মেজাজ করছিস কেন, মা? বাস্তব অবস্থা মানতে হবে।

আমার মেজাজ খারাপ, কারণ আমাকে ছোট একটা ব্যাগ গোছাতে হয়েছে। আমাকে বেশি প্রশ্ন করবেন না আপনারা।

আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন ওকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারেন না।

ও নিজেই আবার গলা উঁচিয়ে বলে, একজন রাজাকারের হুমকি-ধমকিতে আমার ব্যাগ গোছাতে হয়েছে। আমি এই দুর্গবাড়ি ছেড়ে সাধারণ বাড়িতে যেতে চাই না। তাহলে আমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকব।

মা, কিছুদিন থাক। তারপর আবার আসবে।

না, আমি এক দিনও অন্য কোথাও থাকতে চাই না। ঠিক আছে, আমি আপনাদের কথামতো ব্যাগ গুছিয়েছি। তবে ছুরি দুটো ব্যাগে দিইনি।

কোথায় রেখেছ?

এই যে, দেখো।

ও কোমরে গুঁজে রাখা ছুরি দুটো দেখায়। চমকে ওঠেন আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন।

এখনই কোমরে গুঁজেছ কেন? বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে খুঁজলেই হতো।

প্র্যাকটিস করছি। হঠাৎ করে খুঁজলে অসুবিধা ফিল করতে পারি। কোমরে খুঁজে হাঁটছি, বসছি এবং শুয়েও দেখেছি। তেমন অসুবিধা দেখছি না। তবে বেকায়দা হলে আমার পেটেও ঢুকে যেতে পারে।

খিলখিল করে হাসে মেরিনা। ওকে হাসতে দেখে আবার চমকে ওঠেন দুজনে। হাসতে হাসতে মেরিনা বারান্দায় যায়। সেখান থেকে সামনে নামে। গাছ থেকে একটি জবা ফুল ছিঁড়ে চুলের ক্লিপে গেঁথে রাখে। দু-এক লাইন গান গাইবার চেষ্টা করে। মন ভালো থাকলে ও গান গায়। আয়শা খাতুনের আফসোস যে, মেয়েটা ঠিকমতো গান শিখল না। শিখলে ভালো গাইতে পারত। ওর গানের গলা দারুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দু-একবার গেয়েছিল। দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল। তার পরও ঠিকমতো শেখা হলো না ওর। আজ ও নিজের বাড়ির প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে গাইল

হৃদয় আমার প্রকাশ হলো অনন্ত আকাশে।
বেদন বাশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে।।

কিছুক্ষণ গাইলে আলতাফের কান্না বন্ধ হয়ে যায়। ও ঘরের বাইরে এসে চৌকাঠের ওপর বসে থাকে। একমনে গানটি শোনে। ও জানে, মেরিনা সব সময় গান গায় না। আজ তার মেজাজ খারাপ। তার পরও গাইছে।

ঘরে আয়শা খাতুন সোয়েটার বুনছিলেন। হাত থেমে যায়। উল আর কাঁটা এক হয় না। আকমল হোসেন নিজের টেবিলে বসে পত্রিকার পাতা উল্টান। বিভিন্ন নিউজে চোখ আটকে যায়। তার পরও নিউজের ভেতরে ঢুকতে পারেন না। হেড লাইন পড়ে ছেড়ে দেন।

সবশেষে চোখ পড়ে একটি খবরে—কোম্পানীগঞ্জের বামনিবাজারে আর্মি ও রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করে। চৌদ্দ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। আহত হয় বেশ কয়েকজন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে আটক করে আর্মি ও রাজাকাররা।

তিনি কাগজ রেখে বাইরে আসেন। দেখলেন, মেরিনা নেই। ও ঘরে চলে গেছে। ওর ঘরের দরজার সামনে ছোট ব্যাগটি রাখা আছে। তিনি ভাবলেন, কাল সূর্য ওঠার আগেই তিনি মেরিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। ওর নানার বাড়িতে রেখে আসবেন। ওখান থেকে কারও সঙ্গে মেলাঘরে চলে যাবে।

রাত দশটার দিকে তিনটি মিলিটারির গাড়ি আসে বাড়ির সামনে। দূর থেকে আর্মির গাড়ি গেটের সামনে থামতে দেখে আলতাফ হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢোকে।

ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বলে, স্যার, গাড়ি। গাড়ি।

কার গাড়ি?

আর্মির।

ততক্ষণে বুটের পদাঘাতে থরথর করে কাঁপে লোহার গেট।

আকমল হোসেন আলতাফের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, যাও, গেট খুলে দাও।

আলতাফ চলে যায়। ওকে পাশ কাটিয়ে বাবা-মায়ের ঘরে ঢোকে মেরিনা।

তাহলে ওরা এসে গেছে? নওশীনও এসেছে কি?

আলতাফ গেটের তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজন। কিল-ঘুষি-লাথি দিয়ে ফেলে দেয় ওকে। ও পড়ে থাকে গেটের পাশে।

আকমল হোসেন বারান্দার দিকে এগিয়ে যান। ক্যাপ্টেনসহ সেপাইরা ততক্ষণে বারান্দায় এসে উঠেছে। পেছনে নওশীন। ওরা আকমল হোসেনকে প্রথমে রাইফেলের বাট দিয়ে পিঠে আঘাত করে। তারপর জিজ্ঞেস করে, মুকুত কিধার? আর্মস-অ্যামুনিশন কিধার?

আকমল হোসেন চুপ করে থাকেন।

ওরা একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে আবার বলে, বাত কিউ নেহি বোলতা?

আবার রাইফেলের বাটের বাড়ি পড়ে। আকমল হোসেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। উঠতে পারেন না।

একজন ক্যাপ্টেন সেপাইদের দিকে তাকিয়ে বলে, গো, সার্চ।

দুপদাপ করে এগিয়ে যায় ওরা।

ততক্ষণে মেরিনাকে রেডি করে ফেলেছেন আয়শা খাতুন। আলমারির ভেতর থেকে একটি টাইম বোমা বের করে মেরিনার ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। একই সঙ্গে টাইম ফিক্স করে দেন।

ওরা যতজন এসেছে, শুধু ছুরি দিয়ে হবে না। বড় অস্ত্র লাগবে।

বুঝেছি। মেরিনা শক্তই থাকে। নওশীনের ফোন পাওয়ার পর থেকে অনেক বোঝাপড়া হয়েছে নিজের সঙ্গে। এখন ও আর ভীত নয়। শক্তভাবেই মনে করে, ওরা শরীরে হাত দেওয়ার আগেই সুইসাইড স্কোয়াড হওয়া জরুরি। গাড়িতে যতগুলো থাকবে তার সবগুলো মরবে। হাহ, প্রিয় স্বাধীনতার জন্য নিজেকে তৈরি করে, মেয়ে। ও বুকের ওপর সুতির শাড়ি ভাঁজ করে বোমাটা খানিকটা আড়াল করার চেষ্টা করে। আয়শা খাতুন নিজের পছন্দের একটা কাশ্মীরি শাল মেয়ের গায়ে জড়িয়ে দেন।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলেন, পারবি না, মা?

পারব। আমি পারবই। আমার জন্য ভাববেন না।

আমি জানি, তুই পারবি।

বোমার ওপর হাত রাখেন আয়শা খাতুন। বিদায়, আম্মা।

বিদায়! বিদায়! বিদায়!

আয়শা খাতুন চমকে মেয়ের দিকে তাকান।

বিদায়ই তো, আম্মা। আর দেখা হবে না। কোনো দিনই না।

ঘরে এসে দাঁড়ায় সেপাইরা। পেছনে নওশীন। ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা মা-মেয়ে একসঙ্গে বলেন, স্টপ। থাম।

পেছন থেকে নওশীন এগিয়ে এসে বলে, খুব সাহস দেখাচ্ছ। ছ্যাঁচা খেয়ে ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি বেশি কথা বলবে না, নওশীন। তুমি একটা বেইমান। বিশ্বাসঘাতক।

তবে রে। বড় বড় বুলি আওড়াতে শিখেছ। স্বাধীনতার পাছায় লাথি মারি।

নওশীন সেপাইদের ইঙ্গিত করলে ওরা এগিয়ে আসার আগেই আয়শা খাতুন মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, ভদ্র ব্যবহার কর, নওশীন। কী করতে হবে, বল।

ওকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

ঠিক আছে, যাবে। যাও, মা।

সেপাইদের দিকে আঙুল তুলে বলেন, ডোন্ট টাচ হার।

মেরিনা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

এতক্ষণ ধরে বাড়িঘর তছনছ করেছে সেপাইরা। জিনিসপত্র চারদিকে ছুড়ে মেরেছে। তোশক-বালিশ-সোফার কভার, কুশন ছিন্নভিন্ন করে বাড়িতে তুলো উড়িয়েছে। আসবাবপত্র উল্টে ফেলেছে। সবই দেখে মেরিনা। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট। নিজের অজান্তেই নিজের হাত টাইম বোমার ওপর চলে যায়। মারুফ ওকে যুদ্ধের শুরুতেই গ্রেনেডের পিন খোলা শিখিয়েছে। আজ ওর সেই চরম পরীক্ষা। তবে গ্রেনেড নয়, টাইম বোমা।

ও ড্রয়িংরুমে আসতেই ক্যাপ্টেন দন্ত বিকশিত করে বলে, আইয়ে। বহুত যুব সুরত।

সেপাইগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। পা দাপায় না বা রাইফেল তাক করে না। ক্যাপ্টেন মেরিনার পাশাপাশি হাঁটে, যেন এই মুহূর্তে মেরিনা সম্রাজ্ঞী। ওরা তার আজ্ঞাবহ দাস। এমন এক ভঙ্গি ওদের আচরণে। কারণ, সে ধরে নিয়েছে যে আর অল্পক্ষণ পরই এই সম্রাজ্ঞী তার হাতের মুঠোয় আসবে। কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধান মাত্র। তার উত্তেজনা অনেক কষ্টে দমন করে রাখে।

ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এলে মেরিনা দেখতে পায় আকমল হোসেনকে। বারান্দার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শরীরে রক্ত। মারের চোটে নাক-ঠোঁট-ঘাড়সহ বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। ও ছুটে বাবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ক্যাপ্টেন হাত দিয়ে বলে, নো। ইধার নেহি, উধার।

ক্যাপ্টেন সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়।

মেরিনা যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই আর্তচিৎকার করে, আব্বা। আকমল হোসেন সাড়া দেন না।

আপ চলিয়ে।

আব্বা, আব্বা। বাবার সাড়া নেই। বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছেন।

আবার পা বাড়াতে গেলে ক্যাপ্টেন বাধা দেয়।

নেহি। ইধার।

ক্যাপ্টেন মেরিনার হাত ধরে টেনে আনে। ওকে আর কোনো সুযোগ দেয় না। একজন পিঠের ওপর রাইফেলের নল লাগিয়ে রাখে। পেছন ফিরে তাকানোরও সুযোগ নেই। ওর মনে হয়, এখন সোজা হেঁটে গাড়িতে ওঠাঁই উচিত। টানাহেঁচড়া করলে বোমাটা পড়ে যেতে পারে। ও মুহূর্তে সতর্ক হয়।

গাড়ি সরে যায় গেটের সামনে থেকে। আড়ালে লুকিয়ে থাকা মন্টুর মা ছুটে এসে গেট আটকায়। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আয়শা খাতুন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিনিসের পাশ কাটিয়ে আকমল হোসেনের কাছে আসেন। মাথা তুলে ধরতেই বুঝতে পারেন জ্ঞান হারিয়েছেন।

চিৎকার করে ডাকেন, আলতাফ, মন্টুর মা।

আলতাফ ততক্ষণে নিজে নিজে উঠেছে। মার খেয়ে জ্ঞান হারায়নি ও। ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল। তার পরও যাবার সময় একজন পিঠে লাথি দিয়েছিল।

বলেছিল, শালা গাদ্দার।

আয়শা খাতুনের চিৎকার শুনে আলতাফ বারান্দায় উঠে আসে। আকমল হোসেনকে পড়ে থাকতে দেখে নিজের শরীরের অসহ্য যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়। মন্টুর মা গ্লাসে করে পানি নিয়ে আসে।

আয়শা খাতুন পানি দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেন। ঠোঁটে পানি দিলে সে পানি গড়িয়ে পড়ে যায়। তিনি বলেন, ঘরে নিয়ে চলো।

তাঁকে ধরে ওঠানোর চেষ্টা করার সময় তিনি নড়ে ওঠেন। চোখ খোলেন। বলেন, পানি খাব।

পানি খেয়ে তিনি চারদিকে তাকান। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করেন। সবাই মিলে তাকে সাহায্য করে। তিনি উঠে বসেন। বলেন, ওরা আমার ঘাড়ে মেরেছিল। আরও অনেক জায়গায়। আমার কিছু মনে নেই।

চলো, তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই।

তোমাকে ওরা মারেনি তো, আশা?

না, আমাকে মারেনি।

আমার মা কোথায়? আমার মেরিনা?

যুদ্ধের নতুন ফ্রন্টে গেছে।

ফ্রন্টে? ও বাড়িতে নেই তাহলে?

জানো, ও খুব সাহসী ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আব্বা, আব্বা করে খুব ডেকেছিল।

ডাকবেই তো। ও তো আমারই অংশ।

তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে।

সবাই চমকে পরস্পরের দিকে তাকায়। রাস্তায় মানুষের হইচই শোনা যায়। আকমল হোসেনের মনে হয়, তার গায়ে পুরো শক্তি ফিরে এসেছে। তিনি আয়শা খাতুনের দিকে তাকান।

মেয়েটাকে টাইম বোমা দিয়েছিলে?

দিয়েছিলাম।

তাহলে যুদ্ধের নতুন ফ্রন্টে ও জয়ী হয়েছে।

মুহূর্ত সময় মাত্র। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে থাকে পুরো পরিবার।

রাতের মধ্যপ্রহর শেষ হয়েছে।

শেষ রাতে আকমল হোসেন বিছানায় উঠে বসেন। দেখতে পান, ঘরে আয়শা খাতুন নেই। বিছানা থেকে নামলেন। দেখলেন, বাথরুমে নেই। বিছানায় শোয়ানোর সময় আয়শা তাকে পেইন কিলার দিয়েছিলেন। শরীরের ব্যথা খানিকটা কমেছে। মাথা টলছে। তার পরও পা বাড়ালেন। আয়শা কোথায় দেখতে হবে। মেরিনার ঘরে কি?

ঠিকই ধরেছেন। একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছেন আয়শা। পুরো ঘর তছনছ করা। কাপড়চোপড়-বইপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তিনি পাশ কাটিয়ে আয়শা খাতুনের পাশে গিয়ে বসলেন।

উঠলে কেন? শরীর ঠিক আছে?

তোমার কাছে এসেছি, আশা।

বসো। এসো। আমার হাত ধরো।

আকমল হোসেন স্ত্রীর পাশে বসেন। বুঝতে পারেন, বুক ভেঙে যাচ্ছে। বুঝতে পারেন, মাথা সোজা করে রাখা কঠিন হচ্ছে। চোখের জল সামলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আয়শা মৃদু স্বরে বলেন, শহীদের জন্য আমরা শোক করব না।

ওর জন্য গৌরব বোধ করব।

আকমল হোসেন দুহাতে বুক চাপড়ান।

আয়শা হাত টেনে ধরেন।

এখন মাতমের সময় নয়।

আমি জানি, শোককে শক্তি করার সময়। সামনে আমাদের অনেক কাজ।

ওর জন্য আমরা কুলখানি করব। মিলাদ হবে। ফকির খাওয়াব। কোরআন খতম হবে।

হ্যাঁ, সবই হবে।

শহীদের স্মরণে তোমার একটি গুনগুন ধ্বনি হবে না, আশা?

আমি এতক্ষণ সেই শক্তি পাচ্ছিলাম না। তোমাকে পেয়ে আমার মধ্যে শক্তি ফিরে এসেছে।

আকমল হোসেন দুহাতে আয়শাকে বুকে টানেন। তাঁর মাথার ওপর নিজের থুতনি রেখে বলেন, আয়শা, তুমি আমার মধ্যে শক্তি ভরে দাও। আমি যেন শহীদ মেয়েটির স্মৃতি বুকে নিয়ে কিছুকাল বেঁচে থাকি। আয়শা খাতুন সুর করেন–

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।
তবু প্রাণ নিত্যধারা,
হাসে সূর্য চন্দ্র তারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ ওঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফোটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ,
নাহি নাহি দৈন্যলেশ—সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।

শেষের লাইনটি আকমল হোসেন নিজেও গুনগুন স্বরে গাইতে থাকেন। আবার প্রথম লাইন গান দুজনে—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

আকমল হোসেন নিজেকে সামলাতে পারেন না। আয়শা খাতুন তাকে শান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পঙক্তিতে যান—তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগো কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তি গাওয়ার পর আয়শা খাতুন নিজেও কাঁদতে শুরু করেন।

এই প্রথম তার গুনগুন ধ্বনি কান্নার শব্দে মিশে যায়। দুজনের কন্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়—

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ
নাহি নাহি দৈন্যলেশ...।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ক্ষয় নেই, শেষ নেই। স্বাধীনতার অনন্ত বাণী ছড়াতে থাকে আকাশে। দুজন মানুষ দেয়ালে পিঠ ঠেকান, মাথা ঠেকান। রাত শেষ হয়। দিনের প্রথম আলো ছড়ায় চারদিকে।

ঘরের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে আলতাফ। পেইন কিলার খাওয়ার পরও শরীরের ব্যথা কমেনি। তার পরও উঠে কোথাও যেতে পারে না। গত রাতে বাড়িটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়েছে। নতুন এই যুদ্ধক্ষেত্র তার জন্য চ্যালেঞ্জ।

রান্নাঘরে বসে থাকে মন্টুর মা। পুরো রান্নাঘর তছনছ হয়ে আছে। কেরোসিনের চুলা ভেঙে দিয়েছে। রান্না করতে হলে নতুন চুলা আনতে হবে। কাচের প্লেট-গ্লাস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। গত রাতে এই বাড়িতে যুদ্ধ হয়েছে।

একটি মেয়ে শহীদ হয়েছে।

ও মা গো, ও আল্লাহরে—

হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে মন্টুর মা। মাঝেমধ্যে সুর করে বিলাপ করে। কপাল আছড়ায়। ওর বিলাপের নানা কথা ছড়াতে থাকে বাড়িতে। আকমল হোসেন আর আয়শা খাতুন সোজা হয়ে বসেন। বিলাপের নানা কথা তাঁদের কাছে পৌঁছে যায়। দুজন আবার স্তব্ধ হয়ে পড়েন। স্মৃতিভরা এমন অজস্র কথা তো তাঁদেরও আছে। আমৃত্যু তারা এই সব কথা স্মরণ করবেন। এখন যুদ্ধ।

দুজনে উঠে মন্টুর মায়ের কাছে আসেন। আয়শা খাতুন তার পাশে বসে বলেন, থামো, মন্টুর মা। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে।

বাড়ি তো যুদ্ধের ময়দান হয়েছে।

হবেই। আমাদের চারদিকে যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের ময়লা এখন আবার সরাব।

অ, তাই তো। রান্নাঘরের ময়লা আমি একাই সরাতে পারব। এইটা কি আমার যুদ্ধ?

হ্যাঁ, তোমার যুদ্ধ।

ততক্ষণে আলতাফও বাড়ি পরিষ্কার করার কাজে লেগেছে। মাঝেমধ্যে বসে দম নিচ্ছে। চারদিকে তাকাচ্ছে। মাথা চাপড়াচ্ছে। আকমল হোসেন কাছে এলে আলতাফ বলে, আপনি কোথাও যাবেন, স্যার?

কোথায়? সেই রাস্তার ধারে। যেখানে জিপটা উল্টে গেছে।

না, শুধু উল্টে যায়নি। পুড়েছে। টুকরো টুকরো হয়েছে।

আলতাফ গভীর আগ্রহ নিয়ে বলে, সেখানে যাবেন, স্যার?

হ্যাঁ, যাব। শুধু তুমি আর আমি।

আকমল হোসেন পেছন ফিরে দেখলেন আয়শা রান্নাঘরে। তিনি আলতাফকে ইশারা করলেন। দুজনে গেট খুলে দ্রুত বের হলেন।

মাথার ওপর সূর্য। চারদিকে ঝকমকে রোদ।

তাঁরা ঘটনার জায়গায় পৌঁছাতে পারলেন না। অনেক দূর জুড়ে রাস্তা ঘিরে রেখেছে মিলিটারি পুলিশ।

দুজনে শিরীষগাছের নিচে দাঁড়ালেন। আকমল হোসেন পরক্ষণে আলতাফের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো, ফিরে যাই। আমাদের যুদ্ধ তো শেষ হয়নি।

দুজনে দ্রুত পায়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আলতাফ বলে, স্যার, আপনি তো বললেন আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি।

বলেছি। ঠিকই তো বলেছি।

ওরা এই বাড়িতে আবার আসতে পারে। তাহলে আপনি এই বাড়ি থেকে চলে যান।

না। এটা দুর্গবাড়ি। এখানে এখনো অস্ত্র আছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা আসবে।

ওরা যদি এসে আপনাদেরকে ধরে নিয়ে যায়? তখন কী করবেন? আমরা চাই না এমন কিছু ঘটুক। আপনারা চলে যান। বাড়ি আমি একা পাহারা দেব।

না, তা হবে না। ধরে নিয়ে গেলেও আমি বাড়ি ছাড়ব না। এই বাড়ি থেকে আমার মেয়ে বেরিয়ে গেছে। এই বাড়িতে এখনো আমার ছেলে ফেরেনি। আমি বাড়িতে থেকেই শেষ দেখতে চাই রে, আলতাফ।

দুজনে গেটের ভেতরে ঢুকলে দেখতে পায় আয়শা খাতুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সিঁড়িতে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় গিয়েছিলে?

সেই জায়গায়। মেয়েটার হাড়গোড় খুঁজতে গিয়েছিলাম।

বুঝেছি। চলো, ঘরে চলো। আমাকে না বলে চলে গেলে কেন?

আকমল হোসেনের হাত ধরে আয়শা বলেন, তোমার গায়ে জ্বর দেখছি।

কখন জ্বর এল, টের পাইনি তো।

পেয়েছ ঠিকই। আমায় লুকাচ্ছ। ডাইনিং টেবিলে এসো। তোমাকে একটা নোভালজিন দিচ্ছি।

না, নোভালজিন লাগবে না। আমি ঘরে যাচ্ছি। আমি ঠিক আছি, আশা।

আকমল হোসেন দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে যান। আয়শা পিছু পিছু যেতে পারেন না। তাঁর মনে হয়, মানুষটা নিজেকে সারানোর সময় চাচ্ছে। তাকে ডিসটার্ব না করাই উচিত।

আয়শা খাতুন চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকেন। জানেন, যেকোনো সময় আর্মির গাড়ি এ বাড়িতে আবার আসবে। আসুক, তিনি নিজেকে বলেন—আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ।

দুদিন পর এক সন্ধ্যায়

দুদিন পর এক সন্ধ্যায় স্কুটার নিয়ে এ বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায় নাজমুল। ওকে দেখে গেট খুলে দেয় আলতাফ। ও উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, আঙ্কেল কই?

ড্রয়িংরুমে।

জয় বাংলা মামণি কেমন আছে? কথা বলছ না যে? তোমারই বা কী হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

আলতাফ উত্তর দেয় না। নাজমুল দুই লাফে সিঁড়ি পার হয়ে ড্রয়িংরুমে ঢোকে। আকমল হোসেন ও আয়শা খাতুন টেলিভিশন দেখছিলেন। ওকে দেখে সুইস অফ করেন।

এসো, বাবা।

আমি বসব না। স্কুটার দাঁড় করিয়ে রেখেছি। মারুফ ভাই পাঠিয়েছে আমাকে।

মারুফ? মারুফ কোথায়?

ঢাকায় নেই। মেলাঘরে। আমাকে বলেছে মেরিনা আপাকে নিয়ে মেলাঘরে যেতে।

তুমি বসবে? বসো না একটু।

ফ্যাসফ্যাস করে আয়শা খাতুনের কন্ঠস্বর। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

জয় বাংলা মামণি, আমার বসার সময় নেই। সবাই অপেক্ষা করছে। মেরিনা আপাই কেবল বাকি। আমরা গেলেই...

দুজনকে মুখ ঢাকতে দেখে চারদিকে তাকায় নাজমুল। ঘরের লন্ডভন্ড অবস্থা দেখে কিছু আঁচ করে। বাইরে এসে আলতাফের ঘাড়ে হাত রেখে ঝাকুনি দেয়।

কী হয়েছে? খুব তাড়াতাড়ি বলেন। আমার সময় নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

আলতাফ দ্রুত কন্ঠে সব কথা বলে দেয়। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নাজমুলের চোখ। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বলে, শাবাশ! মেরিনা আপা এত বড় যুদ্ধ করেছে। শাবাশ। খবরটা সবাইকে পৌঁছাতে হবে। গেলাম।

স্কুটার ছাড়ার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকে আলতাফ। তারপর গেট বন্ধ করে। গেটে পিঠ ঠেকিয়ে দম নেয়। আগামীকাল এ বাড়িতে মিলাদ। ফকির খাওয়ানো হবে।

তিন দিন পর সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে মারুফ।

ছেলেকে দেখে দুজনই চমকে ওঠেন।

মারুফ, তুই? আয়শা খাতুন আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেন। মারুফ মাকে ব্যাকুল শোকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকমল হোসেন ছেলের ঘাড়ে মুখ রেখে নিজের চোখের জল সামলান। মারুফ বাবার ঘাড়ে মাথা ঘষে, আবার মায়ের বুকে আশ্রয় নেয়।

এই মুহূর্তে এই বাড়িতে সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে। এক-একটি মুহূর্ত অনন্তকাল হয়ে যায়।

বাবা-মা দুজনে ছেলেকে নিয়ে মেরিনার ঘরে আসেন। মারুফ বলেছে, এই বাড়িটা এখন একটা বিপজ্জনক জায়গা জেনেও আমি এসেছি, আব্বা-আম্মা। ওর ঘরে একটি মোমবাতি জ্বালাতে এসেছি।

তুই মেলাঘর থেকে কবে এলি?

আজই দুপুরে এসে পৌঁছেছি।

কবে যাবি? কা

লকে যাব। নাজমুলের কাছ থেকে খবরটা শোনার পরে অনেকে আমাকে এই বাড়িতে আসতে না করেছে। আমি অনেকক্ষণ এই বাড়িকে নজরে রেখে তার পরে ঢুকেছি। সতর্কতার সঙ্গে এসেছি, আব্বা।

মেরিনার ঘরে আলো জ্বলছিল। সারা রাত এই ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখেন আয়শা খাতুন। রান্নাঘর থেকে একটি মোম জ্বালিয়ে নিয়ে আসেন তিনি। মারুফের হাতে দেন। মারুফ খাটের ওপর মেরিনার মাথার কাছে কতগুলো বই রেখে তার ওপর মোম রাখে। নিচে বসে কাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে রাখে ও।

আয়শা খাতুন নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘরের ভেতরে গুনগুন ধ্বনি ছড়ায়—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে। তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে...।

আকমল হোসেন নিচু হয়ে ছেলেকে টেনে তোলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ও। আয়শা খাতুন আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মোছেন, ছেলের চোখ মোছেন। পুরো পরিবার একটি মোমের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবেন, তাদের মেয়েটি মরে যায়নি। ও এখন একটি প্রজ্বলিত আগুনের শিখা।

সময় ফুরোয়।

মারুফ বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি এখন যাই।

আয়শা খাতুন ওর হাত ধরে বলেন, আমাদের সঙ্গে খেয়ে যা। তোকে বেশিক্ষণ আটকাব না।

ডাইনিং টেবিলে আবার নিস্তব্ধতা।

ঠিকমতো খেতে পারে না কেউ। খাবার মুখে ওঠানো কত যে কঠিন কাজ, এ কাকে বলে বোঝাবে কে। তবু মারুফ প্লেটের ভাত শেষ করে। ডাল উঁাড়শ ভাজি আর ডিমের তরকারি দিয়ে। মায়ের রান্নার আগের টেস্টও নেই। ডাইনিং টেবিলের আয়োজনও নেই।

মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার পেট ভরে গেছে, আম্মা। আপনাদের খাওয়া শেষ হলে আমি হাত ধোব।

আমাদের খাওয়া!

শেষ করবেন না?

করব তো। অনেক সময় লাগবে।

আমার তো বেশি রাত করা উচিত না। পথেঘাটে কত বিপদ।

ও, তাইতো।

দুজনে দ্রুত খেয়ে শেষ করেন। ডাল আর ভাজি ঠিকমতো খাওয়া হয় না। ডিমের তরকারি তো প্লেটেই ওঠে না।

মন্টুর মা টেবিলের কাছে এসে বলে, এরকম করে খেলে তাদের শরীর কি ঠিক থাকবে!

আব্বা-আম্মাকে আপনারা দেখবেন, বুয়া।

আমরা তো চেষ্টা করি। সব সময় পেরে উঠি না।

দুজনে উঠে বেসিনে গিয়ে হাত ধোন। মারুফও উঠে এসে বাবা-মায়ের কাছে দাঁড়ায়।

তুই এখন কোথায় যাবি, বাবা?

ফার্মগেটের দুর্গবাড়িতে। সকালে উঠে মেলাঘরে চলে যাব।

কয় দিন থাকবি মেলাঘরে?

বেশি দিন না। কমান্ডার আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। নতুন তেজে গেরিলাদের আবার ঢুকতে হবে ঢাকায়। গোলাবারুদ-অস্ত্র নিয়ে। আগস্ট মাসে গেরিলাদের ধরা পড়ার পরে ঢাকা শহরে গেরিলা তৎপরতা যে কমেছে, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আমরা আরও দ্বিগুণ প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকায় ঢুকব।

মারুফ তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছে বলে, যাই, আম্মা।

যাবি?

যেতে তো হবেই, আম্মা।

আয়শা খাতুন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

এখন কান্নার সময় নয়, আশা। এখন বুকে পাথর বাধার সময়। আমরা তো এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছি।

যাই, আব্বা।

কবে আসবি?

সাত দিনের মধ্যে ঢাকায় ঢুকব।

বাড়িতে আসবি তো?

এবার আমার হাইড হবে ফার্মগেটের বাড়িতে। ওখানে থেকেই অপারেশনে যাব। দোয়া করবেন আমার জন্য। কবে বাড়িতে আসতে পারব, তা বলতে পারছি না।

মারুফ দুজনকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

আলতাফকে বলে, সাবধানে থাকবেন। আসি।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন দিকে তাকায় না। দ্রুত রিকশায় ওঠে।

সাত দিনের মাথায় বৃষ্টি মাথায় করে দুজন যোদ্ধা আসে আকমল হোসেনের বাড়িতে। আয়শা খাতুন ওদের তোয়ালে দেন ভেজা শরীর মোছর জন্য। ওরা শিহাব আর কামরুল। বয়স কম। মাত্র স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আমরা আবার ঢাকা শহরে ঢুকেছি। আগামীকাল থেকে এই শহর চাঙা করে তুলব।

আকমল হোসেন মৃদু হেসে বলেন, আমরা আবার জয়ী হব, বাবারা।

আয়শা ওদের দুহাত নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলেন, তোমরা আমার প্রাণ।

ছেলেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা এই বাড়িটা গুছিয়ে দেব? যারা তছনছ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এটাও একটা প্রতিশোধ।

না। এভাবেই থাকুক কিছুদিন। এভাবে থাকলে মেরিনা নেই এ সত্য আমরা তীব্রভাবে বুঝতে পারি।

কত দিন এভাবে থাকবে?

আমি জানি না।

স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কি?

হতে পারে। তোমাদের জন্য চা নিয়ে আসি।

আয়শা খাতুন উঠে যান। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে আকমল হোসেন বলেন, তোমরা ঢাকায় কত দিন থাকবে?

আপাতত যাচ্ছি না। পরশু আমাদের অপারেশন আছে। সিরিজ অপারেশনের চিন্তা আছে।

কোন পথে ঢুকেছ তোমরা?

আমরা গোপীবাগের পেছন দিয়ে ঢাকায় ঢুকেছি। ওখানে একটা গ্রামে ক্যাম্প করা হয়েছে। আস্তে আস্তে গোলাবারুদ-অস্ত্র ঢাকায় আনা হবে। সাভারের দিক থেকেও গেরিলারা ঢাকায় ঢুকছে। দলে দলে গেরিলারা ঢাকায় ঢুকবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, পাকিস্তানি আর্মিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা হবে। যেন ওরা দম ফেলার সময় না পায়।

আকমল হোসেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতার মধ্যে এ এক অলৌকিক আনন্দ। ছেলেরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পায়। আয়শা খাতুন ওদের জন্য পুডিং আর চা নিয়ে আসেন। ছোট প্লেটে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা দেন।

চটপট খেয়ে নাও।

এত খাবার?

তোমাদের জন্য মোটেই বেশি না। একটু খাবার তো খেতেই হবে। খিচুড়িটা আগে খাও। তারপর পুডিং। পরে চা।

ছেলেরা বেসিন থেকে হাত ধুয়ে আসে। দ্রুত খেয়ে শেষ করে। যাবার সময় বলে, প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও কিছু ঘটবে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনলে ভাববেন, আমরা আপনাদের কাছে আছি। আমরা যাচ্ছি, জয় বাংলা মামণি।

দুজনে চুপ করে বসে থাকেন। তারা বুঝতে পারেন, তাঁদের জীবন থেকে সময় কমে যাচ্ছে। আয়শা খাতুনের মনে হয়, কত দিন ধরে তিনি যেন সোয়েটার বুনছেন না। উল-কাঁটা হাত দিয়ে ধরলে পুড়ে যায় হাত–প্রবল যন্ত্রণা তাকে উথালপাতাল করে। আগুনবিহীন পুড়ে যাওয়ার স্মৃতি তাঁর শরীর অবশ করে দেয়। তিনি সোফার ওপর পা উঠিয়ে বসেন। পেছনে মাথা হেলিয়ে দেন। দৃষ্টি ছড়িয়ে থাকে উল্টে-পাল্টে থাকা ঘরের ভেতর। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পান না। এই বোধ তাকে ভীষণ ক্লান্ত করে। ভাবেন, শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ। এমন কাউকে যদি পেতেন যে, তাঁর পুরো সময়টুকু গানে গানে ভরিয়ে রাখত!

আকমল হোসেন সোফা ছেড়ে উঠতে চান। পারেন না। শরীর ভারী লাগছে। পিঠের ব্যথা চড়চড়িয়ে উঠছে। পা ফেলতেও কষ্ট। মনে হয় কত কাল ধরে যেন নিজের টেবিলে বসা হচ্ছে না। ডায়েরির পৃষ্ঠা খোলা হচ্ছে না। পত্রিকার খবর পড়া হচ্ছে না। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ভাটা পড়েছে। স্মৃতির পৃষ্ঠা ভরে থাকছে শুধু। তাঁর পাশে যদি কেউ থাকত, যদি লিখে রাখত প্রতিদিনের ঘটনা-বলত, দেখুন, কত কিছু লিখে

রেখেছি আপনার জন্য। ভয় নেই, ইতিহাসের একটি তথ্যও হারাবে না। এই শহরের সবটুকু আপনার জন্য রক্ষিত আছে। আকমল হোসেন সোফায় মাথা হেলালেন। দেখলেন, তছনছ করা ঘরে দুজন মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় বসে আছেন। কারণ, এই বাড়ির একটি মেয়ে শহীদ হয়েছে। বাড়িটিকে যুদ্ধক্ষেত্র ভেবে তারা এই বসবাসকে নিজেদের ভেতরের সবটুকুর সঙ্গে আটকে রেখেছেন। তারা স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের বাইরের মানুষ নন। সোফায় মাথা হেলালে দুচোখ বেয়ে অঝোরে পানি পড়তে থাকে। আর কত দিন পারবেন নিজেকে সামলাতে! সময় নিয়ে কিছু একটা ভাবতে চাইলেন। পরে মনে হলো, না, ভাবাটি ভালো।

দুদিন পরই মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিসের সামনে গ্রেনেড ছোড়া হলো। ফোন পেলেন নাহিদের কাছ থেকে।

আমরা এভাবে শহরজুড়ে থাকব।

কেটে যায় লাইন। তিনি বসে পড়েন। বুকের ভেতর ধস। ব্যথায় কষ্ট লাগছে।

দুই দিন পর আবার খবর পেলেন, খান এ সবুর খানের ধানমন্ডির বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আবার খবর পেলেন, প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশন অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। একজন মারা গেছেন, দুজন আহত হয়েছেন, ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে, বোমার আগুনে কাগজপত্র পুড়েছে। ঘরের ছাদ ধসে পড়েছে।

খবর জানতে পারেন তুহিনের কাছ থেকে। ওর হাসিতে ঝড় ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, আমরা গেরিলা পত্রিকা সাইক্লোস্টাইল করে ছেপেছি। দু-এক দিনের মধ্যে বিলি করতে হবে। আমি আর শমসের পত্রিকার কপি নিয়ে আসব।

ফোন রেখে দেয় ওরা। মেরিনা গেরিলা পত্রিকা বিতরণ করত। বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসত। এখন এই বাড়িতে তাকে কপি দেবে ওরা। কে বিতরণ করবে? চোখ ভিজে

যায় আকমল হোসেনের। এত চোখ ভিজে গেলে তো অন্ধ হয়ে যাবেন, এই যুদ্ধের সময় কি কারও নিজে নিজে অন্ধ হয়ে যাওয়া সাজে? একদম না। নিজেকে ধমক দিয়ে নিজেকেই উত্তর দেন তিনি। আয়শা কাছে এসে বলেন, চা খাবে?

হ্যাঁ। কড়া করে চা দিতে বলল।

ডাইনিং টেবিলে এসো। নাকি বারান্দায় বসবে?

বারান্দায়। আকমল হোসেন জোর দিয়ে বলেন।

আয়শা খাতুন ভুরু কুঁচকে বলেন, বারান্দার ছোট টেবিলটা সেপাইরা ভেঙে ফেলেছে।

ড্রয়িংরুমের একটা টিপয় নিয়ে আসছি। তুমি যাও।

আয়শা খাতুন যেতে যেতে স্বস্তি পান। অনেক দিন পর ভালোবাসার মানুষটির স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর টের পেলেন আজ। যেন নিজের জায়গায় ফিরে এসেছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে যুদ্ধ-সময়ের মানুষ ভাবতেন। বলতেন, আমার বয়স হয়নি। এখনো তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর। প্রতিদিনের যুদ্ধক্ষেত্রে হেঁটে যেতে পারি।

চা খেতে খেতে আয়শাকে বললেন, দু-এক দিনের মধ্যে ছেলেরা গেরিলা পত্রিকা বিলি করার জন্য নিয়ে আসবে। ফোনে তা-ই বলল।

আসুক। যত খুশি কপি পারে নিয়ে আসুক।

কে বিলি করবে?

কেন, আমি। তুমিও করবে। আলতাফ করবে।

আয়শা খাতুন চায়ের কাঁপে চুমুক দেন। আকমল হোসেনের দিকে তাকান না। আয়শা খাতুনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করলেন আকমল হোসেন। তিনি নিজেও শেষ করে কাপটা ঠেলে দিলেন। দেখলেন, আয়শা খাতুন চামচ দিয়ে পিরিচে টুংটুং শব্দ করছেন। একপর্যায়ে বলেন, বল, কী বলবি? ভাবছিস, কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেই আমি তোর কথা বুঝব? পেটে ধরেছি বলে এমন করে ভাবতে হবে?

আমার গানটি আপনার কাছ থেকে শুনব, আম্মা। মনে হচ্ছে, এখনই আমার গান শোনার সময়।

তোর প্রিয় গানটি, মা? আমার ময়না পাখি।

তুমি কি কিছু ভাবছ, আশা?

ভাবছি। তোলপাড় করা দুনিয়ায় আমার ভাবনার শেষ নেই।

কী ভাবছ, বলবে? আমি তোমার ভাবনার অংশী হতে চাই।

মেরিনার প্রিয় গানের কথা ভাবছি। ও আমাকে এই গানটি গাইতে বলছে।

আকমল হোসেন গান শোনার অপেক্ষা করেন। একটু আগেই তিনি বুঝে গেছেন যে, আয়শার নিজের ভেতরে ফিরে আসার প্রস্তুতি শেষ। এখন তিনি মেরিনার সঙ্গে কথা বলছেন। নিজের সঙ্গে কথাও। আকমল হোসেন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালেন। ভেসে ওঠে গুনগুন ধ্বনি—

আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হলো রে,
আমার পথ হলো সুন্দর।।

আয়শা একমুহূর্ত থেমে বলেন, তুমি কি গাইবে আমার সঙ্গে?

আকমল হোসেন চমকে আয়শার দিকে তাকান। বলেন, হ্যাঁ, গাইব। মেরিনার প্রিয় গানটি আমিও গাইতে চাই, আশা।

তুমিও ওর কথা শুনতে পাও?

আকমল হোসেন চুপ করে থাকেন।

আমি শুনতে পাই। প্রতিদিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

তিনি আবার শুরু করেন গানের ধ্বনি–

কী নিয়ে বা যাব সেথা ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব বাহিরে
আমার ব্যাকুল অন্তর।।
মালা পরে যাব মিলনবেশে, আমার পথিকসজ্জা নয়
বাধা বিপদ আছে সঁঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা, পূরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

আকমল হোসেনের মনে হয়, আয়শার গুনগুন ধ্বনি আজ বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

আয়শা গুনগুন ধ্বনি থামিয়ে বলেন, মেয়েটির যাত্রা তো শেষ হয়েছে। সন্ধ্যাতারা কি জ্বলে উঠেছে? তুমি কি দেখেছ? খুঁজেছ নাকি সন্ধ্যাতারা?

আকমল হোসেন দুহাতে মুখ ঢাকেন।

আয়শা খাতুন প্রাঙ্গণে দৃষ্টি ফেলে বলেন, মানুষের দ্বারে কি মধুর স্বর বাজছে? শহীদের জন্য ঘরে ঘরে প্রার্থনার মতো বলা হচ্ছে কি, তোমরা আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছ, আমরা তোমাদের জয়গান গাইছি। আহ্, ওরা তো নির্ভীক পায়ে যাত্রা শেষ করেছে। ওদের শেষ যাত্রায় জয়ধ্বনি করতে বলেছে।

তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

না, না। আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

আকমল হোসেন দেখলেন, আয়শা জ্ঞান হারিয়েছেন। সবাই মিলে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যায়।

দিন সাতেক পর আবার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে শহর। দুদিন আগে এসেছিল ছেলে দুটো। স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। পাঁচ পাউন্ড পিকে নিয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে।

এই দুজনের লক্ষ্য ছিল ডিআইটি টাওয়ারের ওপরে টেলিভিশনের যে অ্যান্টেনা টাওয়ার আছে, সেটিকে কাটিং চার্জ করে ফেলে দেওয়া। নানা বাধায় সুযোগ করতে পারেনি। এবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ডিআইটির একজন কর্মচারী মাহবুব। তিনি নাটক করেন। জন আর ফেরদৌসকে সহযোগিতা দিচ্ছেন। ভেতরে ঢোকার পাস জোগাড় করে দিয়েছেন।

টেলিভিশন স্টুডিও থাকার কারণে ডিআইটি ভবনের সিকিউরিটিতে খুবই কড়াকড়ি। চেকিংয়ের শেষ নেই। প্রধান দুটো গেটের একটি খোলা থাকে ভেতরে ঢোকার জন্য। তা-ও আবার প্রতি ফ্লোরে আছে চেকিংয়ের ব্যবস্থা। মূল ভবনে ঢোকার মুখে আছে চেকপোস্ট। প্রতিটি তলার সিঁড়ির মুখে আছে চেকপোষ্ট। প্রতি তলার চেকপোস্ট পার হয়ে সাততলায় উঠতে হয়।

কথাগুলো বলে মিষ্টি করে হাসে জন। আকমল হোসেন সেই হাসি দেখে জেগে ওঠেন। ওরা আছে বলে শক্তি ফুরোয় না। এক রাতে কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে গেল, ওরা ভয় পায়নি। ওদের জায়গা পূরণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। এখানেই মৃত্যুর শান্তি।

আগামীকাল আমরা রেকি করতে সাততলায় যাব। ভয় পাচ্ছি, এত চেকিং কাটাতে পারব কি না ভেবে।

সব অপারেশনেই রিস্ক থাকে, ছেলেরা। ভয় পেলে চলবে না, রিস্ক কাটাতেও হবে।

আমরা সেই সাহস নিয়েই তো এগোই, আঙ্কেল।

জানি। তোমাদের পিকে নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে?

মাহবুব ভাই বারো পাউন্ড পিকে নিতে পেরেছেন। আমাদের মোলো পাউন্ড লাগবে।

মাহবুব দারুণ কাজ করেছে।

প্রথম দিন মাহবুব ভাই অফিসে যাওয়ার আগে আমি তার পায়ের কাছে ফার্স্ট এইড ব্যান্ডেজ বেঁধে আট আউন্স পিকে বেঁধে দিই। জুতোর ভেতরে পায়ের পাতার নিচে আরও আট আউন্স পিকে দেওয়া হয়। মাহবুব ভাই বারো দিনে বারো পাউন্ড পিকে বিল্ডিংয়ের ভেতরে নিয়ে গেছেন। সাততলার একটি ঘরের পুরোনো ফাইলপত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

জন আবার মিষ্টি করে হাসে। একমুখ হাসি নিয়ে ফেরদৌসও আকমল হোসেনের দিকে তাকায়। তার মনে হয়, এই হাসিই এখন সম্বল।

তোমাদের কি আরও পিকে দেব?

না, লাগবে না। ষোলো পাউন্ড পিকে আমাদের হাতে আছে। রেকির কাজ শেষ হলে দু-এক দিনের মধ্যে অপারেশনের সময় ঠিক করব।

এসো।

আকমল হোসেন হাত বাড়িয়ে ওদের ডাকেন।

ওরা কাছে এলে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখেন। পরস্পরের বুকের উষ্ণতায় নির্ভরতা বাড়ে। আকমল হোসেন ওদের মাথার ওপর মুখ রেখে চোখ বন্ধ করেন।

তারপর ছেলেরা বলে, আমরা যাই, আঙ্কেল।

এসো। দোয়া করি, সফল হও।

ষোলো পাউন্ড পিকে বহন করার আগেই সমস্যা দেখা দেয়। মাহবুব ওদের খবর দেয় যে, সাততলার যে ঘরে পিকে রাখা হয়েছে, সে ঘরের ফাইলপত্র গোছানোর তোড়জোড় চলছে। দুই কিশোর যোদ্ধা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। ষোলো পাউন্ড পিকে বহন করার আগেই কাজটি করে ফেলতে হবে।

মাহবুবের পায়ের নকল ব্যান্ডেজের নিচে বেঁধে দেওয়া হয় ছয় গজ ফিউজওয়্যার। একটি কলমের ভেতরের অংশ ফেলে দিয়ে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় একটি ডেটোনেটর। মাহবুব সেগুলো পায়ে বেঁধে ঢুকে যান অফিসে।

জন আর ফেরদৌসের জন্য দুটো পাস জোগাড় করা হয়েছিল। অডিশন দেওয়ার অজুহাত ছিল। ওরা নির্দিষ্ট সময়ে ডিআইটি ভবনে ঢুকে যায়। ছয়তলার চেকপোস্ট পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ওঠে। সাততলার গেটে পুলিশ ওদের আটকায়। কী জন্য যাবে, জিজ্ঞেস করতেই ওরা বলে, ওরা সরকারের অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে বুড়িগঙ্গায় কতটা

পানি বেড়েছে, তা দেখার জন্য। এবারে বর্ষা খুব বেশি। বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ওদের কথার মাঝখানে অন্য লোকজন এসে পড়ায় পুলিশ ওদের ছেড়ে দেয়।

ওরা দ্রুত উঠে যায় নির্দিষ্ট ঘরে। পিকে বের করে একত্র করে। জন চার্জ সেট করে। ফিউজওয়্যারে ইগনিশন পয়েন্ট ও ডেটোনেটর ফিট করে ফেরদৌস।

ওদের সামনে সময় অনন্তকাল। অথচ মুহূর্ত মাত্র সময়। বেলা একটা বারো মিনিটে ফিউজওয়্যারে আগুন দেয় ওরা।

হাতে মাত্র তিন মিনিট সময়। তিন মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটবে। সরে যেতে হবে এই ভবনের এলাকা থেকে। ওরা যখন ভবন ছেড়ে রাস্তায় নামে, তখন বিস্ফোরণ ঘটে।

গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়াম এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন আকমল হোসেন। বিভিন্ন দোকানে ঘুরে নানা জিনিস দেখছিলেন। টুকটাক কেনাকাটাও করেছেন। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে গাড়ির কাছে আসেন। ওদের দূর থেকে দেখে গাড়িতে স্টার্ট দেন। ওরা এসে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে।

কনগ্রাচুলেশনস, ফ্রিডম ফাইটার্স।

আকমল হোসেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।

আমার বুক এবং পিঠ দুটোই তোমাদের জন্য আছে। আমার পিঠ দেখে ভেবো না যে, আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি।

হা হা করে হাসে দুই ছেলে।

আমরা তো সবই জানি, আপনি আমাদের অভিভাবক, আঙ্কেল।

তোমাদের কোথায় নামাব?

মগবাজারের কোথাও।

ঠিক আছে। এই সময় আমি বাইরে থাকতে চাই না। বাড়িতে খোঁজ নিতে আসতে পারে বিস্ফোরণের ঘটনায়। ওরা দেখুক যে আমি বাড়িতেই আছি। ওদের কোনো প্রশ্নের সুযোগ দেব না। যা করবে, আমার ওপর দিয়ে করবে। গাড়ি থামে মগবাজারের মোড়ে। দুজনে নেমে যায়।

বাড়ি পৌঁছে আমাকে একটা ফোন দিয়ো তোমরা।

জি, আঙ্কেল।

ওরা দ্রুত পায়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়ে।

আকমল হোসেন বাড়ি ফিরলে দেখতে পান, আয়শা খাতুন বারান্দায় বসে আছেন। এক পলক তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হঠাৎ করে বয়স বেড়ে গেছে মনে হয়। মাথার সামনের দিকের অনেক চুল সাদা হয়েছে। আকমল হোসেন গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাতে গেলে পেছনের বারান্দায় আসেন আয়শা খাতুন। তিনি বারান্দায় উঠলে বলেন, সাকসেসফুল অপারেশন?

হ্যাঁ।

ওদের বাড়িতে দিয়ে এসেছ?

না। মগবাজারের মোড়ে ছেড়ে এসেছি। ভাবলাম, আমার বাড়িতে থাকা দরকার। যদি আর্মি খুঁজতে আসে।

যদিও সেদিনের পর আর্মি এ বাড়িতে আসেনি। তারপর বলা তো যায় না।

ঠিক বলেছ, আশা।

তোমার জন্য লেবুর শরবত বানিয়ে রেখেছি।

লেবুর শরবত! চমকে ওঠেন আকমল হোসেন। হঠাৎ করে মনে হয়, কথাটি তাকে মেরিনা বলল। ঠিক যেমন করে মেরিনা বলত, ঠিক তেমন ভঙ্গিতেই আয়শা বলেছে। তিনি আয়শার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ান। ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, এসো। লেবুর শরবত খাবে। যা গরম পড়েছে। ভীষণ ভাপসা গরম।

আয়শা ফ্রিজ থেকে লেবুর শরবত বের করেন। নিজের জন্যও এক গ্লাস। দুহাতে দু-গ্লাস নিয়ে ড্রয়িংরুমে আসেন। গ্লাস নিতে নিতে আকমল হোসেন জিজ্ঞেস করেন, কী রান্না হয়েছে?

পাবদা মাছের ঝোল। করল্লা ভাজি আর ডাল। আর কিছু চাও?

না, না, এতেই হবে।

ভাত তো খেতেই পারো না। ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে থাকো। মনে হয়, ভাত খেতে তোমার বুঝি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এভাবে কেউ ভাত খায় না।

ঠিকই বলেছ। তবে ঠিক বলোনি যে, এভাবে কেউ ভাত খায় না।

ঠিক বলিনি? আমি ঠিকই বলেছি।

আমি তো জানি, আরও একজন এভাবেই ভাত খায়। আমারই সামনে বসে খায়।

আয়শা খাতুন লেবুর শরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে উঠে পড়েন।

বসো, আশা। তুমি শরবত না খেলে আমিও খেতে পারব না।

আয়শা খাতুন সোফায় এসে বসেন। দুজনে একসঙ্গে একটু একটু করে শরবত খান। যেন একেকটি চুমুকে শেষ হয়ে যেতে পারে জীবনের বাকি সময়টুকু।

মন্টুর মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, টেবিলে খাবার দিয়েছি।

দুজনে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকান। যেন বলতে চান, তুমি আমাদের নীরবতা কেন ভাঙতে এসেছ। কিন্তু বলা হয় না।

ঘুমোতে যাবার আগে ফোন আসে জনের কাছ থেকে।

আঙ্কেল, মাহবুব ভাই জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে টাওয়ারের একটি অংশে ফোকর হয়েছে। সাততলার মেঝেতে গর্ত হয়েছে। আগুন সাততলা থেকে ছয়তলায় ছড়িয়ে পড়েছে। অফিসের অনেক কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

আবারও তোমাদের কনগ্রাচুলেশনস। ওরা বুঝেছে যে আমাদের দমাতে পারেনি।

আঙ্কেল, দোয়া করবেন।

সেদিন তিনি নিজের টেবিলে এসে বসলেন। ডায়েরির পাতা খুললেন। আয়শা উল-কাটা নিয়ে সোয়েটার বুননের বাকি কাজ নিয়ে বসেন। পেছনের বারান্দার দিক থেকে ঝিঁঝিটের ডাক ভেসে আসে। দুজনেরই মারুফের কথা মনে হয়। শব্দের ভেতরে স্মৃতির বিকাশ ঘটে। শব্দ স্মৃতিকে পথে ডাকে। দুজনেই ভাবলেন, পথের ডাকে স্মৃতির রেশ বড় নিষ্ঠুর। দুজনে ঘুমোত গেলে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাকলেন। বুঝলেন, জীবনের জলরঙে স্মৃতির ক্যানভাস ভরে না। কোথায় পালাবেন তারা? তাদের সামনে কোনো ঠিকানা নাই। যন্ত্রণার দাবদাহে পুড়বেন। আবার ফিনিক্স হয়ে জাগবেন। জাগতেই তো হয় মানুষকে। তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফেরালেন। হাত ধরলেন। আয়শা খাতুন বিড়বিড় করলেন, মারুফ যে এখন কোথায় আছে? শীতলক্ষ্যা নদীর

পাড়ে? নাকি সীমান্তের ওপারে? আকমল হোসেন বিড়বিড় করলেন, আমরা কেন ওর কথা ভাবছি। ওকে তো ওর মতো থাকতে দিতে হবে। আয়শা বললেন, তাহলে কি অপেক্ষা করব? হ্যাঁ, অপেক্ষাই করতে হবে আমাদের। ওর বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার অপেক্ষা।

দুজনেরই মনে হয়, চারদিক তোলপাড় হচ্ছে। ঝিঁঝিটের ডাক নেই। পোকাগুলোকে বুটের নিচে পিষে মারছে সৈনিকেরা। ওরাও এখন ওদের শত্রু। ওই শব্দ যেন কারও স্বাধীনতার স্বপ্ন বাড়িয়ে না দেয়, সে জন্য ওদের এমন নিধন। দুজনে বিছানার ওপর উঠে বসেন।

তুমি কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ, আশা?

আমার মনে হচ্ছিল, মারুফ বুঝি ডাকছে। ও পাগলের মতো আমাদের খুঁজছে। আমরা সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ও আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তুমি কিছু স্বপ্ন দেখেছ?

আমার মনে হলো, মারুফ আমাদের দেখে হেঁটে আসছে। কিন্তু ভীষণ কুয়াশা ওর চারদিকে। কুয়াশা কখনো নীল, কখনো সাদা। কখনো গোলাপি, কখনো সবুজ। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি ওকে এভাবেই দেখব অনন্তকাল।

আমাদের মাথা কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

নাকি আমরা ওকে দেখার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছি?

দুজনের প্রবল নিঃশ্বাস বাতাসে উড়ে যায়। দুজন পেছনের বারান্দায় এসে বসেন। সুনসান রাত। কুকুরও কোথাও ডাকছে না। পাখিও না। জোনাকি নেই। অন্ধকার সামনে রেখে বসে থাকার যন্ত্রণা দুজনকে কুঁকড়ে রাখে।

পরদিন মারুফের ফোন আসে। ফোন ধরেন আয়শা।

আম্মা, আমি ঢাকায় এসেছি।

কোথায় আছিস, বাবা?

ফার্মগেটের দুর্গবাড়িতে।

বাড়িতে আসবি একবার?

অপারেশনের পরে আসব। আব্বা কই?

তিনি তো বাইরে গেছেন। ডা. আশরাফের সঙ্গে একজন আহত গেরিলাকে দেখতে যাবেন।

কে আহত হয়েছে, আম্মা?

নাম তো আমার মনে নাই রে।

আব্বার সঙ্গে আর কথা হবে না। আব্বাকে আমার সালাম দেবেন।

ছেলের সঙ্গে কথা বলে আয়শার মন খুশিতে ভরে যায়। ভাবেন, আলতাফকে বাজারে পাঠাবেন। মারুফের পছন্দের খাবার ফ্রিজে রাখতে হবে। তিনি রান্নাঘরে আসেন।

মন্টুর মা, মারুফ ঢাকায় এসেছে।

মেলা অস্ত্রশস্ত্র এনেছে?

এনেছে বোধ হয়।

কোথায় যুদ্ধ করবে?

এটা তো আমাকে বলেনি। এসব কথা ফোনে বলা ঠিক নয়।

হ্যাঁ, তাইতো। কী রাঁধব আজ?

ওর পছন্দের সবকিছু। আলতাফ যা আনবে, সব দেখেশুনে রান্না করবে। ফ্রিজে রাখা হবে। ও কখন আসে বলা তো যায় না।

মন্টুর মা ঘাড় নেড়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করার কাজে লেগে যায়। আয়শা খাতুন মারুফের তছনছ করে যাওয়া ঘরটা গোছাতে শুরু করেন। জোরে জোরে সেনাসদস্যদের গাল দেন, বকা দেন। মানুষের ঘরদুয়োর নষ্ট করার জন্য অভিশাপ দেন। আয়শা খাতুনের মনে হয়, তিনি জীবনের বাকি সময়ে এই ঘর আর ঠিক করতে পারবেন না। এ বড় কঠিন কাজ।

আকমল হোসেন বাড়ি ফিরে দেখতে পান, আয়শা খাতুন ঘর পরিষ্কার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে খাটের পাশে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তিনি জেনেছেন মারুফের টেলিফোনের কথা। তার সঙ্গে ছেলের কথা হলো না! এই বিষাদে তিনি খানিকটা মনমরা হয়ে গেলেও ছেলের ঘর দেখে স্বস্তি পেলেন। এত দিন কোনো ঘরই গোছানো হয়নি। আজ মারুফের ঘর গোছানো হচ্ছে। বুকের ভেতরে খানিকটা স্বস্তি ফিরিয়ে এনে ভাবলেন, আয়শা ঘুমাক। ওর ঘুম খুব দরকার। ও নিজের সঙ্গে লড়াই করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তার আর নিজের ঘরে যাওয়া হলো না। মারুফের ঘরে ঢুকে খালি একটা চেয়ারে বসে পড়েন।

পরদিন সকালে ফার্মগেটের দুর্গবাড়ি আক্রমণ করে আর্মি। বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার চারদিকে নজর রাখছিল ওরা। নতুন লোকজনের আসা-যাওয়া খেয়াল করছিল। কে কোন দিক থেকে আসছে, কোন দিকে ঢুকছে এই সব। নতুন লোক দেখলে মাঝেমধ্যে আইল্যান্ডে অবস্থানকারী মিলিটারি পুলিশ জিজ্ঞেস করত, তুমহারা নাম কেয়া? কিধার যায়েগা? উত্তর না দিলে বেতের লাঠির খোঁচা দিয়ে বলত, বাতাইয়ে।

এই উৎপাতের কারণে এলাকায় পায়ে হাঁটা লোকজনের চলাচল কমে গিয়েছিল। তারপর গোয়েন্দারা গেরিলাদের আশ্রয়কেন্দ্রটি খুঁজে পায়। তখন সকাল আটটা বাজে। ওরা পাঁচজন ছিল বাড়িতে। কেউ ঘুম থেকে জেগেছে, কেউ বিছানা ছাড়েনি। এমন সময় যমদূতের মতো এসে দাঁড়ায় ওরা। ওদের আগমনের খবর প্রথমে টের পায় মারুফ। ঘরে ঢুকে অন্যদের খবর দেয়, আমাদের দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে। ওরা বাড়ির উঠোনে এসেছে। ওরা ছয়জন। রাইফেল, স্টেনগান আছে হাতে। গাছপালাঘেরা বাড়ি তো, তাই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে আসছে।

তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া। দেখ, কী বলে।

বাকিরা চৌকি ছেড়ে উঠে পড়ে।

মারুফ বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান দেয়। একজন সৈনিক।

আর্মস-অ্যামুনিশন কিধার?

নেহি জানতা।

নেহি জানতা! গাদ্দার। বাতাইয়ে।

বাকিরা ঘরে ঢুকেছে। বিভিন্ন ঘর থেকে বের করে আনে সবাইকে। ওদের গেঞ্জি ও শার্ট খুলে হাত এবং চোখ বাঁধে। পাঁচ-ছয়বার বাড়ির চারদিকে ঘোরায়। ওরা কেউ কোনো কথা বলে না। রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দিলে ওরা পাঁচজন শুধু বলে, নেহি জানতা। প্রশ্ন ছাড়া উত্তরটা অনবরত আওড়াতে থাকে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা।

ওদের কাছ থেকে অস্ত্রের খবর বের করা কি সহজ! ওরা তো মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে। ওদের হারানোর কিছু নেই।

যমদূতের মতো ছয়জন পাকিস্তানি সেনা ওদেরকে বাড়ির পেছনে নিয়ে যায়। গাছ, বুনো ঝোপ এবং ঘাস ও শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি চারদিকে কম্পন তোলে।

বাতায়ে মুকুত কিধার? বাতায়ে আর্মস কিধার?

ওরা বুক টান করে দাঁড়ালে গুলি বিদ্ধ হয় ওদের শরীরে।

মারুফের গুলি লাগে বুকে। বুক ফুটো করে বেরিয়ে যায়।

ময়েজের চোখে গুলি লেগে মাথার একাংশ উড়ে যায়।

স্বপনের পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

মিজারুল আর ওমর আহত হয়। একজনের কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে যায়। উড়ে যায় কান। অন্যজনের পায়ে লাগে।

লুটিয়ে পড়ে সবাই।

দুদিন পর ফার্মগেটের বাড়ির খবর নিতে আসেন আকমল হোসেন। সঙ্গে আলতাফ। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন অবস্থা খারাপ। আলতাফ পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, স্যার, আপনি যাবেন না। আমি গিয়ে আগে দেখে আসি।

আকমল হোসেন মাথা নেড়ে সায় দেন।

বিধ্বস্ত বাড়িটির কাছে এসে আলতাফের বুক মুচড়ে ওঠে। বুঝতে পারে, এই বাড়িতে যুদ্ধ হয়েছে। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয়, বাড়িতে কেউ নাই। পাকিস্তানিরা বোধ হয় বাড়ি তছনছ করে চলে গেছে। বাড়ির ভেতরে ঢোকে না ও। একরকম ছুটে গিয়ে খবর দেয় আকমল হোসেনকে।

স্যার, যুদ্ধ। হাঁপাতে থাকে, যেন দম আটকে আসছে ওর। স্যার, চলেন।

তুমি কি ছেলেদের দেখেছ?

কাউকে দেখিনি, স্যার। আমি তো বাড়িতে ঢুকতে পারিনি। সব তছনছ হয়ে আছে। স্যার, অনেক বড় যুদ্ধ হয়েছে।

তুমি শান্ত হও, আলতাফ। তোমাকে উত্তেজিত দেখলে মিলিটারি পুলিশ সন্দেহ করবে। তুমি গাড়িতে ওঠো। গাড়িটা অন্যদিকে কোথাও রেখে আসি।

আকমল হোসেন বিপন্ন বোধ করেন। আলতাফকে তা বুঝতে দেন না। গাড়ি গ্রিন রোড ধরে অনেকখানি চালিয়ে ফিরে আসতে থাকেন। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। দেখতে পান, আলতাফ দুহাতে চোখ মুছছে। নিজেরও একটু খটকা আছে। অপারেশনের পর মারুফ বাড়িতে ফোন করেনি। তাহলে কি ও রূপগঞ্জে চলে গেছে। না মেলাঘরে? বুক চেপে আসে। তার পরও মাথা ঠিক রেখে বাড়ির কাছাকাছি এক জায়গায় গাড়ি পার্ক করেন।

তুমি গাড়িতে থাকো, আলতাফ।

না, স্যার, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। গাড়ি এখানে থাকুক। যা হয় হবে। তিনি এক পলক দীর্ঘদিনের পারিবারিকভাবে যুক্ত লোকটির দিকে তাকান। শুকনো, ছোটখাটো মানুষটি। বছর দশেক ধরে তাঁর কাছে আছে। পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এক হয়ে আছে। আজও তার ভূমিকা পরিবারের একজনের মতোই। তিনি আলতাফের হাত ধরে বলেন, আমার পা টলছে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছি না।

সে জন্যই আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি তো জানি, এই দুর্গবাড়িটি আপনি খুব যত্ন করতেন। এখানে এলে আপনি যুদ্ধ আর শান্তি দেখতেন। আপনি আমাকে এ কথা বলেছেন।

দুজনে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। আকমল হোসেন আলতাফের হাত চেপে ধরে বলেন, একি! আশ্চর্য! এতটা ঘটেছে। কেউ আমাকে কোনো খবর দিল না। হায় আল্লাহ, ওরা কোথায়?

বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণ, প্রতিটি ঘর তছনছ, লন্ডভন্ড। আক্রোশ মেটানো যে হয়েছে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কোথায় গেল ছেলেরা? সরে পড়তে পেরেছিল কি?

আর কোথায় খুঁজব? তার চেয়ে বাড়িতে গিয়ে অন্য দুর্গবাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করে দেখি কোনো খবর পাওয়া যায় কি না।

স্যার, বাড়ির পেছন দিকটা দেখে আসি।

পেছনে তো সব বুনোনা ঝোপঝাড়। ও ব্যাটারা এরকম জায়গায় যেতে ভয় পায়।

স্যার, আমাদের এখানে আসা আর না-ও হতে পারে। দেখে আসি। খোঁজ নিতে তো অসুবিধা নাই।

ঠিক আছে, চলো, আমিও যাই। তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আলতাফ।

আকমল হোসেন বাড়ির পশ্চিম দিক ঘোরেন প্রথমে। ওখানে ঝোপঝাড় পায়ের নিচে দোমড়ানো। মনে হয় অনেকগুলো বুটের নিচে থেঁতলে গেছে ঘাস। তার শরীর শিউরে ওঠে। তাহলে যুদ্ধ কি বাড়ির পেছনে হয়েছে? তিনি পশ্চিম থেকে দক্ষিণে আসেন। দূর থেকেই দেখলেন, পাঁচটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। ছুটে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষু স্থির হয়ে যায় আকমল হোসেনের। ওদের চোখ এবং হাত বাঁধা। মারুফ চিত হয়ে পড়ে আছে। বুকজুড়ে ফোকর তৈরি হয়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে চারদিক। আকমল হোসেন হাঁটু গেড়ে বসলেন। বুকের ফুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দুহাত বাড়িয়ে মিজারুলের বাম পায়ের পাতা পেলেন। আর স্বপনের ডান হাত। মাথা ঝুঁকে গেল তার বুকের ওপর।

কতক্ষণ সময় গেল দুজনের কেউই বুঝতে পারেন না। আকমল হোসেন অনুভব করেন, তার মাথা ক্রমাগত শহীদের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। তিনি মাথা কাত করে আলতাফকে বলেন, বাসায় যাও।

আলতাফ আঁতকে উঠে বলে, বাসায়!

হ্যাঁ, বাসায়। তোমার খালাম্মা আর মন্টুর মাকে নিয়ে এসো।

আলতাফ দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরে।

আর শোনো, তোমার খালাম্মাকে বলবে, বিছানার পাঁচটা সাদা চাদর আনতে।

আমি কেমন করে বলব? ও আল্লাহ রে—

শোনো, দুটো কোদাল এনো। তোমার জন্য একটা, আমার জন্য একটা। আমি জানি, দুটো কোদাল বাসায় নেই। তুমি কোদাল কিনে বাসায় যাবে। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে নাও। তাড়াতাড়ি যাও। তাড়াতাড়ি আসবে।

আপনি কী করবেন, স্যার?

আমি এখানে থাকব।

না, স্যার, আপনাকে একা রেখে আমি যাব না।

তোমাকে তো যেতেই হবে, আলতাফ।

আলতাফ কাঁদতে শুরু করে। দশ বছর ধরে মানুষটিকে দেখছে, কিন্তু এমন কণ্ঠস্বরে কোনো দিন কথা বলতে শোনেনি।

আলতাফ, তুমি যাও। আর কেঁদো না।

আপনি, স্যার?

আমি ওদের সঙ্গে শুয়ে থাকব। তুমি যাও। সময় নষ্ট করছ কেন?

আলতাফ কথা না বাড়িয়ে এগোয়। বিল্ডিংয়ের কোনায় গিয়ে পেছন ফিরে তাকায়।

দেখতে পায়, আকমল হোসেন শহীদদের পাশে শুয়ে পড়েছেন। গেটের কাছে যাওয়ার আগেই ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর—ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা...।